কিশোর ক্লাসিক
গ্রেট এক্সপেকটেশানস
চার্লস ডিকেন্স
শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

# গ্রেট এক্সপেকটেশানস

চার্লস ডিকেন্স

রূপান্তর :

মিয়াজ মোরশেদ

## চার্লস ডিকেন্স

চার্লস ডিকেন্সের জন্ম ১৮১২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথে। তাঁর বাবা ছিলেন নৌ বাহিনীর কেরানী। অত্যন্ত টানাটানির সংসার ছিল বাবার। চার্লসের বয়স যখন বারো বছর তখন দেনার দায়ে কারাগারে যেতে হয় তাঁকে। ছেলেবেলা থেকেই অর্থোপার্জনের জন্যে নানা পেশায় জড়িত হতে হয়েছে চার্লস ডিকেন্সকে। প্রথমে এক রুটির কারখানায় কাজ নেন, এর কাজ পান এক আইনজ্ঞের দপ্তরে। এখানে কিছু দিন কাজ করার পর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয় তাঁর। স্কুলজীবন শেষে নেন সাংবাদিকের কাজ। ১৮৩৬ সালে বিয়ে করেন ডিকেন্স।

১৮৩৩ সালে প্রথম উপন্যাস রচনায় হাত দেন তিনি 'বয়' ছদ্মনামে। ১৮৩৬ সালে তাঁর 'পিকউইক পেপার্স' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে পত্রিকায়। এসময়ই সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন তিনি। ১৮৪২ সালে প্রথমবারের মতো আমেরিকা যান ডিকেন্স। '৪৪ সালে ইটালিতে। ১৮৬৭-৬৮ সালে আবার আমেরিকায়। ১৮৪৬ সালে 'ডেইলি নিউজের' সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালের ৯ জুন কেন্ট-এর গ্যাডস হিল-এ মারা যান তিনি।

'গ্রেট এক্সপেকটেশানস' ছাড়াও ডিকেন্সের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর ভেতর রয়েছে : 'অলিভার টুইস্ট,' 'নিকোলাস নিক্‌লবি,' 'ওল্ড কিউরিঅসিটি শপ,' 'ডেভিড কপারফিল্ড,' 'আ টেল অভ টু সিটিজ' প্রভৃতি।

# এক

আমার নাম ফিলিপ পিরিপ। একেবারে যখন ছোট তখন আমি নামটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারতাম না, করতাম পিপ। দেখাদেখি আর সবাইও আমাকে পিপ বলে ডাকতো। আস্তে আস্তে 'পিপ'টাই আমার নাম হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ি সাগর থেকে মাইল বিশেক দূরে বিল এলাকার এক নদী-তীরের গ্রামে। ছেলেবেলার প্রথম যে স্মৃতি আমার স্পষ্ট ক'রে মনে পড়ে তা হলো এক শীতের বিকেল। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। গ্রামের গির্জা সংলগ্ন গোরস্তানে গেছি। ওখানে আমার বাবা মা আর পাঁচ ভাইয়ের কবর। বুঝতে শেখার আগেই মারা গেছে সব ক'জন।

চারদিকে লম্বা ঘাস, ঝোপ-ঝাড়; খাড়া হয়ে আছে কবর-গুলোর ওপর স্মৃতি প্রস্তর। দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে, গোরস্তানের ওপাশে বিস্তৃত ভেজা মাঠ, তার ওপর দিয়ে হু হু ক'রে ভেসে আসছে সাগরের ঠাণ্ডা বাতাস। মানুষজনের চিহ্ন নেই আশেপাশে—আমার সেই বয়েসের জন্যে পরিবেশটা সত্যিই

ভীতিকর।

কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

'চুপ! কাঁদবি না একদম!' হঠাৎ হিংস্র কর্কশ একটা গলা চিৎকার ক'রে উঠলো। 'চুপ ক'রে থাক, ক্ষুদে শয়তান, নয় তো গলা কেটে ফেলবো!'

ভয়ঙ্কর দর্শন এক লোক উঠে এলো গির্জার দিককার কবর-গুলোর ওপাশ থেকে। কাদামাটি মাখা কোরা কাপড় তার পরনে, পায়ে মোটা লোহার বেড়ি। মাথায় হ্যাট নেই লোকটার, নোংরা একটা ন্যাকড়া বাঁধা সেখানে; পায়ে ছেঁড়া জুতা। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। এগিয়ে এসে খপ ক'রে ধরলো আমার হাত।

অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড় আমার।

'না! আমার গলা কাটবেন না, স্যার!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বললাম। 'কাটবেন না দয়া ক'রে!'

'নাম কী তোর!' বললো লোকটা। 'জলদি!'

'পিপ, স্যার।'

'জোরে বল!'

'পিপ! পিপ, স্যার!'

'বাড়ি কোথায়?'

মাইল খানেক দূরে আমাদের বাড়িটার দিকে ইশারা করলাম।

আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লোকটা। তারপর আমাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে পকেট উল্টে দেখলো। এক টুকরো শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু ছিলো না পকেটে। সেটাই নিয়ে ক্ষুধার্তের মতো খেতে লাগলো সে, যেন অনেক দিন না খেয়ে আছে। বসে বসে আমি তার রুটি চিবোনো দেখতে লাগলাম।

'বাচ্চা কুত্তা!' খাওয়া শেষ ক'রে ঠোঁট চাটতে চাটতে বললো লোকটা, 'খেয়ে খেয়ে গালটা তো বানিয়েছিস বেশ। তোকে খাওয়া গেলে মন্দ হতো না।···তোর মা কোথায়?'

'ওখানে, স্যার!'

চমকে উঠে দৌড় লাগালো লোকটা। কয়েক পা গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'ওখানে, স্যার,' মা-র কবরটা দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে আমি বললাম আবার।

'ওহ!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে এলো লোকটা। 'তোর মা-র পাশে ওটা তোর বাপের কবর?'

'জি, স্যার।'

'তাহলে কার কাছে থাকিস তুই?'

'আমার বোনের কাছে, স্যার। আমার বোন মিসেস জো গারগেরি, কামার জো গারগেরির স্ত্রী, স্যার।'

'কামার? আচ্ছা।' পায়ের বেড়ির দিকে তাকালো লোকটা। বেশ কয়েক মুহূর্ত এক ভাবে তাকিয়ে থেকে মুখ তুললো সে। তারপর আমার কলার ধরে বললো: 'শোন, ছোকরা! রেতি চিনিস?'

'চিনি, স্যার।'

'খাবার চিনিস?'

'জি, স্যার।'

প্রতিটা প্রশ্ন করার সময় আমার কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছে লোকটা। প্রতিবারই আমি ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছি।

'একটা রেতি আমাকে এনে দিবি।' আবার কলার ধরে ঝাঁকা-

লো আমাকে। 'আর খাবার।' আবার কলার ধরে ঝাঁকুনি। 'নিয়ে আসবি আমার জন্যে। নইলে তোকে খুন ক'রে ফেলবো।' আবার আমার কলার ধরে ঝাঁকালো সে। তারপর ফেলে দিলো ধাক্কা দিয়ে।

আতঙ্কে আমার অবস্থা তখন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো। কোনোমতে আমি তার পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম :

'স্যার, দয়া ক'রে এমন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন না আমাকে। আমি—আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি, স্যার। আমাকে যদি দয়া ক'রে বসে থাকতে দেন আমি বোধহয় আরো ভালোভাবে আপনার কথা শুনতে পাবো। আর—আর, স্যার, সেই মতো কাজ করতে পারবো।'

এবার লোকটা জামার বুকের কাছটা মুঠো ক'রে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে এক স্মৃতি প্রস্তরের ওপর বসিয়ে দিলো আমাকে।

'কাল খুব ভোরে আমার জন্যে একটা রেতি আর কিছু খাবার নিয়ে আসবি,' ধমকের সুরে বললো সে। 'ঐ যে ওখানে, পুরনো কামানটা দেখছিস, ওখানে থাকবো আমি। নিয়ে সোজা ওখানে চলে আসবি। আর, আমার কথা কাউকে বলবি না। যদি বলিস তোর কলজে আমি টেনে বের ক'রে আনবো। ভাবিস না আমি একা, আমার সাথে আরেকটা লোক আছে। দু'জনে মিলে তোকে ভেজে খাবো। ঐ লোকটা এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো তোর ওপর, আমি ঠেকিয়েছি অনেক কষ্টে। শোন, আমার কথা মতো জিনিসগুলো যদি আনিস তোকে আমি কিছু বলবো না, আমার সঙ্গের লোকটাও যাতে না বলতে পারে দেখবো।'

'জি—জি, স্যার,' আমি বললাম।

'তাহলে আনবি তুই রেতি আর খাবার ?'

'জি—জি, স্যার।'

'বল, "যদি না আনি মাথায় বাজ ফেলে মারবে আমাকে ঈশ্বর।" '

'যদি না আনি মাথায় বাজ ফেলে মারবে আমাকে ঈশ্বর।'

লোকটা মাটিতে নামিয়ে দিলো আমাকে। 'মনে রাখিস, কথা দিয়ে গেলি আমাকে। আমার সাথের লোকটার কথাও মনে রাখিস। এবার যা, বাড়ি যা, কাল ভোরে চলে আসবি।'

'শু—শুভরাত্রি, স্যার,' কোনো রকমে বললাম আমি।

ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে গির্জার নিচু দেয়ালের কাছে পৌঁছালো। বেড়িবাঁধা পায়ে অনেক কষ্টে দেয়াল টপকে ওপাশে গেল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। লোকটা আবার মুখ ফেরাতেই আমি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে।

## দুই

আমার বোন মিসেস জো গারগেরি বিশ বছরেরও বেশি বড় আমার চেয়ে। কারণে অকারণে মহিলা আমাকে তো বটেই তার স্বামীকেও

চড়টা চাপড়টা লাগাতে কসুর করে না। আর তার হাত, কী যে শক্ত, যে সে হাতের চাপড় না খেয়েছে কল্পনা করতে পারবে না।

আমার এই বোন সুন্দরী নয় মোটেই। কেন যে মিস্টার জো গারগেরি ওকে বিয়ে করেছিলো আমি আজও ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিশ্চয়ই ও চড়িয়ে মিস্টার গারগেরিকে বাধ্য করেছিলো ওকে বিয়ে করতে। জো লোকটা ভালোই। সুন্দর কোঁকড়া চুল মাথায়, মসৃণ গাল, চমৎকার নীল চোখ, পেটা শরীর। চেহারার মতো স্বভাবও চমৎকার। আমার বোনের ঠিক উল্টো; নম্র, বিনয়ী, সরল—এত সরল যে মাঝে মাঝে বোকা মনে হয় তাকে।

আমাদের বাড়ির ঠিক সাথে লাগানো জো-র কামারশালা। গির্জা-প্রাঙ্গণ থেকে এক নিশ্বাসে ছুটে বাড়ি পৌঁছে দেখলাম ওটা বন্ধ। জো একা বসে আছে রান্নাঘরে।

'অন্তত দশবার বাড়ির বাইরে গেছে আর এসেছে মিসেস জো,' আমাকে দেখে সে বললো। 'তোমাকে খুঁজছে। এইমাত্র আবার গেল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এবার গেছে ছড়িটা সাথে নিয়ে। তোমাকে শায়েস্তা করবে। আজ অনেক দেরি ক'রে বাড়ি ফিরেছো তুমি, পিপ।'

দুঃসংবাদটা শুনে মুষড়ে পড়লাম আমি। গভীর হতাশা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম আগুনের দিকে।

'আজ ক্ষেপেছে,' বললো জো। 'দুপদাপ ক'রে ঘরে ঢুকে ছড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেল!'

'খুব বেশিক্ষণ আগে গেছে, জো ?'

আমি জো-কে বাচ্চারই একটা বড় সংস্করণ বলে মনে করি, এবং কখনোই আমার সমান ছাড়া ভাবি না। তাই নাম ধরেই ডাকি ওকে।

'এই পাঁচ মিনিট,' দেয়ালের ডাচ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো জো। পরমুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর। 'আসছে! জলদি, পিপ, ঐ দরজার পেছনে!'

পরামর্শটা গ্রহণ করলাম আমি। আমার বোন এগিয়ে এসে ধাঁ ক'রে খুলতে গেল দরজার আধ খোলা কপাট; এবং বুঝতে পারলো ওটার পেছনে কিছু একটা আছে। এই কিছু একটা কী তা ঠিক ঠিক অনুমান করতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না—কারণ অতীতে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং স্বাভাবিক। মিসেস জো-র হ্যাঁচকা টানে আমি বেরিয়ে এলাম দরজার আড়াল থেকে এবং কামানের গোলার মতো উড়ে গিয়ে পড়লাম জো-র ওপর। জো বেশ খুশি মনে আমাকে লুফে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো চিমনির ভেতর। তারপর ওর বিশাল একটা পা চিমনির খোলা মুখটার সামনে রেখে আমাকে আড়াল করলো স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে।

'কোথায় ছিলি রে, বাঁদর ?' মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করলো মিসেস জো। 'ভয়ে, চিন্তায় আমার পাগল হওয়ার দশা। বল শিগগির, কোথায় কি করছিলি ? বল! নইলে তুই যদি পঞ্চাশটা পিপ হোস আর ও পাঁচশো গারগেরি হয় তবু তোকে ঐ চিমনির ভেতর থেকে টেনে বার করবো।'

'কোথাও না,' বললাম আমি। 'গির্জার গোরস্তানে বসে ছিলাম শুধু।'

'গোরস্তানে!' চেঁচালো আমার বোন। 'আমি যদি তোর ভার না নিতাম অনেক আগে তুই ঐ গোরস্তানে যেতিস এবং ওখানেই থাকতিস, বদমাশ! কে তোকে মানুষ করেছে?'

'তুমি।'

'কেন? কেন আমি একাজ করেছি বল? আমি জানতে চাই।'

'জানি না,' চিঁ চিঁ ক'রে আমি বললাম।

'জানিস না! তা জানবি কেন, বদমাশ! জীবনে আর কক্ষনো এমন বোকামি করবো না! তোর জন্মের পর থেকে এক দিনের জন্যেও যদি এই অ্যাপ্রন আমি খুলতে পেরে থাকি! কামারের বউ হওয়া এমনিতেই যথেষ্ট··'

আমি আর তখন ওর কথা শুনছি না। আমার মন চলে গেছে গির্জার গোরস্তানে। পায়ে বেড়ি বাঁধা লোকটার কথা ভাবছি। ভাবছি তার বন্ধুর কথা, যে তখনই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলো। ভাবছি রেতির কথা, খাবারের কথা, আমার দিয়ে আসা প্রতিশ্রুতির কথা।

বেশ কিছুক্ষণ বক বক ক'রে একটু শান্ত হলো মিসেস জো। ছড়িটা জায়গামতো রেখে টেবিলে খাবার দিতে লাগলো সে। জো তাকাতে লাগলো একবার আমার দিকে একবার স্ত্রীর দিকে। প্রতিবার মিসেস জো-র রাগ যখন পড়ে আসে এমনি ক'রে তাকায় জো, যেন নিশ্চিত হয়ে নিতে চায় সত্যিই স্ত্রীর রাগ পড়েছে কিনা।

খাবার দেয়া হয়ে যেতেই জো আমাকে নিয়ে বসে পড়লো টেবিলে। খাবার সামান্য—মাখন-রুটি আর চা। প্রতিদিন খাওয়ার

সময় জো-র আর আমার ভেতর পাল্লা চলে কে আগে খেতে পারে। এব্যাপারে আমাদের দু'জনেরই সমান উৎসাহ। আজও জো-র ভেতর উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। কিন্তু আমি যথেষ্ট খিদে থাকা সত্ত্বেও মোটেই উৎসাহ দেখাতে পারলাম না। আমার ভাগের রুটিটুকু রেখে দিতে হবে গোরস্তানের লোকটা আর তার বন্ধুর জন্যে। কারণ আমার বোনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভাঁড়ার থেকে খাবার সরানো অসম্ভব। যদি সম্ভব হয়ও চুরি এবং চোর ধরা পড়তে দেরি হবে না। তাই আমি রুটিতে হাত না দিয়ে চা নিয়ে বসলাম। জো একটু হলো। বেশ কয়েকবার ও আমাকে আমন্ত্রণ জানালো প্রতিযোগিতায়। কিন্তু আমি নির্লিপ্ত মুখে চায়ের মগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেতে লাগলাম, ভাব দেখালাম খাচ্ছি।

দেখতে দেখতে জো তার রুটির অর্ধেকটা শেষ ক'রে ফেললো। আমি এদিকে ফাঁক খুঁজছি কখন লুকিয়ে ফেলবো আমারটা। ফাঁক পেয়ে গেলাম শিগগিরই। রুটি চিবোতে চিবোতে জো একবার আমার চোখের দিকে তাকালো। অমনি আমি জো-র দিক থেকে একটুও চোখ না সরিয়ে রুটিটা মাখনসহ চালান ক'রে দিলাম কোটের ভেতর। জো আবার যখন টেবিলের দিকে তাকালো, ওর চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়।

মিসেস জো কী কাজে যেন ব্যস্ত ছিলো। এই সময় তার চোখ পড়লো জো-র ওপর।

'কী হয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

ওর দিকে তাকালোই না জো। ফিস ফিস ক'রে আমাকে বলতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই তুমি চোট্টামি করেছো পিপ। অত

বড়টা এত তাড়াতাড়ি খেতেই পারো না।'

'কী হয়েছে কী?' এবার আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ আমার বোনের কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই গিলে ফেলেছো, তাই না?' আগের মতোই নিচু স্বরে বলে চলেছে জো। 'দেখ ছোট বেলায় আমিও চিবোতে ভালো না লাগলে গিলে ফেলতাম। কিন্তু অত বড় একটা টুকরো! অসম্ভব! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ গলায় আটকে যায়নি তোমার!'

শেষের কথাটা শুনতে পেয়েছে মিসেস জো। ঝাঁপিয়ে পড়লো সে আমার ওপর। চুল ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল কাবার্ডের কাছে।

'অতবড় রুটি গিলে ফেলেছিস, শয়তান!' চিৎকার করলো সে। তারপর কাবার্ড খুলে বের করলো মহাবিস্বাদ এক হজমী পাঁচন। অন্তত এক পাইন্ট গাল চেপে ধরে গিলিয়ে দিলো আমাকে।

খাওয়া দাওয়ার পর এক ফাঁকে আমি আমার চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এলাম রুটি আর মাখনটুকু। তারপর বসলাম আগুনের পাশে। ডিম ফেটতে লাগলাম পুডিংয়ের জন্যে। পরদিন ক্রিস্টমাস। এ উপলক্ষে পুডিং বানাবে আমার বোন। ডিম ফেটার দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে।

ডিম ফেটা শেষ ক'রে শুতে যাবো, এই সময় দূর থেকে ভেসে এলো কামানের গুম গুম শব্দ।

'ও কিসের শব্দ, জো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আরেকটা কয়েদী পালিয়েছে,' বললো জো।

'মানে?' আমার প্রশ্ন।

'পালিয়েছে! পালিয়েছে!' অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলো মিসেস জো।

আমি জো-র দিকে তাকিয়ে শব্দ না ক'রে শুধু মুখ নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কয়েদী কী জিনিস, জো?'

আমার মতোই মুখ নেড়ে দীর্ঘ জবাব দিল জো। কিন্তু আমি ওর কথার একমাত্র 'পিপ' ছাড়া আর কোনো শব্দ বুঝলাম না।

'কাল একটা কয়েদী পালিয়েছে,' সশব্দে বললো জো। 'ওরা কামান দেগে সংকেত দিয়েছিলো সন্ধ্যার পরপর। আজও একটা পালিয়েছে, এই শব্দ তারই সংকেত।'

'কারা কামান দাগলো?' আমার প্রশ্ন।

'চুপ করলি তুই!' ঝামটে উঠলো আমার বোন। 'খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন। একটার জবাব দিলে তো পেয়ে বসলো; একের পর এক ক'রেই চলবে।'

আমি চুপসে গিয়ে তাকালাম জো-র দিকে। জো শব্দ না ক'রে শুধু মুখ নেড়ে জবাব দিলো। আমার মনে হলো ও যেন জাহাজ কথাটা বললো আরো একটা কি দুটো শব্দের সঙ্গে। কৌতূহল বেড়ে গেল আমার। জো-র দিকে তাকিয়ে মুখটা বড় ক'রে খুলে নিঃশব্দে জিজ্ঞেস করলাম: 'কী?' আগের জবাবটাই আবার দিলো জো। এবারও 'জাহাজ' ছাড়া আর কোনো শব্দ আমি বুঝতে পারলাম না।

অগত্যা বোনেরই শরণাপন্ন হলাম, ভয় হার মানলো কৌতূহলের কাছে।

'মিসেস জো,' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি বললাম, 'যদি কিছু মনে না করো, দয়া ক'রে বলবে, কোত্থেকে এলো গোলার

শব্দ ?'

'ঈশ্বর রক্ষা করুন ডেঁপো ছোঁড়াটাকে !' আমার বোন বললো, এমন ভঙ্গিতে যে, যে কেউ শুনলে ভাববে সে যা বলেছে, বোঝাতে চেয়েছে ঠিক তার উল্টো। 'কারা-জাহাজ থেকে এসেছে শব্দটা !'

'ও,' জো-র দিকে তাকিয়ে আমি বললাম। 'কারা-জাহাজ কী ?'

'বললাম না, ছোঁড়াকে লাই দিলে মাথায় উঠবে !' চিৎকার করলো মিসেস জো। 'কারা-জাহাজ হলো এমন জাহাজ যাতে কয়েদীদের আটকে রাখা হয়।

'কয়েদী কি জিনিস ?' প্রশ্নটা শত চেষ্টা ক'রেও চেপে রাখতে পারলাম না আমি।

আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হলো না আমার বোনের পক্ষে। 'জ্বালিয়ে খেলো দেখছি !' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'কয়েদী হচ্ছে তোর মতো বদমাশ, খুনে, ডাকাত, চোর, জালিয়াত—যারা সব সময় খারাপ কাজ করে, বুঝলি ? আর ওদের সবার শুরুটা হয় তোর মতো প্রশ্ন করা দিয়ে ! যা এবার, শুতে যা !'

# তিন

রাতে ঘুমোতে পারলাম না আমি। গোরস্তানের সেই লোকটা মন জুড়ে রইলো সারাক্ষণ। লোকটা যে কারা-জাহাজ থেকে পালানো কয়েদী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারা রাত ভয়ে সিঁটিয়ে রইলাম আমি। সকালে লোকটার কাছে আবার যেতে হবে ভাবতেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইলো। এর ওপর আরেক ভয়, চুরি ধরা পড়লে বোনের কাছে পিটুনি খেতে হবে। রাতে সরিয়ে রাখা আমার ভাগের রুটিটুকু দিয়ে দু'জনের খাওয়া হবে না; তাই ঠিক করেছি ভোরে আরো কিছু খাবার চুরি করবো মিসেস জো-র ভাঁড়ার থেকে। সেজন্যে যদি পিটুনিও খেতে হয়, কিছু করার নেই, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে আমাকে।

কোনোমতে কেটে গেল ঠাণ্ডা রাতটা। দিনের আলো ফুটে উঠতেই নিচে নেমে এলাম আমি। বাড়ির আর কেউ তখনো ওঠেনি। সোজা রান্না ঘরে গেলাম। দ্রুত হাতে খানিকটা কাবাব করা কিমা, খানিকটা পনির আর একটা আস্ত পর্ক পাই তুলে নিয়ে আমার সেই কাল রাতের রুটিটুকুর সঙ্গে একটা কাপড়ে বেঁধে

পুঁটুলি করলাম। একটা বোতলে একটু ব্র্যাণ্ডিও নিলাম। তারপর ঢুকলাম জো-র কামারশালায়। রান্নাঘর থেকেই একটা দরজা দিয়ে ঢোকা যায় ওতে। একটা রেতি নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। কাল সন্ধ্যায় যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম জলাভূমির দিকে।

সকালটা ভেজা ভেজা। ধোঁয়ার মতো কুয়াশায় ঢাকা চারদিক। প্রত্যেকটা বাড়ির দেয়াল, ছাদ, ফটক ভিজে গেছে। কুয়াশা এত ঘন হয়ে পড়েছে যে সামান্য দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। গ্রামের সীমানায় রাস্তার পাশে লাগানো নাম ফলকটা দেখতে পেলাম ওটার একেবারে কাছে পৌঁছে। জলা এলাকায় পৌঁছে দেখলাম কুয়াশা সেখানে আরো ঘন। পথ দেখাই কষ্টকর হয়ে উঠলো।

আমি না দমে এগিয়ে চললাম। গোরস্তানের লোকটা যে কামানের কাছে যেতে বলেছে সেটা আমি ভালো ক'রেই চিনি। প্রায় প্রত্যেক রবিবার জো-র সাথে ওখানে যাই বেড়াতে। কিন্তু আজ কিছুদূর যেতে না যেতেই পথ হারিয়ে ফেললাম কুয়াশার কারণে। যে পথে যাওয়া উচিত তার অনেকখানি ডান দিকে সরে গেলাম। নদীতীরে পৌঁছে বুঝতে পারলাম ভুল জায়গায় এসেছি। ভালো ক'রে তাকিয়ে একটু বুঝে নিলাম কোন দিকে গেলে ঠিক জায়গায় পৌঁছুবো। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম নদীর পাড় ধরে।

হন্‌হন করে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ দেখলাম সামনে নদীর পাড়ে বসে আছে এক লোক। আমার দিকে পিঠ। হাতদুটা ভাঁজ করা সামনে। মুখটা নামানো, ঝুল খাচ্ছে একটু একটু। তার মানে

লোকটা ঘুমাচ্ছে বসে বসে।

'নিশ্চয়ই কালকের সেই লোক,' ভাবলাম আমি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলাম তার কাঁধে। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালো লোকটা।

কাল যাকে দেখেছিলাম এ সে নয়। যদিও কালকের লোকটার মতো কোরা কাপড় পরে আছে এ-ও। এরও পায়ে বেড়ি, এবং দৈহিক গড়নও এর সেই লোকটার মতো, শীতে কাঁপছে, খুঁড়িয়ে হাঁটে—সব এক, কেবল চেহারাটা ছাড়া, আর এ লোকটার মাথায় রয়েছে চওড়া কানাওয়ালা ফেল্টহ্যাট। মুহূর্তের মধ্যে এতসব দেখলাম, কারণ দেখার জন্যে মুহূর্তের বেশি সময় আমি পেলাম না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই লোকটা চিৎকার ক'রে একটা গাল দিয়ে আমাকে ঘুসি মারার চেষ্টা করলো। ঘুসিটা লাগলো না আমার গায়ে। লোকটা তাল হারিয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিলো। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে দে ছুট। মোট দু'বার আমি তাকে পা ফেলতে দেখলাম, তারপর হারিয়ে গেল কুয়াশার ভেতর।

'এ সেই অন্য লোকটা,' আমি ভাবলাম। কাল গোরস্তানে এ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলো, কথাটা মনে পড়তেই ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে চলে আসতে চাইলো। লোকটা ফিরে এসে আবার হামলা চালানোর চেষ্টা করতে পারে ভেবে দ্রুত পা চালালাম আমি।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম পুরনো কামানটার কাছে। তারপর, হ্যাঁ, আছে লোকটা—ঠিক লোক। অস্থির ভাবে পায়চারি করছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ঠাণ্ডায়

শোচনীয় অবস্থা তার। মনে হলো যে কোনো মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে শীত সহ্য করতে না পেরে। আমি এগিয়ে গিয়ে যখন রেতিটা হাতে দিলাম, এমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো যে আমার ধারণা হলো, খাবারের পুটুলিটা না দেখলে ওটাই সে খাওয়ার চেষ্টা করতো। এবার আর সে আমার গলা ধরলো না বা ধাক্কা দিলো না। রেতিটা ঘাসের ওপর রেখে ছোঁ মেরে খাবারের পুটুলিটা নিলো আমার কাছ থেকে। তারপর খেতে শুরু করলো গোগ্রাসে।

'বোতলে ওটা কী রে?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'ব্র্যাণ্ডি।'

খাওয়া থামিয়ে এক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিলো সে। খেয়াল করলাম ঠকঠকিয়ে কাঁপছে লোকটা। চুমুক দেয়ার সময় বোতলটা ঠিকমতো ধরতেও কষ্ট হলো তার।

'আপনি অসুস্থ মনে হচ্ছে,' আমি বললাম।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে,' বললো লোকটা।

'এখানকার মাটি ভীষণ ভেজা, সারারাত এর ওপরেই শুয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই?'

'তা ছাড়া আর কী? যাকগে, এখন আমাকে খেতে হবে। যদি ফাঁসিও হয়, আগে আমাকে খেতে হবে।'

গপাগপ খেয়ে চললো সে। খেতে খেতে মাঝে মাঝেই সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো চারদিকে কুয়াশার ভেতর। বেশ ক'বার খাওয়া থামিয়ে কান খাড়া ক'রে শুনলো, যেন নিশ্চিত হয়ে নিলো আর কেউ নেই আশে পাশে বা কেউ আসছে না আমাদের কাছে। এমনি একবার উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সে, এই সময় হঠাৎ খুট ক'রে একটা শব্দ হলো কাছেই কোথাও। চমকে উঠলো লোকটা।

'কাউকে সঙ্গে আনিসনি তো?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, স্যার। না!'

'কাউকে বলিসনি আমার কথা?'

'না, স্যার!'

'বেশ, বিশ্বাস করছি তোর কথা,' বললো লোকটা। 'তুই একেবারে বাচ্চা। খারাপ হওয়ার মতো বড় এখনো হোসনি, আমার মনে হয় না তুই আমার খোঁজে সৈনিকদের নিয়ে এসেছিস।'

আমি কিছু বললাম না। দেখতে লাগলাম লোকটার খাওয়া। পর্ক পাইটা খাওয়ার সময় তার মুখে ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির ছাপ।

'আপনার ওটা ভালো লাগছে দেখে আমারও খুশি লাগছে,' আমি বললাম।

'কিছু বলছিস?'

'বলছি আপনার ওটা খেতে ভালো লাগছে দেখে আমারও খুশি লাগছে।'

'ধন্যবাদ, ছোকরা। সত্যিই ভালো পাইটা। দারুণ খেতে।'

খেয়ে চললো লোকটা। একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'আপনার বন্ধুকে একটু দেবেন না পাই?'

'কাকে?' খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আপনার বন্ধু, যার কথা কাল বলছিলেন।'

'ওহ, সে!' হাসলো একটু লোকটা। 'ও খাবে না।'

'কিন্তু স্যার, দেখে তো মনে হলো তারও খুব খিদে পেয়েছে!' আমি বললাম।

খাওয়া থামিয়ে আমার দিকে তাকালো লোকটা। চোখেমুখে

ফুটে উঠেছে বিস্ময়।

'দেখে মনে হলো। মানে তুই দেখেছিস ওকে? কখন?'

'এই তো একটু আগে।'

'কোথায়?'

'ঐ যে ওদিকে,' হাত তুলে ইশারা করলাম আমি। 'বসে বসে ঘুমাচ্ছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি।'

আজ প্রথমবারের মতো আমার কলার ধরলো লোকটা। এবং এমন দৃষ্টিতে তাকালো, মনে হলো, আমার গলা কেটে ফেলার ইচ্ছেটা নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে তার মনে। কালকের মতো আবার ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম আমি।

'আ-আপনারই মতো কাপড় পরে ছিলো,' ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'শুধু মাথায় ছিলো হ্যাট। আর—আর ঐ লোকটারও পায়ে বেড়ি ছিলো আপনার মতো। কাল রাতে কামানের শব্দ শোনেননি?'

'কাল রাতেও তাহলে শব্দ হয়েছে!' আপন মনে বললো লোকটা।

'হ্যাঁ, আপনি শোনেননি?'

আমার কথা যেন কানেই ঢুকলো না তার। নিজের মনে বলে চললো, 'তার মানে কাল রাতেও কেউ পালিয়েছে! কে?' আমার দিকে ফিরলো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটাকে ভালো ক'রে দেখেছিস তুই? অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছে?'

'মুখে বিশ্রী একটা কাটা দাগ,' আমি বললাম, 'কাটা দাগটা যে দেখেছিলাম এই প্রথম মনে পড়লো আমার।

'মুখে! এখানে?' নিজের বাঁ গালে টোকা দিলো লোকটা।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কোথায় এখন লোকটা? কোন দিকে গেছে দেখা।' বাবি খাবারটুকু পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালো সে। 'এমন শিক্ষা দেবো বদমাশটাকে।···ওহ, পায়ের এই বেড়িটা! দেখি, রেতিটা দে তো।'

অন্য লোকটা কোন দিকে গেছে দেখালাম আমি। সেদিকে তাকিয়ে রইলো সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঝুঁকে ভেজা ঘাস থেকে রেতিটা তুলে নিয়ে ঘষতে লাগলো পায়ের বেড়িতে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে এমন মগ্ন হয়ে গেল একাজে যে আমার মনে হলো ভুলেই গেছে আমার কথা।

'আমি এখন যাই,' আমতা আমতা করে আমি বললাম।

লোকটা আমার কথা শুনলো কিনা বুঝতে পারলাম না। বেড়ির ওপর রেতি ঘষে চললো সে। আর কিছু না বলে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলাম আমি। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। হারিয়ে গেছে লোকটা কুয়াশার ভেতর। রেতি ঘষার এক ঘেয়ে শব্দ কেবল ভেসে আসছে। আবার ছুটতে শুরু করলাম আমি।

# চার

বাসায় যখন পৌঁছুলাম তখন পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছে কুয়াশার ভেতর দিয়ে। দুরু দুরু বুকে আমি ঘরে ঢুকলাম। চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ জানাজানি হয়ে গেছে: আমার বোনের কী মূর্তি দেখবো কে জানে? কিন্তু না, রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম সব স্বাভাবিক। আজ ক্রিস্টমাস। উৎসব উপলক্ষে দুপুরে কয়েকজন অতিথিকে খেতে বলা হয়েছে। তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে মিসেস জো। ব্যস্তভাবে রান্নার তোড়জোড় করছে।

'কোথায় ছিলি রে বাঁদর?' ক্রিস্টমাসের সম্ভাষণ জানালো আমাকে মিসেস জো।

'ক্যারল শুনতে গেছিলাম,' মিন মিন ক'রে আমি বললাম।

'তাও ভালো, আরো খারাপ কিছু করতে যাসনি।'

একটু পরেই টেবিলে নাশতা দিলো সে। আমি আর জো খেয়ে বেরিয়ে গেলাম গির্জার পথে ক্রিস্টমাসের প্রার্থনায় যোগ দেয়ার জন্যে।

দুপুরে যাঁদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে

আছেন গির্জার কেরানী মিস্টার ওপস্‌ল, আমাদের পড়শি মিস্টার এবং মিসেস হাব্‌ল আর আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক (জো-র চাচা উনি, কিন্তু মিসেস জো তাঁকে দখল করে নিয়েছে)। আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক মোটামুটি ধনী। সম্ভবত সে কারণেই জো-র চাচা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখায় আমার বোন।

খাওয়ার সময় ঠিক হয়েছে দেড়টায়। জো আর আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম রান্না শেষ। টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। মিসেস জো উৎসবের নতুন পোশাক পরে তৈরি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। সামনের দরজার তালা খুলে রাখা হয়েছে (অন্যসময় ওটা বন্ধ থাকে)। সবকিছু চমৎকার সাজানো, গোছানো, সুন্দর। এবং, সবচেয়ে বড় যেটা, এখনও চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়েনি। পড়লে আমার বোন এত খোশমেজাজে থাকতো না।

দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল। অতিথিরা আসতে শুরু করলেন একে একে। আমি দরজা খুলে দিলাম তাদের জন্যে। প্রথমে এলেন মিস্টার ওপস্‌ল। তারপর মিস্টার এবং মিসেস হাব্‌ল। সব শেষে আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক।

'মিসেস জো,' আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক ঘরে ঢুকেই বললেন, 'দু'-বোতল মদ এনেছি তোমার জন্যে আজকের উৎসব উপলক্ষ্যে—এক বোতল শেরি আর এক বোতল পোর্ট।'

প্রতি ক্রিস্টমাসেই আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক এমনি দু'বোতল মদ আনেন। এবং প্রতি ক্রিস্টমাসেই আমার বোন আহ্লাদে গলায় বলে, 'ওহ, আঙ-কূল প্যুম-ব্‌ল-চুক! আপনি কী ভালো!'

আজও তার ব্যাতিক্রম হলো না। বোতলদু'টো নিতে নিতে

বাঁধা কথাগুলো বললো মিসেস জো। এরপর আমরা অতিথিদের নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। ক্রিস্টমাসের দিনও রান্নাঘরেই দুপুরের খাওয়া খাই আমরা। তারপর পারলারে গিয়ে বসি বাদাম, কমলা, আপেল ইত্যাদি ফলফলারি খাওয়ার জন্যে।

টেবিলে ঘিরে বসলাম সবাই। মিস্টার ওপস্‌ল্‌ নাটুকে ভঙ্গিতে প্রার্থনা শুরু করলেন। শেষ করলেন এই কথাগুলো দিয়ে: 'আমাদের সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।' কথাগুলো ভদ্রলোক শেষও করতে পারেননি, আমার বোন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো:

'শুনেছিস? কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।'

'বিশেষ ক'রে,' বললেন মিস্টার প্লামব্‌লচুক, 'তোর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাদের প্রতি যারা তোকে মানুষ করছে হাতে ধরে।'

মাথা ঝাঁকালো মিসেস হাব্‌ল। 'একদম খাঁটি কথা।'

এই সমস্ত ক্ষেত্রে জো বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। স্বভাব সুলভ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খেয়ে চলে। আর সান্ত্বনা হিশেবে আমার পাতে ঝোল তুলে দেয়। আজও তাই করলো। আজ ঝোলের কমতি ছিলো না। একবারে অন্ততঃ আধ পাইন্ট তুলে দিলো আমার থালায়।

এমনি ধারা আলাপ করতে করতে খেয়ে চললেন অতিথিরা। তবে লক্ষ্য করছি একটু পরপরই ঘুরে ফিরে আমার প্রসঙ্গে আসছেন তাঁরা। আমার কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে চলা উচিত, কী করা উচিত, কী না করা উচিত এনিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। আর যখন আমার সম্পর্কে কথা হচ্ছে আমার পাতে এক চামচ দু'চামচ ঝোল তুলে দিচ্ছে জো। ঝোল খেতে খেতে আমার অবস্থা করুণ হয়ে উঠলো। জো-কে যে বারণ করবো সে সাহসও পাচ্ছি না। ব্যাপারটাকে অতিথিরা নির্ঘাত অবাধ্যতা হিশেবে গণ্য করবেন।

খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে আমার বোন বললো :

'একটু ব্র্যাণ্ডি দেই, আঙ্কল।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর ধড়াশ ক'রে উঠলো আমার। বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কয়েদীটার জন্যে। তারপর পানি ঢেলে বোতল আবার ভরে রেখেছি। এখন মিস্টার প্যুমব্‌লচুক খেতে গেলেই টের পেয়ে যাবেন ব্র্যাণ্ডিতে পানি মেশানো। টের পেয়েও তিনি চুপ চাপ পানি মেশানো ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নেবেন এটা আশা করা যায় না। তার মানে আমার বোন টের পেতে চলেছে, তার ব্র্যাণ্ডি খানিকটা কেউ সরিয়েছে। প্রথমেই যে আমাকে সন্দেহ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দু'চোখে চরম হতাশা নিয়ে আমি দেখতে লাগলাম, মিসেস জো ব্র্যাণ্ডির বোতলটা এনে একটা গ্লাসে একটু ঢেলে এগিয়ে দিলো আঙ্কল প্যুমব্‌লচুকের দিকে। অন্যদের জিজ্ঞেস করলো তাঁরাও খাবে কিনা। সবাই মাথা নাড়লো।

মিস্টার প্যুমব্‌লচুক গ্লাস তুলে নিলেন। গ্লাসের তরল পদার্থের দিকে একবার তাকিয়ে টেবিলের আর সবার দিকে তাকালেন মৃদু হেসে। তারপর আবার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে মাথা পেছনে হেলিয়ে এক চুমুকে সবটুকু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলেন গলায়। পর মুহূর্তে সব ক'জন মানুষ ভয়ানক আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠলো। তীব্রভাবে কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িয়েছেন আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক। কাশির দমকে তাঁর চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে, মুখ লাল হয়ে গেছে। আমার বোন আর জো ছুটে গেল তাঁর কাছে। আমার মনে হলো কাশতে কাশতে বোধ হয় মরেই যাবেন

ভদ্রলোক। আমার জন্যেই তাঁর এই অবস্থা। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু না, মারা গেলেন না আঙ্কল প্যামব্রুক। আস্তে আস্তে কাশির বেগ কমে এলো তাঁর। মুখ ঘুরিয়ে তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকালেন সবার দিকে, যেন বোঝাতে চাইলেন আমরা তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিলাম এটা টের পেতে তাঁর বাকি নেই। অবশেষে ধপ ক'রে চেয়ারে বসে পড়লেন আবার। ভাঙা গলায় বললেন :

'পাঁচন। ঐ ব্র্যাণ্ডিতে পাঁচন মেশানো আছে!'

'পাঁচন!' চিৎকার করলো আমার বোন। 'পাঁচন কী ক'রে ঢুকলো ব্র্যাণ্ডির বোতলে?'

নিঃসন্দেহে ভুল ক'রে। ভোরের আলো আঁধারিতে সম্ভবত আমি পানির বদলে পাঁচন ঢেলেছিলাম ব্র্যাণ্ডির বোতলে। পানি আর পাঁচন রাখার জন্যে অনেকটা একরকম দেখতে দুটো জগ ব্যবহার করে আমার বোন। তাছাড়া কাল রাতে আমাকে পাঁচন গেলানোর পর জগটা আর কাবার্ডে ওঠায়নি সে। ফলাফল যা হবার তা-ই হয়েছে। কী যে বিচ্ছিরি স্বাদ ঐ পাঁচনের তা যে না খেয়েছে কল্পনা করতে পারবে না। ঐ স্বাদই যথেষ্ট একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ ক'রে দেয়ার জন্যে। অথচ এই জিনিস সুযোগ পেলেই আমাকে গেলায় আমার বোন আমাকে সুস্থ রাখার জন্যে।

বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে থম মেরে বসে রইলেন আঙ্কল প্যামব্রুক। তারপর আগের মতো ভাঙা গলায় বললেন :

'একটু—একটু গরম পানি মেশানো জিন দিতে পারো আমাকে, মিসেস জো?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার বোন ব্যস্ত হয়ে উঠলো জিনিসটা তৈরি করার জন্যে। এমন হতভম্ব হয়ে গেছে সে যে ব্র্যাণ্ডির বোতলে কে পাঁচন ঢাললো তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা তার মনেও পড়লো না। আঙ্কল প্যামব্‌লচুকের যত্ন নেয়াই এখন তার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।

একটু পরেই আয়েশ করে গরম পানি মেশানো জিনে চুমুক দিতে লাগলেন মিস্টার প্যামব্‌লচুক। অন্য অতিথিরা আবার মনোনিবেশ করেছেন খাওয়ায়। আমার ভয় কমে আসছে আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে আমার অপকর্মের কথা জানাজানি হবে না। এই সময় মিসেস জো বললো:

'কয়েকটা পরিষ্কার থালা নিয়ে এসো তো, জো!'

অমনি আবার ধড়াশ ক'রে উঠলো আমার বুকের ভেতর। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি।

'আঙ্কল প্যামব্‌লচুক চমৎকার দুটো উপহার এনেছেন আমাদের জন্যে,' বললো আমার বোন, 'বিনিময়ে, আঙ্কল, দারুণ একটা জিনিস আপনাকে খাওয়াবো। না, আঙ্কল, আপনি না করতে পারবেন না। খেতেই হবে। পর্ক পাই। আমি নিজ হাতে বানিয়েছি।'

'ঠিক আছে, মিসেস জো,' বললেন মিস্টার প্যামব্‌লচুক। 'আনো তোমার পাই। খাবো আমরা।'

রান্নাঘরের পাশেই ভাঁড়ার ঘর। সেদিকে চলে গেল আমার বোন। আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলাম বিপর্যয়ের জন্যে। পর্ক পাইটা আমি দিয়ে এসেছি কয়েদীকে। মিসেস জো ভাঁড়ারে ঢুকে দেখবে নেই ওটা। তারপর···

আঙ্কল প্যামব্‌লচুককে দেখলাম খেলার ছলে তাঁর ছুরিটা দাঁড়

করানোর চেষ্টা করছেন টেবিলের ওপর। মিস্টার ওপস্‌ল-এর দিকে তাকালাম। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে পর্ক পাইয়ের নামে জিভে জল এসে গেছে তাঁর।

'খাওয়া শেষে এক কামড় পর্ক পাই—তুলনা হয় না!' বললেন তিনি।

'চিন্তা কোরো না', পিপ,' জো আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'তুমিও একটু পাবে।'

ভয় আমার বেড়ে গেল। এবার আর ভুলবে না মিসেস জো। পাইটা নেই দেখেই তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। প্রথমেই যে আমাকে সন্দেহ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে নেমে দাঁড়ালাম আমি। তারপর প্রাণভয়ে পালানোর মতো ছুটলাম দরজার দিকে। কিন্তু আমি দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই খুলে গেল ওটা। এক দঙ্গল সৈনিক দাঁড়িয়ে দোর গোড়ায়। তাদের একজন এক জোড়া হাত কড়া আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো :

'এই, জলদি, এদিকে এসো তো!'

সৈনিকদের শব্দ পেয়ে জো এবং সব ক'জন অতিথি দ্রুত টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একই সময় ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে ঢুকেছে আমার বোন। পর্ক পাইটা পায়নি সে। থেমে সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললো :

'পাইটা নেই! ঈশ্বরের কসম। কে যেন নিয়ে গেছে!'

ইতিমধ্যে সৈনিক দলটার সার্জেন্টকে নিয়ে আমি রান্নাঘরে পৌঁছেছি। এই সার্জেন্টই দরজা খুলে কথা বলেছিলো আমার

সাথে। এ মুহূর্তে ঘরের সবার দিকে তাকাচ্ছে সে একে একে। আমার কাঁধে তার বাঁ হাত। অন্য হাতে ধরা হাতকড়া জোড়া।

'অত্যন্ত দুঃখিত আমি আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে,' অবশেষে কথা বললো সার্জেন্ট। 'আমরা রাজার সৈনিক। দু'জন আসামীকে খুঁজতে বেরিয়েছি। কিন্তু আগে কামারকে দরকার আমাদের।'

'কী কারণে বলবেন দয়া ক'রে?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আমার বোন।

'ম্যাডাম,' বললো সার্জেন্ট, 'রাজার সৈনিকদের জন্যে কিছু কাজ করাতে চাই তাকে দিয়ে।'

'তা-ও ভালো!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন আঙ্কল প্যামব্‌ল চুক।

ইতিমধ্যে সার্জেন্ট বুঝতে পেরেছে কোন লোকটা কামার জো-র দিকে ফিরে সে বললো:

'দেখতেই পাচ্ছেন, ভাই কামার, হাতকড়া দুটোর একটা ভাঙা কয়েদী দুটোকে পাওয়া গেলে এটাও দরকার হবে। আপনি মেরামত ক'রে দিতে পারবেন?'

জো ভালো ক'রে দেখলো ভাঙা হাতকড়াটা। তারপর বললো. 'আগুন না জ্বাললে হবে না। অন্তত দু'ঘণ্টা লাগবে কাজটা করতে

'দু'ঘণ্টা। তাহলে, ভাই কামার, এক্ষুণি শুরু করুন,' বললো সার্জেন্ট। 'রাজার জন্যে করছেন, মনে রেখে কাজটা করবেন। আমার লোকরা সাহায্য করবে। আপনি শুধু বলে দেবেন কী করতে হবে। ওদের সাধ্য মতো ওরা করবে।'

আবার আমার ভয় কেটে যেতে শুরু করেছে। দেখতে পাচ্ছি

সৈনিকরা আমাকে ধরতে নয় বাঁচাতে এসেছে। ওদের দেখে খোয়া যাওয়া পাইয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেছে আমার বোন।

'জলাভূমি কতদূর এখান থেকে?' জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট। 'এক মাইলের বেশি?'

'না, বেশি হলে এক মাইল হবে,' জবাব দিলো আমার বোন।

'তাহলে তো খুব একটা দূর নয়। সূর্য ডোবার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো।'

'আসামী দু'জন জলাভূমিতে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার উপস্‌ল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো সার্জেন্ট। 'আমাদের তা-ই ধারণা। 'অন্ধকার হওয়ার আগে ওরা ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না। আপনারা কেউ দেখেছেন ওদের কাউকে?

আমি ছাড়া আর সবাই বললো, 'না।' আমাকে জিজ্ঞেস-করার কথা সার্জেন্টের মনেও এলো না। কিন্তু এখানে আমিই একমাত্র লোক যে কয়েদী দু'জনকে দেখেছে।

'যা-ই হোক,' বললো সার্জেন্ট, 'ধরে ফেলবো ওদের, খুব বেশি সময় লাগবে না। ভাই কামার, আপনি তৈরি?'

রান্নাঘরের পাশের দরজা খুলে কামার গোলায় ঢুকে পড়লো। জো সৈনিকদের একজন জানালাগুলো খুলে দিলো ওটার। একজন আগুন জ্বেলে দিলো। বাকিরা যে যেমন ভাবে পারে সাহায্য করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন গণগণে হয়ে উঠলো। কাজ শুরু করলো জো। সৈনিকরা চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কৌতূহলী চোখে

অবশেষে শেষ হলো কাজ। পানিতে চুবিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে হাত-কড়াটা সার্জেন্টের হাতে দিলো জো। কোট পরতে পরতে বললো :

'সৈনিক ভাইদের সঙ্গে আমাদেরও দু'একজনের যাওয়া উচিত কয়েদী ছুটোর খোঁজে।'

মিস্টার প্যামব্‌লচুক আর মিস্টার হাব্‌ল রাজি হলেন না এই অবেলায় জলাভূমির ভেতর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে। মিস্টার ওপ-স্‌ল বললেন, জো যদি যায় তাহলে তিনি যাবেন। জো বললো, তার যেতে কোনোই আপত্তি নেই, এবং মিসেস জো অনুমতি দিলে আমাকেও সে নিয়ে যেতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই অন্য সময় হলে আমার বোন কিছুতেই অনুমতি দিতো না—আমাকে তো না-ই, জো-কেও না। তবে এখন বিন্দু মাত্র আপত্তি করলো না। ব্যাপারটার শেষ কী ভাবে হয় জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে সে। তাই বলে যে একেবারে নিরামিষ যেতে দিলো তাও কিন্তু নয়।

'মাস্কেটের গুলিতে ছেলেটার মাথা ফাটিয়ে এনে যদি আমাকে খোঁজো জোড়া লাগিয়ে দেয়ার জন্যে তাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়বে বলে দিচ্ছি!' মুখ ঝামটে বললো সে।

আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

জলাভূমিতে পৌঁছার পরপরই সার্জেন্ট কড়াকড়ি ভাবে বলে দিলো, মিস্টার ওপস্‌ল, জো আর আমি যেন সবসময় সৈনিকদের পেছনে থাকি আর কোনো কথা না বলি। সার্জেন্টের নির্দেশ মতো চলতে লাগলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর আমি জো-কে ফিস ফিস ক'রে বললাম :

'কয়েদী দু'জনকে খুঁজে না পেলেই ভালো, তাই না, জো ?'

'ঠিক, পিপ,' পাল্টা ফিস ফিস করলো জো। 'লোকদুটো যদি সত্যিই পালাতে পারে আমি একটা শিলিং দেবো তোমাকে।'

গির্জার পাশের গোরস্তানে পৌঁছে থামলো সৈনিকরা। ওদের দু'তিনজন ভেতরে ঢুকলো কবরগুলোর আশপাশ খুঁজে দেখার জন্যে। কিছু না পেয়ে ফিরে এলো তারা। আবার আমরা এগিয়ে চললাম জলাভূমির ওপর দিয়ে।

পুবাল বাতাসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে এসে লাগছে আমাদের মুখে। ভীষণ ঠাণ্ডা। এদিকে সৈনিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না আমি। জো আমাকে কাঁধে তুলে নিলো। এবার সুযোগ পেয়ে ভালো ক'রে চারপাশে তাকালাম কয়েদী দু'জনের খোঁজে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। শুনতেও পেলাম না কিছু।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সৈনিকরা। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। নিশ্চয়ই কিছু শুনেছে ওরা। কান খাড়া করলাম। তারপরই ভয়ানক চমকে উঠলাম লোহার বেড়ির সঙ্গে রেতি ঠোকার শব্দ শুনেছি মনে ক'রে। শব্দটা আবার হতে বুঝলাম, না, তেমন কিছু না। ভেড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ। আমাদের পায়ের আওয়াজে খাওয়া থামিয়ে তাকিয়েছে কয়েকটা ভেড়া। কিছু দূরে এক পাল গরুও দেখলাম। ওরাও খাওয়া বন্ধ ক'রে দেখছে আমাদের।

আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। গতিপথ দেখে মনে হচ্ছে পুরনো কামানটার দিকে যাচ্ছে সৈনিকরা। মিস্টার ওপসল, জো আর আমি কিছুটা পেছনে থেকে অনুসরণ করছি। একটু পরেই আবার আচমকা থেমে দাঁড়ালো সৈনিকরা। আমরাও। মানুষের

গলার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গেল সৈনিকরা। আমরাও। কিছুদূর যেতেই বুঝলাম চিৎকার করছে একজন না, একাধিক জন। একটু পর পর থেমে যাচ্ছে শব্দ। আবার শুরু হচ্ছে। চিৎকার থেমে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ছে সৈনিকরা। শুরু হতেই এগোচ্ছে আবার শব্দ লক্ষ্য ক'রে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দ-উৎসের খুব কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। এই সময় একটা গলা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :

'বাঁচাও!'

পর মুহূর্তে আরেকটা চিৎকার, 'আমরা এখানে। জাহাজ থেকে পালানো কয়েদী! এই যে এখানে!'

ছুটতে শুরু করলো সৈনিকরা। জো-ও ছুটলো পেছন পেছন আমি এখনও ওর কাঁধে।

অবশেষে দুই কয়েদীকে দেখতে পেলাম। সার্জেন্ট দৌড়ে গেল ওদের দিকে। তার দুই সৈনিক পেছন পেছন।

'দুটোকে একসাথে পেয়েছি!' চিৎকার করলো সার্জেন্ট। 'এবার আর পালাতে পারবে না, বদমাশরা। মারামারি থামাও! দাঁড়াও! উঠে দাঁড়াও!'

আরো কয়েকজন সৈনিক এগিয়ে গেল সার্জেন্টকে সাহায্য করতে। ওদের সহায়তায় দুই কয়েদীর মারামারি থামালো সার্জেন্ট তারপর দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দিলো পাশাপাশি। একজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পারলাম। আমার সেই কয়েদী; যাকে আমি সাহায্য করেছি, যার জন্যে আমার বোনের মতো ভয়ঙ্কর মহিলার ভাঁড়ার থেকে খাবার চুরি করেছি। অন্যজন নিশ্চয় তার সঙ্গী সেই লোক, যার কথা কাল সন্ধ্যায় বলেছিলো সে, যে আমার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু লড়াই করছিলো কেন দু'জন? দু'জনই হাঁপাচ্ছে, দু'জনেরই শরীরের অনেক জায়গায় ছড়ে কেটে গেছে; রক্ত পড়ছে সেসব জায়গা থেকে।

'আমি ধরেছি ওকে!' চিৎকার করলো আমার কয়েদী। 'আমি ধরেছি, তোমাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। ভুলো না কথাটা! হাতকড়া আছে না তোমাদের কাছে? পরিয়ে দাও!'

'তাতে তোমার অবস্থার খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না, বাবা,' বিদ্রূপের সুরে বললো সার্জেন্ট। 'তুমি নিজেও একজন পলাতক কয়েদী!'

'আমি উন্নতি চাই না,' বললো আমার কয়েদী, 'কিছুই চাই না। বদমাশটাকে ধরে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারছি এতেই আমি খুশি।'

অন্য কয়েদীটাকে মারাত্মক আহত মনে হচ্ছে। কথা বলার শক্তিটাও যেন তার নেই। এক সৈনিকের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দুই কয়েদীর হাতেই হাতকড়া পরিয়ে দিলো সার্জেন্ট।

'ভাই রক্ষী, তোমরা সাক্ষী, ও আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে বললো অন্য কয়েদীটা।

'চেষ্টা করেছিলো!' চেঁচালো আমার কয়েদী। 'খুন করার চেষ্টা যদি করতাম অনেক আগেই ওর লাশ এখানে পড়ে থাকতো। আমি ওকে ধরেছি শুধু। ধরে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আর কিছু করিনি, করতে চাইওনি! কেন ওকে আমি খুন করতে যাবো? তাহলে তো ওকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে। পারলে খুনের চেয়ে খারাপ কিছু করবো, খুন না। আমি ওকে ধরে তোমাদের হাতে তুলে

দিয়েছি।'

'না, না, ও চেষ্টা করেছিলো,' অন্য কয়েদী বলতে লাগলো, 'চেষ্টা করেছিলো আমাকে খুন করার। পারেনি। দয়া ক'রে কথাটা মনে রেখো তোমরা!'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলো আমার কয়েদী। 'মিথ্যে কথা বলছে ও। মায়ের পেট থেকে পড়েই বদমাশ মিথ্যে কথা বলেছে, কবরে যাওয়ার সময়ও বলবে! তাকাও ওর মুখের দিকে, চোখের দিকে। দেখলেই বুঝবে ও মিথ্যে বলছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুক তো। পারবে না। কী ক'রে পারবে? মিথ্যেবাদী যে!'

অন্য কয়েদীটা আমার কয়েদীর দিকে তাকায়নি একবারও। সৈনিকদের দিকে, আকাশের দিকে, মাটির দিকে এমন কি আমাদের দিকেও তাকাচ্ছে; কিন্তু, আমার কয়েদীর দিকে তাকাচ্ছে না ভুলেও। ঠকঠকিয়ে কাঁপছে সে—ভয়ে না ঠাণ্ডায় বুঝতে পারছি না।

'আর কথা না,' বললো সার্জেন্ট, 'মশালগুলো জ্বালো।'

সৈনিকদের কয়েকজন মশাল জ্বালতে লাগলো। এই অবসরে আমার কয়েদী তাকালো চারদিকে, এবং প্রথম বারের মতো লক্ষ্য করলো আমাকে। এখানে পৌঁছেই জো-র কাঁধ থেকে নেমে পড়েছিলাম আমি। সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি এক জায়গায়। আমার চোখের দিকে তাকালো লোকটা। পরিচয়ের কোনো চিহ্ন ফুটলো না তার চোখে। আমি দৃষ্টি দিয়ে তাকে বোঝাতে চাইলাম, এখনও আমি তার বন্ধু। লোকটা আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলো কিনা জানি না। আমার কানে বাজছে সকালে বলা ওর সেই কথাগুলো:

'তুই এখনো বাচ্চা। খারাপ হওয়ার মতো বড় এখনো হোসনি। আমার মনে হয় না তুই আমার খোঁজে সৈনিকদের নিয়ে এসেছিস।'

আমি বোঝাতে চাইলাম, সত্যিই আমি আনিনি সৈনিকদের। কিন্তু ওর চোখে বুঝতে পেরেছে এমন কোনো ভাব ফুটলো না। কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ ফেরালো সে।

মশাল জ্বালানো হয়ে গেছে। সৈনিকরা বন্দীদের নিয়ে নদীতে নোঙর ক'রে থাকা কারা-জাহাজের দিকে রওনা হলো।

মিস্টার ওপস্‌ল এই সময় ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু জো বললো, সে শেষ পর্যন্ত না দেখে যাবে না। অগত্যা মিস্টার ওপস্‌লও চললেন সৈনিকদের পেছন পেছন। আমি এখন হেঁটে চলেছি। কারণ জো একটা মশাল তুলে নিয়েছে হাতে।

প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর নদী তীরের এক কুটিরে পৌঁছুলাম আমরা। সৈনিকদের পেছন পেছন ঢুকে পড়লাম ভেতরে। উজ্জ্বল আগুন জ্বলছে কুটিরের ভেতর। একটা লণ্ঠন একটা টেবিলের ওপর। এক ধারে নিচু একটা বিছানা, পাশেই কতগুলো মাস্কেট খাড়া ক'রে রাখা। তিন চারজন সৈনিক শুয়ে আছে বিছানায়। আমরা ঢুকতেই তারা মুখ তুলে ঘুমঘুম চোখে তাকালো আমাদের দিকে। তারপর আবার শুয়ে পড়লো।

সার্জেন্ট টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা খাতায় তার তল্লাশী অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলো। এর পর অন্য কয়েদীটাকে নিয়ে যাওয়া হলো কুটির থেকে। নৌকায় তুলে তাকে পঠিয়ে দেয়া হবে কারা-জাহাজে।

আমার কয়েদী সেই একবারের পর আর তাকায়নি আমার দিকে। কুটিরে ঢুকেই সে আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগু-

নের দিকে তাকিয়ে শরীর গরম করতে করতে কী যেন চিন্তা করছে। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকালো সে। বললো :

'আমার কারণে কেউ ঝামেলায় পড়ুক তা চাই না। সেজন্যে একটা কথা বলতে চাই—আমার পালানো সম্পর্কে—'

'যতখুশি কথা বলতে পারবে,' জবাব দিলো সার্জেন্ট। 'কিন্তু এখানে না।'

'জানি, কিন্তু এটা অন্য ব্যাপার। না খেয়ে মানুষ থাকতে পারে না, অন্তত আমি পারি না। তাই জলাভূমির ওপাশের ঐ গ্রাম থেকে কিছু খাবার জোগাড় করেছিলাম আমি।'

'মানে চুরি?' বললো সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ, কোথা থেকে তা-ও বলছি—কামারের বাড়ি থেকে।'

'আ-চ্ছা!' জো-র দিকে তাকালো সার্জেন্ট।

'আ-চ্ছা!' জো তাকালো আমার দিকে।

'তেমন কিছু না,' বললো আমার কয়েদী, 'একটু রুটি, একটু ব্র্যাণ্ডি আর একটা পর্ক পাই।'

জো-র দিকে তাকালো সার্জেন্ট। 'আপনার বাসা থেকে চুরি হয়েছে এসব জিনিস?'

'আঁ—হ্যাঁ, আপনারা যখন এলেন ঠিক তখনই টের পেয়েছে আমার স্ত্রী। তাই না, পিপ?'

'ও!' জো-র দিকে ফিরে বললো আমার কয়েদী, 'তুমিই তাহলে কামার? ভাই, খুবই দুঃখের সাথে বলছি, তোমার পাইটা আমি খেয়ে ফেলেছি।'

'ভালোই করেছো,' বললো জো। 'যতক্ষণ ওটা আমার ততক্ষণ

খেলে কেনো অসুবিধা নেই। জানি না কী অপরাধ তুমি করেছো যা-ই ক'রে থাকো তার শাস্তি হিশেবে না খেয়ে মরো এটা আমরা কেউ চাইবো না। কী বলো, পিপ?'

আমার কয়েদী গলায় অদ্ভুত এক আওয়াজ ক'রে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। নৌকা ফিরে এসেছে। রক্ষীরা নদীর ঘাটে নিয়ে গেল তাকে। আমরাও গেলাম পেছন পেছন। নৌকায় ওঠানো হলো আমার কয়েদীকে। তার মতোই কয়েকজন কয়েদী দাঁড় টানতে শুরু করলো। মশালের আলোয় দেখতে পেলাম মাঝনদীতে নোঙর ক'রে থাকা জাহাজটাকে। নৌকা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ভিড়লো ওটার গায়ে। আমার কয়েদীকে জাহাজের পাশ দিয়ে তুলে নেয়া হলো ওপরে। এর পর আর তাকে দেখতে পেলাম না।

জ্বলন্ত মশালগুলো ছুঁড়ে দেয়া হলো নদীতে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। জো আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে।

# পাঁচ

বছর খানেক পর এক সন্ধ্যায় আমি আর জো বসে আছি রান্না-ঘরে আগুনের সামনে। মিসেস জো বিকেলে আঙ্কল পুমব্‌লচুকের সাথে বাজারে গেছে। এখনো ফেরেনি। ভীষণ শীত পড়েছে। আগুনের সামনে বসে থেকেও রেহাই নেই ঠাণ্ডার হাত থেকে।

আগুন একটু ঢিমিয়ে এসেছে। জো উঠে নতুন কয়েকটা কাঠ ঠেসে দিয়ে দরজার কাছে গেল। কান খাড়া ক'রে শুনলো কিছুক্ষণ, আঙ্কল পুমব্‌লচুকের টানাগাড়ির শব্দ পাওয়া যায় কিনা। তারপর আবার এসে বসলো আগের জায়গায়।

একটু পরেই বাইরে চাকার শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন আঙ্কল পুমব্‌লচুক আর আমার বোন। সোজা রান্না-ঘরে এলেন দু'জন। আমার বোন তার পশমী আলখাল্লাটা খুলতে খুলতে বললো :

'আজ যদি ছোঁড়া কৃতজ্ঞ না হয় তাহলে কোনোদিনই আর হবে না!'

আমার বয়েসী ছেলের পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমি তাকালাম মিসেস জো-র দিকে।

'আশা করি ভদ্রমহিলা ওকে উচ্ছন্নে দেবেন না,' বলে চললো আমার বোন। 'আমার ভয় ছোঁড়া না বখে যায়।'

'অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বললেন মিস্টার প্যাম্বলচুক। 'উনি তোমার পিপকে উচ্ছন্নে যেতে দেবেন না। পিপ যদি যেতে চায় তবু দেবেন না। ভীষণ কড়া ভদ্রমহিলা। ছেলে ছোকরাদের কীভাবে টিট রাখতে হয় জানেন।'

ভদ্রমহিলা! বিস্মিত দৃষ্টিতে জো'র দিকে তাকালাম আমি। ঠোঁট আর ভুরু নেড়ে উচ্চারণের ভঙ্গি করলাম, 'কে?' জো-ও একই রকম ঠোঁট আর ভুরু নেড়ে ভঙ্গি করলো, 'কে?'

আমার ভঙ্গিটা চোখ এড়িয়ে গেলেও জো-র ভঙ্গি দেখে ফেললো আমার বোন।

'হয়েছে কী তোমাদের দু'জনের?' চিৎকার করলো সে। 'বাড়িতে আগুন লেগেছে নাকি?'

'ঠিক তা না,' নরম গলায় বললো জো। 'তোমরা এক ভদ্রমহিলার কথা আলাপ করছিলে তো, ভাবছিলাম কে হতে পারেন উনি?'

'কে আবার? ভদ্রমহিলা একজন ভদ্রমহিলা,' বললো আমার বোন, 'যদি না মিস হ্যাভিশ্যামকে তুমি ভদ্রলোক বলতে চাও। তবে অত সাহস যে তোমার হবে না তা আমি জানি।'

'শহরে থাকেন সেই মিস হ্যাভিশ্যামের কথা বলছো?'

'আর কোনো মিস হ্যাভিশ্যাম আছে?' জবাব দিলো মিসেস জো। 'উনি চান পিপ ওঁর বাড়িতে গিয়ে খেলাধুলা করবে। বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, আমি পাঠাচ্ছি পিপকে? বদমাশটা যদি না যেতে চায় পিটিয়ে ওকে তক্তা বানাবো।'

মিস হ্যাভিশ্যামের কথা শুনেছি আমি। এতল্লাটের সবাই শুনেছে। খুব ধনী মহিলা। অদ্ভুত স্বভাবের। বিশাল এক অন্ধকার বাড়িতে প্রায় একা থাকেন। কখনো বের হন না বাড়ি থেকে।

'ভালো কথা,' বললো জো, 'কিন্তু, বুঝতে পারছি না উনি পিপকে চিনলেন কী ক'রে?'

'মহা জ্বালা দেখছি! চিৎকার করলো আমার বোন। 'কে বললো উনি চেনেন পিপকে?'

'কেউ বলেনি, তবে শুনলাম নাকি তিনি চাইছেন পিপ গিয়ে খেলা করুক তাঁর বাড়িতে।'

'কেন উনি আঙ্কল পুমব্‌লচুককে বলতে পারেন না, ওঁর বাড়িতে গিয়ে খেলার মতো কোনো বাচ্চা ছেলের কথা তাঁর জানা আছে কিনা? কে না জানে আঙ্কল পুমব্‌লচুক ভদ্রমহিলার প্রজা এবং উনি মাঝে মাঝে—খাজনা দেয়ার জন্যে যান ভদ্রমহিলার বাড়িতে? সেরকম কোনো সময় উনি বলতে পারেন না আঙ্কল পুমব্‌লচুককে একটা বাচ্চা ছেলে দেয়ার কথা? তখন আঙ্কল পুমব্‌লচুক ওঁকে বলতে পারেন না পিপের কথা? আঙ্কল পুমব্‌লচুক আমাদের ভালো চান না? কী মনে হয় তোমার?'

'শোনো, জোসেফ,' এতক্ষণে কথা বললেন আঙ্কল পুমব্‌লচুক, 'তুমি তো জানো আমরা সবাই মোটামুটি গরিব। কে জানে?—মিস হ্যাভিশ্যামের ওখানে খেলতে যাওয়ার বিনিময়ে পিপ কিছু পাবে। এদিকটার কথা ভেবেই আমি বলেছি ওর কথা।'

'শোনো, জোসেফ,' চেঁচালো আমার বোন, 'তুমি দুনিয়ার কী জানো? কী বোঝো? কিছুই না। পিপ সম্পর্কে, ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনোদিন কিছু ভেবেছো তুমি? ভাবোনি। আঙ্কল

প্যুমব্‌লচুক ভেবেছেন। উনি জানেন বড় হলে টাকা পয়সার দরকার হবে পিপের। কে দেবে সে টাকা? মিস হ্যাভিশ্যাম হয়তো দেবেন যদি ছোঁড়া ওঁর ওখানে যায় খেলতে এবং মন জুগিয়ে চলতে পারে। এ নিয়ে আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক এখনই পিপকে নিয়ে যাবেন। আজ রাতে ও ওঁর বাড়িতে থাকবে। কাল সকালে আঙ্কল ওকে নিয়ে যাবেন মিস হ্যাভিশ্যামের ওখানে।'

এরপর সে ধরলো আমাকে, ঈগল যেমন ধরে ভেড়ার বাচ্চাকে। হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালো একটা গামলার সামনে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডলে ডলে ধুইয়ে দিলো হাত, মুখ। তারপর আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে পরিয়ে দিলো সবচেয়ে ভালো কাপড়গুলো। এরপর নিচে এনে তুলে দিলো মিস্টার প্যুমব্‌লচুকের হাতে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ভদ্রলোক গ্রহণ করলেন আমাকে; যেন তিনি শেরিফ, সদ্য ধরা পড়া অপরাধীর দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। আমার হাত ধরে বললেন:

'একটা কথা মনে রেখো, ছেলে, যারা তোমাকে মানুষ করেছে তাদের কথা কোনোদিন ভুলে যেও না। যাওয়ার আগে সুন্দর ক'রে ভদ্রভাবে বিদায় নাও তাদের কাছ থেকে।'

'বিদায়, জো।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, পিপ বাবু!'

আঙ্কল প্যুমব্‌লচুকের হাত ধরে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

পরদিন সকাল দশটায় মিস্টার প্যুমব্‌লচুক আমাকে নিয়ে রওনা হলেন মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ির পথে। কাল রাতে গাড়িতে

এবং সকালে নাশতার টেবিলে বসার পর থেকে এত বেশি পরিমাণে আমার করণীয় অকরণীয় সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে গেছেন তিনি যে রওনা হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি রীতিমতো খুশি হয়ে উঠলাম। কিন্তু রেহাই কি আছে? গাড়িতেও চলতে লাগলো উপদেশ। আমি হুঁ-হাঁ ক'রে চললাম।

মিনিট পনর লাগলো মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে পৌঁছতে। ইটের তৈরি প্রাচীন ধাঁচের বাড়ি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। নানা জায়গায় কারণে অকারণে লোহার গরাদ লাগানো। এক ধারে একটা বড়সড় চোলাই খানা। একটাও দরজা বা জানালা খোলা দেখলাম না বাড়িটার।

গাড়ি থেকে নামলাম মিস্টার প্যুমব্‌লচুক আর আমি। ফটকের ঘণ্টা বাজানোর পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আমি উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম ফটকের ফাঁক দিয়ে। তখনও আমাকে উপদেশ বাণে জর্জরিত করছেন আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক। অবশেষে বাড়ির প্রধান দরজার পাশের একটা জানালা খুললো একটুখানি। পরিষ্কার একটা গলা জিজ্ঞেস করলো:

'কী নাম?'

'প্যুমব্‌লচুক।'

'ও, আচ্ছা।' জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার। কয়েক সেকেণ্ড পরেই চাবির গোছা হাতে একটা মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখলাম উঠানের ওপর দিয়ে। ফটকের কপাট খুলে দিলো সে। মিস্টার প্যুমব্‌লচুক আমাকে দেখিয়ে বললেন:

'এ হচ্ছে পিপ।'

'আচ্ছা! এ-ই পিপ?' বললো মেয়েটা। 'ভেতরে এসো, পিপ।'

অপূর্ব সুন্দরী সে। বয়েস আমার মতোই। দাঁড়ানোর, তাকানোর কথা বলার ভঙ্গিতে অহঙ্কার স্পষ্ট।

ফটক পেরিয়ে ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি। মিস্টার প্যামব্লচুকও ঢোকার জন্যে এগোলেন। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিলো মেয়েটা।

'আপনিও আসবেন নাকি?' বললো সে।

'মিস হ্যাভিশ্যাম যদি চান—,' অস্বস্তির সঙ্গে বললেন মিস্টার প্যামব্লচুক। ঢুকতে বাধা দেয়ায় তিনি যে মনক্ষুণ্ন তা বোঝা গেল তাঁর চেহারা দেখে।

'আপনি তো জানেন,' বললো মেয়েটা, 'আপনার সাথে কেন, কারো সাথেই উনি চান না দেখা করতে।'

অগত্যা ফটকের কাছ থেকেই বিদায় নিলেন আঙ্কল। ফটক বন্ধ করলো মেয়েটা। তালা লাগালো। তারপর আমাকে নিয়ে চললো উঠানের ওপর দিয়ে। ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে কৌতূহলী চোখে তাকালাম চোলাই খানাটার দিকে।

"ওখানে এপর্যন্ত যত বিয়ার চোলাই হয়েছে ইচ্ছে করলেই তুমি সব খেতে পারবে, বুঝলে হে ছেলে,' আমার কৌতূহলী চাউনি দেখে বললো মেয়েটা। একটু যেন বিদ্রূপ আর কৌতুকের সুর তার গলায়।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মিস,' থতমত খেয়ে আমি বললাম।

'এখন আর চোলাই করা হয় না, করা উচিতও না; করলে সব টকে যাবে। কী মনে হয় তোমার?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, মিস।'

'অবশ্য তুমি যদি খেতে চাও প্রচুর পাবে বাড়ির তল কুঠুরিতে।

'এই ছেলে, এত আস্তে হাঁটছো কেন?'

অদ্ভুত মেয়ে! বয়েসে আমার সমান অথচ কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সব বয়স্কদের মতো। তার ওপর সুন্দরী, এবং মনে হয় সে সম্পর্কে সে সচেতন। আমার সাথে এমন আচরণ করছে যেন সে রানী। আমাকে অনুগ্রহ দেখাচ্ছে দয়া ক'রে কথা বলে।

বাড়ির সামনের বড় দরজাটা বন্ধ। পাশের একটা দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। সামনে দীর্ঘ এক অন্ধকার অলিপথ। দরজার কাছে একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে গিয়েছিলো মেয়েটা। দরজা বন্ধ ক'রে ওটা তুলে নিয়ে সে বললো: 'এসো।'

ওর পেছন পেছন এগিয়ে চললাম আমি। অন্ধকার অলিপথ পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আবার অলিপথ। অবশেষে একটা দরজার সামনে থামলাম আমরা। আমার দিকে তাকালো মেয়েটা।

'ঢুকে পড়ো।'

'তোমার পরে, মিস,' লাজনম্রকণ্ঠে আমি বললাম।

'বোকার মতো কথা বোলো না, আমি ভেতরে ঢুকছি না।'

আমার দিকে একটা বিদ্রূপের চাউনি হেনে চলে গেল মেয়েটা। আরো ভয়ঙ্কর যেটা, মোমবাতিটা নিয়ে গেল সে। আমার বুকের ভেতর ধুক ধুক করতে লাগলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় আঘাত করলাম আস্তে। ভেতর থেকে একটা গলা বললো:

'এসো।'

ভেতরে ঢুকলাম আমি। বিরাট একটা কামরায় দেখতে পেলাম নিজেকে। মোমবাতির নিষ্প্রভ আলোয় আলোকিত ঘরটা। জানালার পর্দাগুলো সব টানা। দিনের আলো এক বিন্দু ঢুকতে পারেনি

ঘরে। আসবাবপত্র দেখে মনে হলো এটা সাজ-ঘর। চমৎকার একটা সাজ-টেবিলের সামনে বড় এক আরাম চেয়ারে বসে আছেন অদ্ভুত এক মহিলা। তাঁর এক হাত টেবিলের ওপর, অন্য হাতে ধরে আছেন মাথা।

আপাদমস্তক শাদা পোশাকে মোড়া তিনি। এমন কি জুতোও শাদা। শাদা একটা মস্তকাবরণ মাথায়। চুলে শাদা ফুল গোঁজা। চুলগুলোও সব শাদা। একটা মাত্র জুতো পরে আছেন তিনি। অন্যটা রাখা সাজ-টেবিলের ওপর। ওটা হয় এখনো পরেননি, নয় তো পরলেও কিছুক্ষণ আগে খুলে রেখেছেন। মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু দামী পোশাক, আধভরা কাপড়ের বাক্স এবং আরো নানা জিনিস। আমার পায়ের শব্দ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

'কে?'

'পিপ, ম্যা'ম।'

'পিপ?'

'মিস্টার প্যুমব্‌লচুক পাঠিয়েছেন, ম্যা'ম। খেলা করতে এসেছি।'

'কাছে এসো, দেখি তোমাকে। আরো কাছে।'

ভদ্রমহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না। চোরা চোখে চারদিকে দৃষ্টি বুলালাম একবার। দেখলাম ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটা থেমে আছে ন'টা বাজতে বিশ মিনিট ঘোষণা ক'রে।

'আমার দিকে তাকাও,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'ভয় পাচ্ছো আমাকে? মেয়েমানুষকে ভয়! আমাকে অদ্ভুত লাগছে?'

'না,' বললাম আমি। কথাটা যে সত্য নয় তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! এই মুহূর্তে মহিলার সামনে থেকে ছুটে পালাতে

পারলে বেঁচে যেতাম।

'জানো কতদিন আমি এবাড়ি ছেড়ে বেরোইনি? কত দিন সূর্যের মুখ দেখিনি?'

'না, ম্যা'ম।'

'তোমার জন্মের আগে থেকে।'

কোনো জবাব না দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মহিলা তাঁর হাত দুটো একটার ওপর আরেকটা ক'রে বুকের বাঁ-পাশে রাখলেন।

'জানো, এখানে আমি কী অনুভব করছি?'

'জি, ম্যা'ম।'

'কী বলো তো?'

'আপনার হৃদয়।'

'হ্যাঁ, ভাঙা।' বেদনাঘন চাউনি ফুটে উঠলো তাঁর চোখে। বলে চললেন, 'আমি ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত। সমর্থ পুরুষমানুষ মেয়ে মানুষ তো দেখলাম অনেক। যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু অন্যদিকে মন দিতে চাই। খেলা করো তুমি। খেলা করো!'

কিন্তু কী খেলবো আমি? কিছুই মাথায় আসছে না। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ।

'বেয়াদব নাকি?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'আমি তোমাকে খেলতে বলেছি।'

'না, ম্যা'ম, আমি বেয়াদব নই,' জবাব দিলাম। 'এখন আমি খেলতে পারবো না। খেলতে খুবই ভালো লাগে আমার, কিন্তু এখন খেলা আসছে না। কী করবো বুঝতে পারছি না। মাত্র এলাম। সব কিছু এমন নতুন, এমন অদ্ভুত এখানে! আর—আর বিষণ্ণ। আমি অভ্যস্ত নই এমন—।'

থেমে গেলাম আমি। ভয় হলো, বোধহয় ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছি। উচিত হয়নি এসব বলা।

মিস হ্যাভিশ্যাম আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের পোশাক দেখলেন। তারপর তাকালেন আয়নার দিকে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে লাগলেন :

'নতুন ওর কাছে! অথচ আমার কাছে কী পুরনো! ওর কাছে অদ্ভুত আর আমার কী পরিচিত! আর কী বিষণ্ণ আমাদের দু'জনের কাছেই!···এস্টেলাকে ডাকো।'

শেষের কথাটা যে আমাকে বলা হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি। ভদ্রমহিলা এখনো আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আমার ধারণা হয়েছে এ কথাটাও নিজের মনে বলেছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি চুপ ক'রে।

'এস্টেলাকে ডাকো!' চিৎকার করলেন তিনি। 'কানে শোনো না নাকি? ডাকো জলদি। দরজার কাছে গিয়ে চেঁচালেই হবে।'

মিস হ্যাভিশ্যামের আদেশ পালন করার কোনো ইচ্ছাই আমার হচ্ছে না। এমন অদ্ভুত বাড়িটা। তার চেয়েও অদ্ভুত এর অন্ধকার অলিপথ। অন্ধকার আর রহস্যময়। তবু আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। দরজা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম অন্ধকার অলিপথটায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাকলাম এস্টেলার নাম ধরে। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না প্রথমে। তিন চারবার ডাকার পর মোমবাতি হাতে এলো সে—রানীর মতো সুন্দরী আর অহঙ্কারী সেই মেয়েটা।

মিস হ্যাভিশ্যাম তাকে কাছে ডাকলেন। এগিয়ে গেল সে।

'ছেলেটার সাথে তাস খেল, আমি দেখি,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'এই ছেলের সাথে!' মুখ বেঁকিয়ে বললো মেয়েটা। 'এ তো সাধারণ এক কাজের ছেলে, ছোট লোক!'

মৃদুস্বরে একটা জবাব দিলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। এত মৃদু স্বরে যে আমার মনে হলো আসলে তিনি কথাটা বলেননি, আমি কল্পনা ক'রে নিয়েছি কথাটা:

'এ-ই তো ভালো। সহজে ওর হৃদয় ভেঙে দিতে পারবে।'

'এই ছেলে, কী খেলা পারো তুমি? তাচ্ছিল্যের সাথে প্রশ্ন করলো এস্টেলা।

'"ফকির ফকির" ছাড়া আর কিছু না, মিস।'

'ফকির করো ওকে,' এস্টেলাকে নির্দেশ দিলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

তাস নিয়ে বসলাম আমরা। এবং এই প্রথম লক্ষ্য করলাম ঘড়িটার মতো এঘরের সব কিছু থেমে গেছে অনেক অনেকদিন আগে। এস্টেলা যখন তাস বাঁটছে আমি তখন এক পলক তাকালাম সাজ টেবিলটার দিকে। ওটার ওপরের জুতোটা এককালে সাদা থাকলেও এখন হলদেটে হয়ে গেছে, এবং কখনোই ওটা পরা হয়নি। প্রথমবার পরার আগে ওটা টেবিলে রাখা হয়েছিলো, সেই থেকে জুতোটা ওখানে আছে। যে পায়ে ওটা পরার কথা ছিলো সেটার দিকে তাকালাম। দেখলাম রেশমী মোজাটারও এক দশা। এককালে শাদা ছিলো এখন হলদেটে হয়ে খসে খসে পড়ছে। ভদ্রমহিলার গায়ের পোশাকটারও এক অবস্থা। নিঃসন্দেহে ওটা বিয়ের পোশাক ছিলো। কিন্তু এখন তাতে শ্বেতশুভ্র উজ্জ্বলতার বদলে ফ্যাকাসে একটা ভাব, যেন কবরের পোশাক।

ভদ্রমহিলা বসেও আছেন তেমন, মৃতের মতো। নিষ্প্রভ দুটো চোখ মেলে দেখছেন আমাদের খেলা।

'কী রুক্ষ হাতগুলো ওর,' প্রথমবার খেলা শেষ হওয়ার আগেই আমাকে দেখিয়ে বললো এস্টেলা। 'আর কী বেটপ জুতো পরেছে!'

শুনে ভীষণ কষ্ট হলো আমার। আমার হাত রুক্ষ এর আগে এমন কথা আর কেউ বলেনি। পোশাক পরিচ্ছদ যে আমার খারাপ তা আমি জানি। কিন্তু এটাও মুখের ওপর কেউ কোনোদিন বলেনি এর আগে। সামনে বসা মেয়েটার তুলনায় খুবই ছোট, খুবই তুচ্ছ মনে হতে লাগলো আমার নিজেকে। চলে যাওয়ার ইচ্ছে হলো এবাড়ি ছেড়ে। কিন্তু সাহস হলো না। খেলতে লাগলাম।

প্রথমবারের খেলা শেষ হলো। ও জিতলো। পরের বারের জন্যে তাস বাঁটতে লাগলাম আমি। এমনিতেই আমি অপটু খেলায়, তার ওপর এখানকার পরিবেশ ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। স্বভাবতই ভুল করতে লাগলাম বাঁটার সময়। এতে রেগে গেল এস্টেলা। গাধা, বেআক্কেল, অকর্মা ইত্যাদি বলে গাল দিতে লাগলো আমাকে।

'তুমি কিছু বললে না ওকে?' মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন আমাকে। 'ও তোমাকে কত শক্ত শক্ত কথা বললো, অথচ তুমি একটা কথাও বললে না। কী ভাবো তুমি ওকে?'

'তা—তা আমি বলতে চাই না,' তো তো ক'রে আমি বললাম।

'আমার কানে কানে বলো।' মিস হ্যাভিশ্যাম ঝুঁকে এলেন আমার দিকে।

'আমার মনে হয় ও খুব অহঙ্কারী,' ফিস ফিস ক'রে আমি বললাম।

'আর কিছু না?'

'আর—আর খুব সুন্দরী।'

'আর কিছু?'

'মানুষকে অপমান করে আনন্দ পায়।'

'আর?'

'আমি এখন বাড়ি যেতে চাই।'

'সুন্দরী মেয়েটাকে আর কখনো দেখতে চাও না?'

'ঠিক জানি না দেখতে চাই কি না, তবে বাড়ি যেতে চাই এখনই।'

'ঠিক আছে যেও,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'আগে খেলাটা শেষ করো।'

শেষ হলো খেলা। এবারও এস্টেলা জিতলো। তাসগুলো ও টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিলো। ভাবখানা আমার সাথে জেতার ব্যাপারটাকে ও আমল তো দেয়ই না বরং ঘেন্না করে। একান্ত নিরুপায় হয়েই যে সে খেলেছে, বোঝা গেল স্পষ্ট।

'আবার কবে তুমি আসবে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'দাঁড়াও ভেবে দেখি।...আ-হা'। বার তারিখ কিছুই জানি না আমি। ঠিক আছে ছ'দিন পর আবার এসো। বুঝেছো?'

'জি, ম্যা'ম।'

'এস্টেলা, নিচে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দাও ওকে। দেখো খাওয়ার পর যেন ঘুরে ফিরে দেখতে পারে বাড়িটা। যাও, পিপ।'

এস্টেলা মোমবাতি হাতে পথ দেখালো। নিচে নেমে যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেই দরজার কাছে গিয়ে ও মেলে ধরলো কপাট। সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। মোমের আলোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো চোখ। এক পাশে সরে দাঁড়ালো এস্টেলা। আমি দরজা পেরিয়ে উঠানে নেমে দাঁড়ালাম।

'এখানে থাকো,' বলে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো ও।

উঠানে একা হতেই আমি তাকালাম আমার হাত আর জুতো-গুলোর দিকে। সত্যিই হাতদুটো আমার রুক্ষ আর জুতোজোড়া বেঢপ, এস্টেলা যেমন বলেছে। আগে কখনো এগুলোর কথা ভাবিনি আমি। ভাবার প্রয়োজনই পড়েনি। কিন্তু এখন, এস্টেলা বলার পর ভীষণ দুঃখ হলো আমার। মনে হলো এজন্যে জো-ই দায়ী। জো-র কারণেই আমার হাতগুলো এমন রুক্ষ, কর্কশ হয়েছে। জো-র কারণেই আমার জুতো এমন বেঢপ চেহারার। আরো মনে হলো জো-ই আমাকে ভালো ক'রে আদব কায়দা শেখায়নি। শেখালে মিস হ্যাভিশ্যাম আজ আমাকে বেয়াদব বলতে পারতেন না।

ফিরে এলো এস্টেলা খানিকটা রুটি, মাংস আর এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে। খাবারগুলো ও দরজার নিচে মাটিতে রাখলো। আমার দিকে তাকালোও না একবার, যেন পথের বেওয়ারিশ কুকুরকে খেতে দিচ্ছে। ভীষণ অপমানিত বোধ করলাম আমি। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। ঠিক এই সময় পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এস্টেলা। ওর চোখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক আনন্দের চাউনি। আমাকে কাঁদাতে পেরে খুশি ও! এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ও ঢুকে গেল ভেতরে। বন্ধ ক'রে দিলো দরজা।

ও চলে যেতেই আমি লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগলাম। আমার এই অপমানিত মুখ আর দেখাতে চাই না মানুষকে। গোলাইখানার দরজাগুলোর একটার আড়ালে ছুটে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম দেয়ালে হেলান দিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে হতাশায় দেয়ালে লাথি মারলাম, মাথার চুল টানলাম আক্রোশে।

আস্তে আস্তে মন শান্ত হলো আমার। কেঁদে, দেয়ালে লাথি

মেরে, চুল টেনে অপমান, হতাশা, আক্ষেপ মোটামুটি ভুলতে পেরেছি। চোখ মুছে বেরিয়ে এলাম দরজার আড়াল থেকে। এস্টেলার দেয়া খাবারটুকু খেলাম নীরবে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিলো। ক্ষণে পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম।

খাওয়া শেষ ক'রে বাড়িটার চার দিক তাকালাম। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই উঠানে। উঠানের ওপ্রান্তে একটা বাগান। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম আমি। বেয়ে হেয়ে উঠে পড়লাম দেয়ালের ওপর। তাকালাম বাগানের দিকে। লম্বা ঘাস আর আগাছায় পূর্ণ। সন্দেহ নেই, অনেক দিন কোনো পরিচর্যা হয় না এ বাগানের, কেউ আসে না এখানে।

দেয়াল থেকে তখনো নামিনি আমি, এস্টেলা এলো। হাতে চাবির গোছা। ফটক খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। দেয়াল থেকে নামলাম আমি। পা পা করে এগিয়ে গেলাম ফটকের কাছে। একবারও তাকালাম না এস্টেলার দিকে। বেরিয়ে যাচ্ছি ফটক পেরিয়ে। এই সময় আমার কাঁধে হাত রাখলো ও। বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলো :

'কাঁদছো না কেন ?'

'কাঁদতে চাই না তাই,' আমি বললাম।

'চাও,' বললো এস্টেলা। 'একটু আগেই তো কাঁদছিলে, এমন কান্না যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলে না।' কৌতুকের একটু হাসি হাসলো সে। 'এই তো ! মনে হচ্ছে এখনই আবার কেঁদে ফেলবে।'

আমাকে ঠেলে ফটকের বাইরে বের ক'রে দিলো সে। তারপর খটাং ক'রে কপাট বন্ধ ক'রে তালা লাগিয়ে দিলো।

সোজা মিস্টার পুমব্‌লচুকের বাড়িতে গেলাম আমি। উনি বাড়িতে নেই দেখে খুবই স্বস্তি বোধ করলাম। মিস হ্যাভিশ্যাম ছ'দিন পর আবার যেতে বলেছেন, খবরটা ওঁর বাড়িতে দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম চারমাইল দূরে আমাদের কামারশালার দিকে। কানে বাজছে এস্টেলার কথা: 'এ তো সাধারণ এক কাজের ছেলে!' চোখে ভাসছে ওর বিদ্রূপ পূর্ণ চাউনি, আচরণ, হাসি।

# ছয়

বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আমার বোন চড়াও হলো আমার ওপর। মিস হ্যাভিশ্যাম এবং তাঁর বাড়ি সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন ক'রে চললো। আমি দু'এক কথায় হুঁ হাঁ ক'রে জবাব দিলাম, কিন্তু মিসেস জো শুনতে চায় সবিস্তার বর্ণনা, কী ঘটেছে, কী দেখেছি তার অনুপুঙ্খ বিবরণ। আমি সেসবের ধার দিয়েও গেলাম না। ফলে প্রচুর পরিমাণে পিঠে চড়, ঘাড়ে চাপড়, কাঁধে ঝাঁকুনি খেলাম। ঘণ্টাখানেক একটানা চেষ্টা ক'রেও যখন আমাকে দিয়ে যথেষ্ট কথা বলাতে পারলো না তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কাজে মন দিলো সে।

আপাতত আমি রেহাই পেলেও বিকেলে আবার ধরা পড়লাম : এবার আঙ্কল পুমব্‌লচুকের হাতে। বিকেলে চায়ের সময়, হাজির হলেন তিনি। উনিও আমার বোনের মতোই সবিস্তারে শুনতে চান সব। আগুনের সামনের চেয়ারটায় বসার পর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে জিজ্ঞেস করলেন :

'তারপর, পিপ, কেমন কাটালে ওবাড়িতে ?'

'ভালোই, স্যার,' আমি জবাব দিলাম।

'ভালোই ?' বললেন মিস্টার পুমব্‌লচুক, 'এটা কোনো জবাব হলো ? ভালোই মানেটা কী তাই বলো।'

হঠাৎ ক'রেই দুষ্টু বুদ্ধি ভর করলো আমার মাথায়। বললাম 'ভালোই মানে ভালোই।'

জবাবটা শুনে ভদ্রলোকের চেহারা যা হলো সে দেখার মতো। আর আমার বোন তো প্রায় উড়ে চলে এলো আমার মতো বেয়াদবকে শায়েস্তা করার জন্যে। আত্মরক্ষা করার মতো কোনো ছায়া আমি পেলাম না, কারণ জো তখন কামারশালায় কাজে ব্যস্ত। মিস্টার পুমব্‌লচুকই বাঁচালেন আমাকে।

'না, মা, না, মেজাজ খারাপ কোরো না,' বললেন তিনি, 'আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে।'

আঙ্কল বলেছেন, না শুনে পারে ? শান্ত হয়ে গেল আমার বোন।

এরপর মিস্টার পুমব্‌লচুক আমাকে ধরে শক্ত হাতে ফেরালেন তাঁর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন :

'বলো, তেতাল্লিশ পেন্সে কত হয় ?'

'চারশো পাউণ্ড,' বললে কী পরিণতি হতে পারে আন্দাজ ক'রে সঠিক জবাবটা ভাবতে লাগলাম। ভাবার জন্যে যথেষ্ট সময় দিলেন আমাকে আঙ্কল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বললেন :

'বারো পেন্সে এক শিলিং যদি হয় চল্লিশ পেন্সে তিন শিলিং চার পেন্স, তাই না? এখন বলো, তেতাল্লিশ পেন্সে কত?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর জবাব দিলাম :

'জানি না।'

কিন্তু উনি যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার মুখ দিয়ে সঠিক জবাবটা বের ক'রে তবে ছাড়বেন। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাত শিলিং ছয় পেন্স তিন ফার্দিং হতে পারে?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বোনের প্রবল চপেটাঘাত আমার কানের ওপর। চড়টার ফলে আর কিছু না হোক আঙ্কল-এর রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। বিব্রত মুখভঙ্গি হলো তাঁর। তাঁর কারণে আমি এমন একটা চড় খাবো ভদ্রলোক ভাবতেই পারেননি। তাঁর মিইয়ে যাওয়া মুখ দেখে চড় খাওয়ার কথা ভুলে গেলাম আমি।

'আচ্ছা ওসব কথা থাক,' একটু পরেই সামলে নিয়ে তিনি বললেন। 'মিস হ্যাভিশ্যামকে কেমন দেখলে বলো।'

আবার দুষ্টু বুদ্ধিটা চাগিয়ে উঠলো আমার মাথায়। বললাম, 'ভীষণ লম্বা, গায়ের রং বাদামী।'

'তাই নাকি, আঙ্কল?' জিজ্ঞেস করলো আমার বোন।

মিস্টার পুামব্‌লচুক কয়েকবার চোখ পিট পিট ক'রে মাথা ঝাঁকালেন। ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম তিনি কখনো দেখেননি মিস হ্যাভি-

শ্যামকে।

'আচ্ছা, এবার বলো, তুমি যখন ঢুকলে, উনি কী করছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার প্লামব্‌লচুক।

'বসে ছিলেন,' আমি বললাম, 'কালো মখমলে মোড়া একটা কোচে।'

একে অন্যের দিকে তাকালেন মিস্টার প্লামব্‌লচুক আর মিসেস জো। দু'জন এক সাথে উচ্চারণ করলেন, 'কালো মখমলে মোড়া কোচে!'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'মিস এস্টেলা—মনে হয় ভদ্রমহিলার ভাই বা বোনের মেয়ে—সোনার থালায় ক'রে কেক আর মদ এনে দিলো, উনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিলেন থালাটা মিস এস্টেলা আমাকেও দিয়েছিলো কেক আর মদ, সোনার থালায়; নিজেও নিয়েছিলো। কোচের পেছনে চড়ে বসে আমি খেয়েছি।'

'আর কেউ ছিলো ওখানে?' আঙ্কলের প্রশ্ন।

'চারটে কুকুর।'

'বড় না ছোট?'

'বিরাট একেকটা। একটা রুপোর ঝুড়িতে কাটলেট ছিলো, সেগুলো খাওয়ার জন্যে কী কাড়াকাড়ি তাদের!'

আবার একজন আরেকজনের দিকে তাকালেন আঙ্কল আর আমার বোন। দু'জনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

'কোথায় ছিলো রে কোচটা?' প্রশ্ন করলো মিসেস জো।

'মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে।' আবার দু'জন মুখ চাওয়া চাওই করলেন। 'কিন্তু কোনো ঘোড়া জোড়া ছিলো না ওতে।'

'এ সম্ভব, আঙ্কল?' জিজ্ঞেস করলো মিসেস জো। 'কী বলছে

ছোঁড়া ?'

'আমার মনে হয়, মা, ও যেটাকে কোচ বলছে সেটা আসলে একটা সেডান চেয়ার,' বললেন মিস্টার প্যুমব্‌লচুক। 'মহিলা ভীষণ খেয়ালী, বুঝলে—ভীষণ খেয়ালী। সেডান চেয়ারে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়া খুবই সম্ভব তাঁর পক্ষে।'

'আপনি কখনো দেখেছেন ওঁকে ওটায় বসে থাকতে ?' জিজ্ঞেস করলো আমার বোন।

'কী ক'রে,' অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আঙ্কল, 'যেখানে আমি ভদ্রমহিলাকে জীবনে দেখিইনি কোনোদিন ?'

'কী বলছেন, আঙ্কল! তারপরও আপনি কথা বলেছেন তাঁর সাথে ?'

'কেন জানো না ? দরজার বাইরে থেকে কথা বলি আমি। দরজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। দরজা খোলা থাকে, কিন্তু পর্দা থাকে টানা। উনি ভেতর থেকে কথা বলেন, আমি বাইরে থেকে জবাব দেই। ঐ ঘরে ছেলেটা খেলতে গিয়েছিলো! কী খেললে, পিপ ?'

'পতাকা নিয়ে খেলেছি আমরা,' আমি বললাম (এখন আমি বেপরোয়া, যা মুখে আসছে তা-ই বলছি)।

'পতাকা!' প্রতিধ্বনি করলো আমার বোন।

'হ্যাঁ। এস্টেলা নীল পতাকা নাড়ছিলো, আমি নাড়ছিলাম সবুজ পতাকা, আর মিস হ্যাভিশ্যাম ছোট্ট ছোট্ট সোনালি তারা আঁকা একটা পতাকা নাড়ছিলেন কোচের জানালা দিয়ে। এরপর আমরা তলোয়ার নিয়ে খেলেছি, ইচ্ছামতো হৈ চৈ করেছি।'

'তলোয়ার!' সবিস্ময়ে বললো আমার বোন। 'কোথায় পেলি

তুই তলোয়ার ?'

'একটা কাবার্ডের ভেতর। পিস্তলও ছিলো ওতে—আর গুলি। জানালো দরজা বন্ধ আর পর্দা টানা ছিলো ঘরটায়, দিনের আলো ঢুকতে পারছিলো না একটুও। তবে তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল ছিলো ঘর।'

'সত্যি কথাই বলেছে ও,' মিসেস জো-র দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার প্যামব্‌লচুক। 'আমি নিজেও দেখেছি, ঘরটায় সবসময় মোমবাতি জ্বলে।'

আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না ওঁরা। দু'জন আলাপ করতে লাগলেন আমার বলা কথাগুলো নিয়ে। এই সময় কামারশালার লাগোয়া দরজাটা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো জো এক কাপ চা খাওয়ার আশায়। স্ত্রী আর চাচার কথাবার্তার যেটুকু কানে ঢুকলো তাতেই চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো ওর। ও আর নড়তে পারলো না সেখান থেকে। হাঁ ক'রে শুনতে লাগলো তাঁদের আলাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপের মোড় ঘুরে গেল। মিস হ্যাভিশ্যামের কাছ থেকে আমার কী প্রাপ্তি হতে পারে তা নিয়ে কথা শুরু হলো। আমার বোন বললো, আমাকে কিছু সম্পত্তি দিলেই ভালো করবেন ভদ্রমহিলা। মিস্টার প্যামব্‌লচুক বললেন, তাঁর তা মনে হয় না, কিছু নগদ টাকা দিলেই ভালো হবে। এই পর্যায়ে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না জো। বললো:

'কাটলেট নিয়ে ঝগড়া করছিলো যে কুকুরগুলো ওদের একটাকে পাওয়াই সবচেয়ে ভালো হবে পিপ-এর জন্যে।'

'গাধার মাথায় এর চেয়ে ভালো আর কী বুদ্ধি আসবে?' খেঁকিয়ে উঠলো জো-র স্ত্রী। 'হাতে যদি কোনো কাজ থাকে দয়া

ক'রে করো গিয়ে ওখানে হাবার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে।'

চলে গেল জো।

একটু পরে যখন মিস্টার পুমব্‌লচুক বিদায় নিলেন আর আমার বোন ঘরের কাজে মন দিলো তখন আস্তে আস্তে আমি গিয়ে ঢুকলাম কামারশালায়। বললাম :

'তোমার আগুন নিবে যাওয়ার আগেই, জো, তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'তাই নাকি, পিপ? তাহলে বলে ফেল। কী হয়েছে?'

'জো,' এক হাত দিয়ে জামার কোনা পাকাতে পাকাতে মুখ নিচু ক'রে আমি বললাম, 'মিস হ্যাভিশ্যাম এবং তাঁর বাড়ি সম্পর্কে সব শুনেছো তো?'

'হ্যাঁ। দারুণ সব ব্যাপার, তাই না?'

'জো!' ওগুলো—ওগুলো সব মিথ্যে কথা।'

'কী বলছো তুমি, পিপ!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো জো। 'তুমি—তুমি নিশ্চয়ই সত্যি কথা—'

'হ্যাঁ, জো, সত্যি কথাই বলছি। সব—সব মিথ্যা।'

'তা কী ক'রে হয়! কালো মখমলে মোড়া কোচ দেখনি?' মাথা নাড়লাম আমি। 'কুকুরগুলো? পিপ—পিপ, আমার দিকে তাকাও, কুকুরগুলো নিশ্চয়ই ছিলো?'

'না, জো।'

'একটা কুকুর? অন্তত একটা কুকুরের বাচ্চা? বলো!'

'না, জো, ওদের যা বলেছি সব মিথ্যা।'

হতাশ চোখে আমার দিকে তাকালো জো। 'পিপ বাবু, খুব

খারাপ কাজ করেছো। জানো মিথ্যে বললে কোথায় যেতে হয়?'

'জো—জো—'আর কিছু বলতে পারলাম না আমি।

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার।' বললো জো। 'কী ভর করেছিলো তোমার ঘাড়ে?'

'জানি না, জো।' জামার হাতটা ছেড়ে দিলাম আমি। ওর পায়ের কাছে ছাইয়ের ওপর বসে পড়ে বললাম, 'আমাকে আরেকটু ভদ্র হতে শেখাওনি কেন তুমি? কেন আমার হাত এমন রুক্ষ, খস-খসে? কেন আমার জুতো এমন বেঢপ? এসবের কারণে ও বাড়িতে আজ আমি কী ব্যবহার পেয়েছি জানো?—'

গড় গড় ক'রে আমি বলে গেলাম যা যা ঘটেছে সব। চুপ ক'রে শুনলো জো। তারপর বললো:

'তবু, পিপ বাবু, মিথ্যা মিথ্যাই, যে কারণেই বলে থাকো না কেন, আর কখনো বলবে না; কেমন?'

আমি ঘাড় কাত ক'রে সায় দিলাম। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললাম, 'জো, তুমি রাগ করোনি তো আমার ওপর?'

'না, বাবু। তবে আবার যদি মিথ্যে কথা বলো তাহলে করবো। আর কখনো মিথ্যা বোলো না, কেমন?'

আমি ঘাড় কাত করলাম।

দু'দিন পর আমার মাথায় বুদ্ধিটা এলো: এস্টেলা যে অপমান করেছে তার শোধ নিতে পারার, আমি যে সাধারণ কাজের ছেলে নই তা প্রমাণ করতে পারার একটাই মাত্র উপায় আছে—শিক্ষিত হতে হবে আমাকে, বিডি যা যা জানে সব জেনে নিতে হবে ওর কাছ থেকে।

বিডি মিস্টার ওপস্‌লের ভাইঝি। ওর দাদী অর্থাৎ মিস্টার ওপস্‌লের এক চাচী তাঁর বাড়িতে একটা স্কুল চালান। রোজ সন্ধ্যায় পাঠ দেন তিনি, বিনিময়ে সন্ধ্যা পিছু দু'পেন্স ক'রে নেন। ভদ্র-মহিলা এত বৃদ্ধ যে চোখে কিছু দেখতে পান না আর প্রায়ই পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন বিডি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব নেয়। বিডিও আমার সমবয়েসী। ভীষণ প্রখর ওর স্মৃতিশক্তি। একবার যা পড়ে বা শোনে, কখনো ভোলে না। বিডির দাদীর স্কুলে পড়ে আমি এতদিনে বর্ণমালা চিনেছি কেবল, চেষ্টা ক'রে কোনোমতে লিখতেও পারি সেগুলো; কিন্তু বিডি অনর্গল পড়তে তো বটেই লিখতেও পারে যে কোনো কিছু।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমি বিডিকে গিয়ে বললাম আমি ওর কাছে লেখাপড়া শিখিতে চাই; ও যদি রাজি থাকে ও যা যা জানে সব শিখে নিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে বিডি রাজি হলো আমাকে শেখাতে। স্বস্তি বোধ করলাম আমি। একটু সময় লাগবে সন্দেহ নেই, তবু এই একটা মাত্র উপায়েই আমি এস্টেলার কাছে প্রমাণ করতে পারবো ও যতটা ভাবছে ততটা সাধারণ আমি নই, আমিও লিখতে পড়তে পারি।

আমাদের গ্রামে ছোট্ট একটা সরাইখানা মতো আছে। জো মাঝে মাঝে সেখানে যায়। ওর সামান্য যে দু'একজন বন্ধু-বান্ধব আছে তাদের সাথে আড্ডা দেয়, ধূমপান করে, দু'এক গ্লাস মদ খায়।

একদিন, ও গিয়েছে ওখানে। স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি যেন জো কে ডেকে নিয়ে আসি এ ব্যাপারে কড়াকড়ি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলো আমার বোন। সুতরাং বিডির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম সেখানে।

সরাইখানাটার নাম 'থ্রি জলি বার্গমেন'। ভেতরে ঢুকে দেখলাম মিস্টার ওপস্‌ল আর অপরিচিত এক লোকের সাথে আগুনের সামনে বসে আছে জো। আমাকে দেখেই ও চিৎকার ক'রে উঠলো:

'আরে, পিপ বাবু যে। এসো এসো!' জো-র কথা শুনে অপরিচিত লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো আমাকে।

অদ্ভুত লোকটা। আগে কখনো দেখিনি তাকে। মাথাটা এক দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। একটা চোখ আধ বোঁজা, যেন অদৃশ্য কোনো বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে কোনো কিছুর দিকে। মুখে পাইপ। মাঝে মাঝে ওটা মুখ থেকে সরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে সে। আমি কাছে পৌঁছুতেই লোকটা এক পাশে সরে বসার জায়গা ক'রে দিলো আমাকে। কিন্তু আমি বরাবরের মতো জো-র পাশেই বসলাম। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো লোকটা, তারপর ফিরলো জো-র দিকে।

'আপনি বলছিলেন, আপনিই কামার এ গ্রামের,' বললো সে।

'হ্যাঁ,' বললো জো।

'কী পান করবেন বলুন, মিস্টার—? ও-হো, আপনার নামটা জানা হয়নি।'

জো নাম বললো।

'হ্যাঁ, মিস্টার গারগেরি, বলুন, কী পান করবেন? অবশ্যই আমার পয়সায়—'

'দেখুন,' জো বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি মানুষের পয়সায় পান করার অভ্যাস আমার নেই।'

'অভ্যাস! না, না, অভ্যাসের কথা বলছি না,' জবাব দিলো

লোকটা। 'শনিবারের রাত আজ, আমি মনের আনন্দে খাওয়াতে চাইছি। না করবেন না, দয়া ক'রে। বলুন একটা নাম।'

'কারো মনে কষ্ট দেয়া আমার স্বভাব নয়। ঠিক আছে, রাম।'

'রাম,' বললো লোকটা। মিস্টার ওপস্‌লের দিকে তাকালো, 'আপনি?'

'আমিও রাম,' বললেন মিস্টার ওপস্‌ল।

'তিনটে রাম!' চেঁচালো অপরিচিত লোকটা। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম ক'রে বসলো সে। তারপর বললো, 'আপনাদের এই এলাকাটা বেশ নির্জন।'

'হ্যাঁ, জলা এলাকা তো,' বললো জো।

'তা ঠিক, তা ঠিক। তবু জিপসী বা ভবঘুরে ধরনের লোকজন আসে না এদিকে?'

'না,' বললো জো। 'মাঝে মাঝে কারা-জাহাজ থেকে পালানো কয়েদীরা আসে, তবে তাদের দেখার খুব একটা সৌভাগ্য আমাদের হয় না। জলাভূমিতে লুকিয়ে থাকে।'

'এক-দু'বারও দেখেননি?' প্রশ্ন করলো লোকটা।

'একবার,' বললো জো। 'এই তো কিছুদিন আগে। আমি, মিস্টার ওপস্‌ল, পিপ তিনজনই গিয়েছিলাম সৈনিকদের সঙ্গে, তাই না, পিপ?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

আবার আমার দিকে তাকালো আগন্তুক। এখনও তার চোখ দুটো সেরকম; একটা খোলা, একটা আধ বোঁজা।

'বেশ ছেলেটা,' বললো সে, 'কী বলে যেন ডাকলেন ওকে?'

'পিপ,' বললো জো।

'অদ্ভুত নাম। আপনার ছেলে?'

একটু ইতস্তত করলো জো। 'ন্-না।'

'আত্মীয়?'

'হ্-হ্যাঁ।'

এখনও লোকটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অবশেষে তিন গ্লাস রাম দিয়ে গেল সরাইওয়ালা। যে যার গ্লাস তুলে নিলো। আগন্তুক লোকটা এক দিকে একটু ঘুরে বসলো। এখন সে প্রায় পেছন ফিরে আছে জো আর মিস্টার ওপস্‌লের দিকে। কিন্তু আমি তার সামনেটা দেখতে পাচ্ছি ঠিকই।

এরপর লোকটা যা করলো তা দেখে আমি চমকে উঠলাম বললে কম বলা হবে, সত্যি কথা বলতে কি প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো আমার। পকেট থেকে একটা রেতি বের ক'রে সে নাড়লো রামটুকু। তারপর রেতিটা আবার পকেটে রেখে চুমুক দিলো গ্লাসে। এখনও লোকটা চোখ সরায়নি আমার ওপর থেকে।

রেতিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি আমি। জো-র কামারশালা থেকে চুরি ক'রে নিয়ে ওটা আমি দিয়েছিলাম আমার কয়েদীকে। তার মানে এই লোকটা আমার কয়েদীকে চেনে। না হলে এই রেতি ওর কাছে এলো কী ক'রে। আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। লোকটা মুচকি হেসে এক চুমুকে শেষ ক'রে ফেললো রামটুকু। তারপর তাকালো জো আর মিস্টার ওপস্‌লের দিকে। ওঁদেরও গ্লাস খালি হয়ে গেছে।

'এবার আমাদের যেতে হবে,' বলে উঠে দাঁড়ালো জো।

'এক সেকেণ্ড, মিস্টার গারগেরি,' বললো লোকটা। 'আমার

কাছে বোধহয় চকচকে একটা শিলিং আছে। ছেলেটাকে উপহার দিতে চাই।'

পকেট থেকে এক মুঠো মুদ্রা বের করলো সে। ওগুলো থেকে একটা বেছে নিয়ে দুমড়ানো মোচড়ানো দুটো কাগজ দিয়ে ঝটপট মুড়ে ধরিয়ে দিলো আমার হাতে।

'তোমার,' বললো লোকটা। 'তোমার নিজের একেবারে, বুঝলে!'

তাকে ধন্যবাদ জানালাম আমি। জো এবং মিস্টার ওপস্‌লকে শুভরাত্রি জানালো সে। তারপর আমরা বেরিয়ে এলাম সরাই-খানা থেকে।

বাড়ি ফিরে আমার বোনকে পুরো ঘটনাটা বললো জো। শুনেই ভ্রূকুটি ক'রে স্বভাবসুলভ রুক্ষকণ্ঠে মিসেস জো বললো:

'নিশ্চয়ই লোকটার কোনো বদমতলব আছে। দেখি শিলিংটা!'

কাগজের ভেতর থেকে বের ক'রে ওটা আমি দিলাম বোনের হাতে। দেখা গেল ঠিকই আছে শিলিংটা।

'কিন্তু একী?' চিৎকার ক'রে আমার হাত থেকে কাগজ দুটো কেড়ে নিলো মিসেস জো। 'দুটো এক পাউণ্ডের নোট! নিশ্চয়ই লোকটা ভুল করেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে আবার হ্যাট মাথায় দিলো জো। পাউণ্ড দুটো নিয়ে ছুটলো সরাইখানার দিকে। আমি আগুনের সামনে আমার টুলে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বোনের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, জো গিয়ে পাবে না লোকটাকে।

একটু পরেই ফিরে এলো জো। যা ভেবেছিলাম তা-ই।

আমরা বেরিয়ে আসার পরপরই চলে গেছে লোকটা। জো সরাই-ওয়ালাকে বলে এসেছে আবার যদি কখনো লোকটা আসে যেন খবর দেয় আমাদের বাড়িতে।

নোট দুটো আমার বোন নিয়ে রেখে দিলো পার্লারে একটা সাজিয়ে রাখা টিপটের নিচে। লোকটাকে যদি কখনো পাওয়া যায় ফেরত দেবে তাকে।

সেই রাতে আবার আমি স্বপ্নে দেখলাম জলাভূমিতে দেখা আমার কয়েদীকে।

## সাত

প্রথমবার ঘুরে আসার ছ'দিন পর আবার আমি গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে। দুরু দুরু বুকে ফটকের ঘণ্টা বাজালাম। এস্টেলা এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। ফটক খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো সে। তারপর আগেরদিন যে পথে নিয়ে গিয়েছিলো সেই একই পথে নিয়ে চললো। সেই একই দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলো, আমাকে ঢুকতে দিলো। দরজার পাশেই রাখা ছিলো মোমবাতি। সেটা তুলে নিয়ে অন্ধকার অলিপথ ধরে এগিয়ে চললো এস্টেলা। আমি চললাম পেছন পেছন। আজ ও বাড়ির অন্য এক অংশের

দিকে নিয়ে চলেছে আমাকে।

দীর্ঘ অলিপথ পেরিয়ে এক তলারই একটা ঘরে নিয়ে গেল আমাকে ও। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, ঘরটায় দিনের আলো আছে। পর্দাগুলো সরানো। জানালাও দু'একটা খোলা। এ ঘরেরও দেয়ালে একটা বিরাট ঘড়ি। বন্ধ হয়ে আছে। মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরেরটার মতো এটাও বন্ধ হয়েছে ন'টা বাজতে বিশ মিনিটের সময়। ঘরে কয়েকজন অতিথি—তিন-জন মহিলা, একজন পুরুষ গল্প করছে। এস্টেলা যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। আমাকে একটা জানালা দেখিয়ে বললো:

'ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। সময় হলে তোমাকে ডাকা হবে।'

অকস্মাৎ অজানা দেশে এসে পড়ার মতো বিমূঢ় ভঙ্গিতে কিছু-ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম এস্টেলার দেখানো জানালাটার কাছে। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে ঘরের সবগুলো মানুষ তাকিয়ে আছে আমার দিকে; আর কল্পনা করছে কী চায় এ ছোকরা!

আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চুপ ক'রে গিয়েছিলো সবক'জন। একটু পরেই আবার নিজেদের ভেতর আলাপ শুরু করলো তারা। এস্টেলার গলাও শুনতে পেলাম। আমাকে যে তারা দেখেছে, বা আমি যে ঘরে আছি তা যেন জানেই না কেউ।

কতক্ষণ কাটলো এভাবে বলতে পারবো না। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো একটা ঘণ্টার শব্দ। অলিপথের ওপ্রান্ত থেকে কেউ একজন চিৎকার ক'রে কিছু বললো। অতিথিরা চুপ ক'রে গেল অমনি। এস্টেলা এগিয়ে এলো আমার দিকে।

'এই ছেলে, চলো।' বললো সে।

অতিথিরা সবাই আমার দিকে তাকালো। এস্টেলার পেছন পেছন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, শুনলাম তাদের একজন বলছে :

'দিবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছি, এরপর কী ঘটবে।'

'কে ভাবতে পেরেছিলো এমন হবে।' জবাব দিলো আরেক জন।

মোমবাতি হাতে অন্ধকার অলিপথ ধরে আমাকে নিয়ে চললো এস্টেলা। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ থেমে পড়লো ও। ঘুরে তাকালো আমার দিকে। চোখে ফুটে উঠেছে সেদিনের সেই বিদ্রূপ-মাখা চাউনি। আমার মুখের খুব কাছে ও মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো :

'কেমন ?'

কী বলছে ও, কী জানতে চাইছে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। হতভম্বের মতো পাল্টা প্রশ্ন করলাম :

'কী কেমন, মিস ?' ওর গায়ের ওপর পড়তে পড়তে কোনো-মতে সামলে নিলাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও, বলাবাহুল্য আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

'আমি সুন্দর ?' কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করলো ও।

'হ্যাঁ, আমার তা-ই মনে হয়।'

'আমি নিষ্ঠুর, অপমান করি ?'

'গত দিনের মতো অতটা নও আজ।'

'অতটা নই ?'

'না।'

আমার জবাব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠলো যেন ও। ঠাস ক'রে একটা চড় লাগিয়ে দিলো আমার গালে।

'এবার?' বললো সে। 'এবার কেমন মনে হচ্ছে আমাকে?'

'বলবো না।'

'কেন? ওপরে গিয়ে নালিশ করবে তাই?'

'না।'

'সেদিনের মতো কাঁদো না একটু আজও!'

'না, তোমার জন্যে কোনোদিনই আর আমি কাঁদবো না,' মুখে বললাম বটে, কিন্তু কথাটা মোটেও সত্যি নয়। যখন বলছি তখনই আমি ওর জন্যে কাঁদছি মনে মনে এবং বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে আরো অনেক অনেকদিন কাঁদবো। যতই দুর্ব্যবহার করুক ওর জন্যে বিন্দুমাত্র ঘৃণার সঞ্চার হচ্ছে না আমার মনে।

চলতে শুরু করলাম আমরা। অলিপথ ঘেঁষে সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছি, এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো, নেমে আসছেন তিনি। থেমে ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে ভদ্রলোক।

'এ কে?'

'এক ছোকরা,' বললো এস্টেলা।

দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের। গায়ের রঙ তামাটের ধার ঘেঁষে। মাথার সামনের দিকে অসময়েই টাক পড়েছে। তাঁর বিশাল থাবা দিয়ে আমার থুতনী ধরে মুখটা উঁচু করলেন তিনি। মোমবাতির আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমিও কোনো কারণ ছাড়াই পূর্ণ চোখে দেখলাম তাঁকে।

'আশপাশেই থাকিস, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'জি, স্যার।'

'কী চাস এখানে?'

'মিস হ্যাভিশ্যাম আসতে বলেছেন,' আমি বললাম।

'ভালো কথা! কিন্তু সাবধান, বেয়াদবী করবি না একদম! তোর মতো ছেলে ছোকরা অনেক দেখেছি। সব ধাড়ি বদ একেকটা। যা বললাম মনে রাখিস!'

তীব্র এক ভ্রূকুটি হেনে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নেমে গেলেন তিনি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। এস্টেলা উঠতে শুরু করলো আবার। পেছন পেছন আমিও। এখন আর এস্টেলার কথা ভাবছি না আমি, ভাবছি দশাসই লোকটার কথা, তাঁর রূঢ় আচরণের কথা।

বেশিক্ষণ অবশ্য ভাবার সময় পেলাম না। পৌঁছে গেছি মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে। আগের দিন যে পোশাকে যেভাবে দেখেছিলাম আজও সেই পোশাকে সেভাবে বসে আছেন তিনি। ঘরের সব জিনিসপত্রও হুবহু একভাবে রয়েছে।

এস্টেলা আমাকে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল। সাজ-টেবিলের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছেন মিস হ্যাভিশ্যাম। যতক্ষণ না তিনি আমার দিকে চোখ ফেরালেন ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

'তাহলে!' নিরুত্তাপ নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'দিন ক'টা চলে গেল?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। আজ—'

'হয়েছে, হয়েছে!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'শুনতে চাই না। খেলার জন্যে তৈরি তুমি?'

একটু ইতস্তত ক'রে আমি জবাব দিলাম, 'না, ম্যা'ম।'

'বেশ, খেলতে যখন ইচ্ছে করছে না, কাজ করবে?'

'করবো, ম্যা'ম।'

'তাহলে যাও, ওপাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো আমি যতক্ষণ না আসি।'

পাশের ঘরে চলে গেলাম আমি। এ ঘরটাও অন্ধকার। জানালার পর্দাগুলো সব টানা, যাতে দিনের আলো ঢুকতে না পারে। ছোট ছোট কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। তাদের ম্লান আলো লড়াই ক'রে কোনোমতে টিকে আছে অন্ধকারের সাথে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘরের সব কিছু ভীষণ পুরনো, সব কিছুর ওপর জমে আছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। কোনায় কোনায় মাকড়সার জাল। অনেকদিন ধরে জমেছে। টেবিল চেয়ারগুলো দেখে মনে হলো নড়বড়ে সব, একটু ঠেলা দিলেই আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। লম্বা একটা টেবিল ঘরের মাঝখানে। পুরনো একটা টেবিলক্লথ পাতা তার ওপর। টেবিলটার চারপাশ ঘিরে সার দিয়ে চেয়ার সাজানো। আমার মনে হলো একটু পরেই একদল অতিথি এসে বসবে চেয়ারগুলোয়, খাওয়া দাওয়া করবে।

কৌতূহলী, একটু বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছি এসব, এই সময় মিস হ্যাভিশ্যাম এলেন। তাঁর এক হাতে লাঠি। লাঠিতে ভর দিয়ে অন্য হাতটা রাখলেন আমার কাঁধে।

'ওখানে,' লাঠি দিয়ে লম্বা টেবিলটা ইশারা ক'রে বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'মরার পর আমার লাশ ওখানে শুইয়ে রাখা হবে। সবাই আসবে, এসে আমাকে দেখবে ওখানে।'

এমন ভয় ধরানো ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন ভদ্রমহিলা, আমি

গাউরে উঠলাম।

'ওটা কী?' লাঠি উঁচিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'ঐ যে মাকড়সার জালে মোড়া ঐ জিনিসটা?'

'জানি না, ম্যা'ম।'

'বড় একটা কেক। বিয়ের কেক। আমার বিয়ের!'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি। তারপর ভর দিলেন আমার কাঁধে।

'এসো, এসো। আমাকে একটু হাঁটতে সাহায্য করো,' বললেন তিনি।

বুঝতে পারলাম কী কাজ আমাকে করতে হবে। হাঁটতে শুরু করলাম আমি। আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। ঘরের ভেতর ঘুরতে লাগলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে বক বক ক'রে চললেন তিনি।

শারীরিক ভাবে খুব একটা শক্ত নন মিস হ্যাভিশ্যাম। একটু-খানি হেঁটেই হাঁপাতে লাগলেন।

'আস্তে! আরেকটু আস্তে হাঁটো!' বললেন তিনি।

আমি কমিয়ে দিলাম হাঁটার গতি। কিন্তু মিস হ্যাভিশ্যাম কমালেন না। আমাকে আস্তে হাঁটতে বললেও নিজে আগের গতিতেই হেঁটে চললেন। মুখও চলতে লাগলো সেই সাথে। একটু পরে আবার বললেন:

'এস্টেলাকে ডাকো!'

আমার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আমি দরজা পেরিয়ে অলিপথে গিয়ে আগের দিনের মতো চিৎকার

ক'রে ডাকলাম এস্টেলার নাম ধরে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। অবশেষে দূরে অলিপথের শেষ মাথায় দেখতে পেলাম ওর মোমের আলো। এগিয়ে আসছে এদিকে। ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম আমি। মিস হ্যাভিশ্যামের কাছে যেতেই উনি আবার লাঠি ছেড়ে ভর দিলেন আমার কাঁধে। আবার হাঁটতে লাগলাম আমরা।

এস্টেলা ঢুকলো। একা নয়। নিচের সেই তিন মহিলা আর এক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এস্টেলা একা এলে আমি বিব্রত বা সংকুচিত বোধ করতাম সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন স্রেফ কী করবো ভেবে পেলাম না। নম্রভাবে দাঁড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ভদ্রতা হতো। কিন্তু মিস হ্যাভিশ্যাম থামতে দিলেন না, কাঁধে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হাঁটিয়েই চললেন আমাকে।

'মিস হ্যাভিশ্যাম, কী ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে!' তোষামুদে স্বরে বললেন এক মহিলা।

'মোটেই না, সারাহ পকেট,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'আমার চামড়া হলুদ হয়ে গেছে, শরীর হাড্ডিসার।'

সারাহ পকেটের এই হেনস্থায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আরেক মহিলার। 'বেচারি!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'তোমার খবর কী, ক্যামিলা?' সেই মহিলাকেই জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'ধন্যবাদ, মিস হ্যাভিশ্যাম,' জবাব দিলেন ক্যামিলা, 'ভালো—এই আমাদের খবর যতটা ভালো হতে পারে ততটা আর কি।'

'কেন, একথা বলছো কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'না, তেমন কিছু না,' বললেন ক্যামিলা। 'আমি সবার সামনে

মনের কথা প্রকাশ ক'রে অভ্যস্ত নই।···তবু বলছি তোমার কথা ভেবে ভেবে রাতগুলো আমার—'

'আমার কথা ভাবতে কে বলেছে তোমাকে?' রুক্ষ কণ্ঠে বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'তোমার পক্ষে বলা যত সহজ আমার পক্ষে করা যদি তত সহজ হতো!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্যামিলা। 'রেমণ্ড জানে রাতগুলো আমার কেমন কাটে। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে—' চোখের কোণ চিক চিক ক'রে উঠলো ক্যামিলার।

রেমণ্ড যে উপস্থিত পুরুষটির নাম বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার। তিনি এগিয়ে এসে ধরলেন ক্যামিলার কাঁধ। বললেন :

'ক্যামিলা, লক্ষ্মী, কাঁদে না, কে না জানে পরিবারের সবার জন্যে তোমার দরদ কতটা।'

'জানি না,' তৃতীয় মহিলা কথা বললেন এই প্রথম, 'শুধু ভেবে কতখানি কর্তব্য করা হয়।'

'ঠিক বলেছো, জজিয়ানা,' বললেন সারাহ পকেট।

'ভাবা তো খুবই সহজ,' বললেন জজিয়ানা। 'কিন্তু কিছু করা? খুবই কঠিন।'

'জানি,' ফুঁপিয়ে উঠে বললেন ক্যামিলা, 'জানি ভাবা সহজ। এ-ও জানি এই সহজ কাজটাই সবাই করে না, করতে পারে না।'

মিস হ্যাভিশ্যাম আর আমি এখনও একবারের জন্যেও থামিনি। এই সময় ক্যামিলা বললেন :

'ম্যাথুর কথাই ধরো, ও কখনো আসে মিস হ্যাভিশ্যামকে দেখতে? আসে তো না-ই ভাবেও না ওঁর কথা।'

ম্যাথ্যু নামটা কানে যাওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে পড়লেন মিস হ্যাভিশ্যাম। ক্যামিলার দিকে তাকিয়ে বললেন :

'ম্যাথ্যু আসবে আমার শেষ দেখতে। যেদিন ঐ টেবিলের ওপর শোয়ানো হবে আমাকে। এটা হবে ওর জায়গা,' টেবিলের এক প্রান্তে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তিনি, 'আমার মাথার কাছে। আর তোমার হবে এখানে। তোমার স্বামীর এখানে। সারাহ পকেটের ওখানে! আর জজিয়ানার এই জায়গায়। এবার তোমরা যাও দয়া ক'রে।' প্রতিটা নাম উচ্চারণের সময় তিনি লাঠি দিয়ে টেবিলের একেকটা জায়গায় আঘাত করলেন। অবশেষে তাকালেন আমার দিকে। 'চলো, চলো, হাঁটো আমার সাথে।'

আমি হাঁটতে শুরু করলাম আবার। এস্টেলা চায় অতিথিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমরা হাঁটতেই লাগলাম। হাঁটতেই লাগলাম। আস্তে আস্তে কমে আসছে মিস হ্যাভিশ্যামের গতি। অবশেষে থামলেন তিনি। বিড়বিড় ক'রে বললেন :

'আজ আমার জন্মদিন, পিপ।'

শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে আমি মুখ খুলতে যাচ্ছি, এই সময় তিনি লাঠি উঁচু ক'রে আবার বললেন :

'কিন্তু সেজন্যে মানুষের শুভেচ্ছার, জ্বালা সইতে হয় না আমাকে। একটু আগে যারা এসেছিলো তারা বা অন্য কেউই এনিয়ে কিছু বলে না। এদিন ওরা আসে, কিন্তু কেউ দিনটার কথা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না।'

বলাবাহুল্য আমি মুখে চলে আসা শুভেচ্ছা বাক্যটা আবার মনের ভেতর পাঠিয়ে দিলাম।

এস্টেলা ফিরে এলো এই সময়। মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন :

'যথেষ্ট হাঁটা হয়েছে, এবার তোমরা দু'জন তাস খেল, আমি দেখি। এখনো শুরু করোনি কেন?'

মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে ফিরে এলাম আমরা। সাজ-টেবিলের সামনের আসনটায় বসলেন তিনি যথারীতি। আমি আর এস্টেলা খেলতে শুরু করলাম। আজও আমি হারলাম। পুরোটা সময় মিস হ্যাভিশ্যাম তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। মাঝে মাঝে এমন দু'একটা ছোটখাটো কাজ করলেন যা দেখে আমার মনে হলো এস্টেলার সৌন্দর্য আর সৌভাগ্য আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

এস্টেলা খেলার সময়ও চরম অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার করলো আমার সাথে। এমন কি একটা কথা পর্যন্ত বললো না। পর পর ছয় দান খেলার পর আগের দিনের মতোই আমাকে বলে দেয়া হলো পরবর্তী কোন দিন আসতে হবে। তারপর এস্টেলা আলো হাতে আমাকে নিয়ে গেল নিচে উঠানে। আগের দিনের মতোই আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতর থেকে খানিকটা খাবার এনে রাখলো মাটিতে। খাওয়ার পর আজও আমাকে কিছু সময় ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াতে দেয়া হলো উঠানে, বাগানে।

উঠানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার মনে হলো, বাড়িটা নিশ্চয়ই এখন ফাঁকা, অতিথিরা চলে গেছে। সত্যিই চলে গেছে কিনা দেখার জন্যে নিচতলার একটা জানালা খোলা দেখে সেখান দিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। এবং অবাক হয়ে দেখলাম, একই জানালা দিয়ে ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একজন—ফ্যাকাসে চেহারার এক ছেলে। বয়েসে আমার চেয়ে বড়ই হবে, তবে খুব বেশি বড় না। আমার সঙ্গে

চোখাচোখি হতেই জানালা থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একটু পরেই দেখলাম বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

'এই ছোঁড়া!' সে বললো, 'কে ঢুকতে দিয়েছে রে তোকে?'

'মিস এস্টেলা,' আমি বললাম।

'ভালো কথা। কিন্তু এখানে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতে বলেছে কে?'

'মিস এস্টেলা।'

'আয় মারামারি করি,' বললো সে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এমন একটা প্রস্তাব ক'রে বসবে ছেলেটা কল্পনাও করিনি। এদিকে ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ঠাট্টা করছে না, সত্যি সত্যিই মারামারি করতে চাইছে সে। অগত্যা আমিও তৈরি হলাম লড়ার জন্যে।

'এক মিনিট দাঁড়া,' ছেলেটা বললো হঠাৎ, 'তোর দিক থেকে মারামারি করার একটা কারণ থাকতে হবে তো?' বলে ও সাঁ ক'রে হাত চালিয়ে আমার চুল টেনে দিলো ভয়ানক জোরে। তারপর গরুর মতো মাথা নিচু ক'রে ছুটে এসে ঢুঁ দিলো আমার পেটে। ব্যথায় কাৎরে উঠতে গিয়েও কোনোমতে সামলে নিলাম আমি।

'এবার তো পেয়েছিস কারণ,' বললো সে। 'কিন্তু এখানে না। ঐ যে ওখানে গিয়ে আমরা লড়বো, চল।'

ওর পেছন পেছন এগিয়ে গেলাম বাগানের এক প্রান্তে।

'আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে।' বলে সে কাপড় খুলতে লাগলো —একে একে কোট, ওয়েস্টকোট, এমনকি জামাও খুলে ফেললো সে। আমি ভয়ে ভয়ে দেখছি। আমার চেয়ে লম্বা ছেলেটা, স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালো। পিটিয়ে আমাকে তক্তাই বানিয়ে দেয় কিনা!

ও তৈরি হয়ে আমাকে বললো, 'কী, তুই জামা কাপড় খুলবি না ?'

'না,' আমি বললাম।

'তাহলে আয়।'

ছেলেটার মুখ থেকে কথাটা পড়তে না পড়তেই আমি লাফ দিলাম। এবং গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ঘুসি মারলাম ওর মুখে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। একটা রক্তাক্ত নাক আর ব্যথায় কুঁচকানো মুখ নিয়ে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার সে ছুটে এলো। এবারও আমি আঘাত করলাম প্রথম। এবং আমার জীবনের আশ্চর্যতম ঘটনা দেখলাম, ছেলেটা আবার পড়ে গেছে এবং উঠতে পারছে না। এবার ওর একটা চোখে কালশিরে পড়েছে।

এত সহজে ওকে ধরাশায়ী করতে পারবো আমি কল্পনাও করিনি। তাই দাঁড়িয়ে রইলাম প্রস্তুত হয়ে। কিন্তু ছেলেটা উঠলো না। ব্যথার জায়গাগুলোয় হাত বুলাতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে গেল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো :

'জিতেছো তুমি।'

সত্যি কথা বলতে কি ওর অবস্থা দেখে মায়াই হলো আমার। বললাম :

'তোমাকে সাহায্য করবো কোনো রকম ? ধরে ওঠাবো ?'

'না, ধন্যবাদ,' জবাব দিলো ও।

'তাহলে আসি,' আমি বললাম।

'এসো।'

উঠানে ফিরে দেখলাম এস্টেলা অপেক্ষা করছে চাবি হাতে। এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম বা কেন ওকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি এ সম্পর্কে একটা প্রশ্নও সে করলো না। লক্ষ্য করলাম, ওর মুখটায় অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতা। যেন কিছু একটা উৎফুল্ল ক'রে তুলেছে ওকে। এমনটা এর আগে কখনো দেখিনি ওর চেহারায়। ফটকের দিকে না গিয়ে ও বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো আবার। ইশারায় ডাকলো আমাকে। আমি এগিয়ে গেলাম।

'ইচ্ছে হলে আমাকে চুমু খেতে পারো,' মৃদুস্বরে বললো এস্টেলা। একটা গাল এগিয়ে দিলো আমার দিকে। আমি ভয়ে ভয়ে ঠোঁট ছোঁয়ালাম গালটায়। আমার ধারণা হলো ওর এই বদান্যতা মনিব যেমন চাকরের সাথে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত বদান্যতা দেখায় তেমন কিছু।

## আট

পরের কয়েকটা দিন বেশ উদ্বেগের ভেতর কাটলো আমার ফ্যাকাসে ছেলেটার কথা ভেবে। মনে হলো মারামারিটা না করলেই হতো। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি ততই ধারণা হচ্ছে ঐ ঘটনার জন্যে

কিছু না কিছু শাস্তি পেতে হবে আমাকে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ছেলেটার রক্ত আমার হাতে লেগে আছে। এবং সেজন্যে আইন তার নির্ধারিত পথেই প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর। ভয়ে কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারলাম না। মনে হলো বেরুলেই পুলিশ ধরবে আমাকে।

যাহোক অবশেষে মিস হ্যাভিশ্যামের ওখানে যাওয়ার দিন এলো আবার। দুরু দুরু বুকে হাজির হলাম বাড়িটার কাছে। ফটকের সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত সাহস ক'রে ঘণ্টা বাজালাম। যথারীতি এস্টেলা এসে দরজা খুলে দিলো। অস্বাভাবিক কিছু দেখলাম না ওর চেহারায়। ফটক পেরিয়েই উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম যেখানে আমরা লড়াই করেছিলাম সে জায়গার দিকে। ওখানেও সব স্বাভাবিক। উঠানের চারদিকে চোখ বুলালাম। ফ্যাকাসে চেহারার ছেলেটা নেই কোথাও। আস্তে আস্তে স্বস্তি ফিরে এলো আমার মনে। এস্টেলার পেছন পেছন বাড়ির ভেতর ঢুকলাম।

মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরের বাইরে দরজার পাশে দেখলাম একটা চাকা লাগানো চেয়ার রাখা। বুঝতে পারলাম, ঘরের ভেতর আমার কাঁধ ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তখন মিস হ্যাভিশ্যামকে ঐ চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে বেড়াতে হবে। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো একটু পরেই। বেশ কিছুক্ষণ আমাকে ধরে ধরে হাঁটলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বসে পড়লেন চাকা লাগানো চেয়ারটায়। আমাকে নির্দেশ দিলেন ঠেলতে। কোন কোন দিকে যেতে হবে লাঠি উঁচিয়ে দেখিয়ে বা মুখে বলে দিতে লাগলেন। আজও বেশ কয়েক দান তাস খেললাম আমি আর

এস্টেলা। ফলাফল আগের মতোই। আমি হারলাম সব ক'বার। এস্টেলার আচরণও প্রায় আগেরমতোই। অতটা রূঢ় নয় যদিও তবে অবজ্ঞার ভাবটা পুরোপুরিই আছে। খেলা শেষে আজও আমাকে পরবর্তী কোনদিন আসতে হবে জানিয়ে বিদায় দিলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। যথারীতি নিচে নেমে আমাকে খাবার দিলো এস্টেলা। খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ একা একা হেঁটে বেড়ানোর সুযোগ দিলো। তারপর চাবি হাতে এসে বের ক'রে দিলো ফটকের বাইরে।

এইভাবে চলতে লাগলো মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে যাওয়া আসা। আস্তে আস্তে আমি সহজ হয়ে উঠছি। কিছুদিন যেতে না যেতেই মিস হ্যাভিশ্যামের প্রতি আমার ভয়টা একেবারে দূর হয়ে গেল। উনি আরো বেশি হাঁটতে লাগলেন। আমার সাথে, আরো বেশি কথা বলতে লাগলেন। কথায় কথায় জেনে নিলেন আমার এবং আমার বাড়ির সব খোঁজ খবর। লেখাপড়া কদ্দূর করেছি বা করার ইচ্ছা আছে, বড় হয়ে কী হওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তাঁকে জানিয়েছি, সম্ভবত আমার ভগ্নিপতি জো-র কামারশালায় শিক্ষানবিশ হতে হবে আমাকে; জো-র তেমনই ইচ্ছা, আমারও অনিচ্ছা নেই। লেখাপড়া সম্পর্কে বলেছি, আমার খুবই ইচ্ছা শেখার যদিও এখন পর্যন্ত খুব বেশি শিখতে পারিনি।

আশা করেছিলাম এর পর উনি আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু উনি কিছুই করেননি। টাকা পয়সা দূরে থাক কিছুই দেননি আমাকে। একমাত্র দুপুরের খাওয়া ছাড়া আর কিছুই দেননি।

এস্টেলা সব সময় আমাদের আশেপাশে থাকে। সব দিন ও-ই আমাকে ফটক খুলে বাড়িতে ঢোকায় আবার যাওয়ার সময় বাইরে

বের ক'রে ফটক বন্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু সেই একদিনের পর আর কখনো চুমু খাওয়ার কথা বলেনি আমাকে। এখন ও আগের মতো অবজ্ঞা বা ঘৃণা আমাকে করে না তবে উষ্ণ আচরণও করে না। সব সময় কেমন একটা শীতল ভাব ওর ভেতর।

এদিকে বাড়িতে আমার বোন আর বিরক্তিকর মিস্টার প্যুমব্‌ল-চুক মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে কী দেবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনায় অস্থির। সপ্তাহে একাধিক দিন তাঁরা রান্নাঘরে বসেন। সাধারণ কিছু কথাবার্তার পরই তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠি আমি, তারপর মিস হ্যাভিশ্যাম এবং তারপর উনি আমাকে কী দেবেন তাই। প্রতিদিনই তাঁদের সিদ্ধান্ত হয় এরকম, ভদ্রমহিলা মোটা অঙ্কের টাকা অথবা ভূসম্পত্তি দেবেন এবং আমাকে গড়ে তুলবেন ভদ্রলোক হিশেবে। আর যা-ই হোক জো-র মতো অপদার্থের খপ্পরে পড়ে কামার হতে হবে না আমাকে।

ওঁদের এই সব আলাপে জো কখনো যোগ দেয় না। মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে ভদ্রলোক ক'রে গড়ে তুলবেন, বা আমাকে কামার হতে হবে না এসব প্রসঙ্গগুলো যখন আলোচিত হয় তখন ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ও সর্বান্তঃকরণে চায় আমি ওর সহকারী হবো। মিসেস জো এবং মিস্টার প্যুমব্‌লচুকের আলোচনা যখন শেষ হয়ে যায় তখন ও মৃদু স্বরে বলে কথাটা। অমনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে আমার বোন।

'আমাকে জ্বালিয়ে মারলে সারা জীবন,' চিৎকার করে সে, 'তাতে মনের সাধ মেটেনি, এবার ছেলেটাকে ধ্বংস করতে চাও!' এর পরই তার যত রাগ গিয়ে পড়ে আমার ওপর। মাথায়, পিঠে বা গালে চাঁটি মেরে খেঁকিয়ে ওঠে, 'এখানে বসে আছিস কেন, হত-

ভাগ্য ? যথেষ্ট জ্বালিয়েছিস সারা দিন, যা শুতে যা।'

আমি চুল্লীর কোণ থেকে উঠে আস্তে আস্তে চলে যাই আমার ঘরে।

এই ভাবে অনেক অনেক দিন কেটে গেল, এবং মনে হলো হয়-তো আরো অনেক দিন কেটে যাবে। এই সময় একদিন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন মিস হ্যাভিশ্যাম। আমার কাঁধে ভর দিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন :

'তুমি বড় হয়ে যাচ্ছো, পিপ।'

আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোন অপরাধ ক'রে ফেলেছি ; নইলে হঠাৎ একথা কেন বলছেন ? কিন্তু এদিন আর কিছু বললেন না তিনি।

পরে যেদিন গেলাম ওবাড়িতে আমাদের নিয়মিত হাঁটাহাঁটির পর মিস হ্যাভিশ্যামকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম তাঁর সাজ-টেবি-লের সামনে। অস্থিরভাবে হাত নেড়ে আমাকে দাঁড়াতে বললেন তিনি। তারপর :

'তোমার সেই কামারের নামটা বলো তো আরেকবার।'

'জো গারগেরি, ম্যা'ম।'

'শিগগিরই ও তোমার মালিক হবে, তাই না ? তুমি কাজ শিখবে ওর কাছে ?'

'জি, মিস হ্যাভিশ্যাম।'

'তাহলে আর দেরি না ক'রে এখনই তোমার লেগে যাওয়া উচিত। আমি যদি ডাকি এখানে আসবে তোমার গারগেরি ?'

'আসতে পারলে ও সম্মানিত বোধ করবে, ম্যা'ম।'

'তাহলে আসতে বোলো।'

'যে কোনো সময়, মিস হ্যাভিশ্যাম ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সময় সম্পর্কে তো কিছু জানি না আমি। শিগগিরই একদিন আসতে বোলো ওকে। তুমি সাথে ক'রে নিয়ে এসো। আমি চাই ঠিকমতো, আইনসম্মত ভাবে তুমি ওর শিক্ষানবিশ হও। কাগজপত্র সব তৈরি ক'রে আনতে বোলো। আমার সামনে সই করবে।'

সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে যখন খবরটা দিলাম আমার বোনের তর্জন গর্জন অন্য যেকোনো দিনের তুলনায় মুষলধারে বর্ষিত হতে লাগলো। মিস হ্যাভিশ্যাম এমন কিছু প্রস্তাব ক'রে বসবেন তা তার কল্পনারও বাইরে ছিলো। কোথায় আশা করেছিলো আমি পাবো টাকা নয়তো জমি সেখানে পেতে চলেছি জো-র কাছে শিক্ষানবিশাই তবে একটু অন্যভাবে, আইনসঙ্গতভাবে চুক্তি ক'রে। যেটা, আমার ধারণা, আরো খারাপ আমার বোনের দৃষ্টিতে। চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে এক মহা হুলস্থূল জুড়ে দিলো সে। তারপর হঠাৎ জো-র দিকে একটা মোমবাতি ছুঁড়ে মেরে ভেঙে পড়লো অদম্য কান্নায়।

দু'দিন পর জো ওর সেরা পোশাকগুলো পরলো আমার সাথে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে। আমার বোন বললো সে-ও যাবে। তবে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে নয়। আঙ্কল পুমব্‌লচুকের বাসায় অপেক্ষা করবে আমরা না ফেরা পর্যন্ত। কামারশালা বন্ধ থাকবে সারাদিন।

তৈরি হয়ে আমরা তিনজন রওনা হলাম শহরের দিকে। ওখানে পৌঁছে জো আর আমি সোজা চলে গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে, মিসেস জো গেল মিস্টার পুমব্‌লচুকের বাসায়।

যথারীতি ফটক খুলে দিলো এস্টেলা। জো ওকে দেখে কাচু-

মাচু ভঙ্গিতে হ্যাট খুলে হাতে নিলো। এস্টেলা বললো মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে যেতে হবে আমাদের। আমি হাত ধরে নিয়ে চললাম জো-কে। এস্টেলা আর সবদিনের মতো আলো হাতে চললো আগে আগে।

মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে পৌঁছে দেখলাম সাজ-টেবিলের সামনে বসে আছেন তিনি। আমাদের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকালেন।

'আচ্ছা!' জো-র দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তুমিই তাহলে ছেলেটার বোনের স্বামী?'

প্রশ্নটা শুনে জো-র চেহারা যা হলো সে দেখার মতো। এমনিতেই মুখচোরা প্রকৃতির মানুষ সে। তার ওপর এমন এক ভদ্রমহিলার উপস্থিতি। ও একেবারে জড়সড় হয়ে গেছে ধরাপড়া পাখির মতো।

'তুমি এই ছেলের বোনের স্বামী?' আবার প্রশ্নটা করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

জো জবাব দিলো, তবে সরাসরি মিস হ্যাভিশ্যামকে নয়। আমার সঙ্গে আলাপ করছে এমন ভঙ্গিতে ও বললো:

'তুমি তো জানো, পিপ, তোমার বোনকে আমি বিয়ে করেছি। তার আগে—তার আগে আমি তো একাই ছিলাম।'

'বেশ,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'তুমি ছেলেটাকে মানুষ করেছো তোমার ব্যবসায় লাগাবে বলে, তাই তো, মিস্টার গারগেরি?'

'তুমি জানো, পিপ,' জবাব দিলো জো, 'তুমি আর আমি সব সময় বন্ধু থেকেছি। তুমি সব সময়ই আমার কাজে সাহায্য করতে চেয়েছো, কখনো কখনো করেছোও। কিন্তু, পিপ, এখন যদি তোমার মনে হয় তুমি কামার হবে না, বলো, দেখি তোমার জন্যে অন্য কী

করতে পারি আমি।'

'ও কখনো বলেছে ও কামার হতে চায় না?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'তুমি তো ভালো করেই জানো, পিপ, সবসময় চেয়েছো, বড় হয়ে আমার পেশাকেই তোমার পেশা হিশেবে নেবে।'

'চুক্তিপত্রটা তৈরি ক'রে এনেছো?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'পিপ,' বললো জো, 'তুমি তো দেখেছো, আসার আগে কাগজগুলো আমি হ্যাটের ভেতর ভরেছি। তার মানে, তুমি জানো আমি ওগুলো এনেছি সঙ্গে ক'রে।'

বলে ও কাগজগুলো হ্যাটের ভেতর থেকে বের করে দিলো—না, মিস হ্যাভিশ্যামের কাছে নয়, আমার কাছে। জো-র এই জড়সড়, হাস্যকর আচরণে সত্যি কথা বলতে কি লজ্জাই লাগছে আমার। আরো লজ্জা লাগছে এস্টেলা উপস্থিত রয়েছে বলে। দাঁড়িয়ে আছে মিস হ্যাভিশ্যামের চেয়ারের পেছনে। জো কাগজগুলো আমার হাতে দিতেই ওর চোখ দুটো নেচে উঠলো কৌতুকের হাসিতে। আমি কাগজগুলো মিস হ্যাভিশ্যামের হাতে দিলাম।

'তুমি কাজ শেখানোর বিনিময়ে কোনোরকম পারিশ্রমিক আশা করছো না ছেলেটার কাছ থেকে?' কাগজগুলোয় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

জো চুপ ক'রে আছে। দেখতে পাচ্ছি এস্টেলার চোখের হাসি মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। জো-কে নিয়ে এতদিন আমার যত গর্ব ছিলো সব চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

'জো!' আমি বললাম, 'জবাব দিচ্ছো না কেন? তুমি নিজে

কথা—'

'পিপ,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো জো, 'তুমি জানো, আমাদের সম্পর্ক লেনদেনের নয়। তোমাকে কাজ শেখানোর বিনিময়ে আমি যে টাকা চাই না তা-ও তুমি জানো। তাহলে প্রশ্নটার জবাব দাঁড়াচ্ছে "না"। এটাই আমাকে বলতে বলছো?'

মিস হ্যাভিশ্যাম তাকালেন ওর দিকে। তাঁর চাউনি দেখে বুঝলাম জো-কে তিনি চিনতে পেরেছেন। টেবিলের ওপর থেকে ছোট একটা থলে তুলে নিলেন তিনি।

'আমার এখানে কাজের বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক পাওনা হয়েছে পিপের,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'এই নাও। এই থলেতে পঁচিশটা গিনি আছে। পিপ, তোমার মনিবকে দাও থলেটা।'

এবারও জো মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে সরাসরি কথা বললো না। যা বলার আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই বললো।

'তুমি খুবই সদয়, দয়ালু, পিপ,' বললো সে। 'আমরা গরিব, টাকাটা খুবই কাজে লাগবে আমাদের। কিন্তু এটাকা আমি চাইনি, সত্যিই চাইনি।'

জো-র পক্ষেই কেবল এমন কথা বলা সম্ভব। সত্যিই ও চায়নি টাকাটা।

'বিদায়, পিপ!' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'এস্টেলা, ওদের বাইরে দিয়ে এসো।'

'আমি আর আসবো, মিস হ্যাভিশ্যাম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। গারগেরি এখন তোমার মনিব। গারগেরি, একটা কথা!'

আমি আর জো রওনা হয়েছিলাম দরজার দিকে। থেমে দাঁড়ালাম আবার।

'পিপ যতদিন এখানে এসেছে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকেছে,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'টাকাটা তার পুরস্কার। তোমাকে দেয়ার কারণ, তুমি ওকে কাজ শেখাবে। পিপের কাছে যা শুনেছি তাতে তোমাকে সৎলোক বলেই মনে হয়েছে, মিস্টার গারগেরি। সুতরাং পিপের কাছ থেকে আর কিছু চাইবে না তুমি এটাই আমি আশা করবো।'

জো যে কীভাবে ঘর থেকে বেরোলো তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে নিচে নামার বদলে ও ওপরে উঠতে শুরু করলো। আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম ওকে। নিচে নেমে যখন অন্ধকার অলিপথ পেরোচ্ছি তখন শুনলাম ও বিড় বিড় করছে: 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠান পেরিয়ে যখন ফটকের বাইরে এলাম আবার ও বললো:

'পিপ, সত্যিই আশ্চর্য—ভীষণ আশ্চর্য এ ঘটনা!'

মিস্টার পুমব্‌লচুকের বাসায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আমার বোন ছুটে এলো দাঁত বের করা হাসি মুখে নিয়ে।

'কত দিলো? কত?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'যদি বলি দশ পাউণ্ড কেমন লাগবে তোমাদের?' রহস্যময় স্বরে প্রশ্ন করলো জো।

'আঁ—মোটামুটি,' বললো মিসেস জো। 'খুব বেশি না, তবে কমও না।'

'তাহলে বলি, দশ পাউণ্ডের বেশি।'

বিরক্তিকর লোকটা, মিস্টার প্যুমব্‌লচুক, উত্তেজনায় হাত ঘষতে ঘষতে মাথা ঝাঁকালেন। 'শুনলে, মা, দশ পাউণ্ডেরও বেশি!'

'কত?' চেঁচালো আমার বোন।

'হ্যাঁ, কত, জোসেফ?' জিজ্ঞেস করলেন প্যুমব্‌লচুক।

'যদি বলি বিশ পাউণ্ড?' বললো জো।

'হ্যাঁ, ভালো অঙ্ক বলতে হবে তাহলে,' বললো মিসেস জো।

'তাহলে শোনো, বিশ পাউণ্ডের বেশি।'

'বিশ পাউণ্ডের বেশি!' আগের মতো হাত ঘষতে ঘষতে বললেন মিস্টার প্যুমব্‌লচুক। 'শুনলে, মা, বিশ পাউণ্ডেরও বেশি!'

'কত বল না তাড়াতাড়ি, গর্দভ!' চিৎকার করলো আমার বোন।

'হ্যাঁ, জোসেফ, বলো।'

'তাহলে বলি আসলে কত দিয়েছে,' টাকার থলেটা আমার বোনের হাতে দিতে দিতে বললো জো, 'পঁচিশ পাউণ্ড।'

'পঁচিশ পাউণ্ড! বলেছিলাম না, মা?' এমন ভাবে চিৎকার করলেন মিস্টার প্যুমব্‌লচুক, মনে হলো এই পঁচিশ পাউণ্ড পাওয়ার কৃতিত্ব পুরোটাই তাঁর। 'তাহলে বুঝলে আজ, আমি যা করি তোমাদের ভালোর জন্যেই করি?'

'সে কি আর নতুন ক'রে বলতে হবে?' গদ গদ কণ্ঠে জবাব দিলো আমার বোন।

# নয়

বাড়ি কখনোই ভালো লাগতো না আমার। বোনের দুর্ব্যবহারই তার প্রধান কারণ। এছাড়াও আমাদের বাড়ির চেহারা ছবি মোটেই ভালো নয়। ভেতরে আসবাবপত্র সব জৌলুষহীন। তার ওপর ঘন ঘন মিস্টার প্লামব্লচুকের আগমন এবং আমার ওপর খবরদারি। আর যা-ই হোক এবাড়ি নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু আমার ছিলো না। এস্টেলা দূরে থাক মিস হ্যাভিশ্যামের মতো বৃদ্ধাকেও এবাড়িতে ডাকার কথা কল্পনা করতে পারি না আমি। এখন বাড়ি আরো নিরানন্দ হয়ে উঠলো আমার কাছে; এস্টেলাকে দেখতে পাবো না।

আরও একটা ব্যাপার আজকাল আমার একদম ভালো লাগছে না: জো-র সহকারী হিশেবে কাজ করতে। ম্যানর হাউস মানে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে কিছুদিন যাওয়া আসা ক'রে এই ব্যাপারটা আমার হয়েছে: কামার হওয়ার ইচ্ছা একেবারেই দূর হয়ে গেছে মন থেকে, আমার মনের পর্দায় সবসময় একটা ছবি ভাসে: আমি কালিঝুলি মেখে কামারশালায় আগুনের সামনে বসে হাতুড়ি পিটাচ্ছি আর এস্টেলা জানালা দিয়ে তা দেখে উপেক্ষার হাসি

হাসছে। লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হতে চাই আমি, এস্টেলার যোগ্য হতে চাই। অবশ্য মনের এই ইচ্ছা কখনো জো-র কাছে প্রকাশ করিনি। আমি ওর পেশাকে নিজের পেশা হিশেবে নিতে চাই না শুনলে ও ভীষণ দুঃখ পাবে। এদিকে এস্টেলাকে দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছে আমার ভেতর। জো-র কামারশালায় কাজ করি ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে থাকে ম্যানর হাউসে। বছর খানেক কেটে গেল এভাবে।

অবশেষে এক রোববারে জো যখন আয়েশ ক'রে পাইপ টানছে আমি ওকে বললাম, 'জো, এবার একবার মিস হ্যাভিশ্যামকে দেখে আসা উচিত না আমার, কী বলো তুমি?'

'কেন, পিপ?'

'কেন মানে? মানুষ মানুষকে দেখতে যায় কেন? উনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন আমি গেলে। না গেলে হয়তো অকৃতজ্ঞ ভাববেন?'

'আবার, তুমি কিছু চাইতে এসেছো এমনও ভাবতে পারেন।'

'যদি ভাবেনই কী এসে গেল? আমি কিছু না চাইলেই তো উনি বুঝবেন আমি দেখতেই এসেছি, তাই না?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তুমি দেখতে গেলেই উনি খুশি হবেন এমন ভাবছো কেন? বিরক্তও তো হতে পারেন, না কী?'

জো-র এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিতে পারলাম না। জো বলে চললো:

'সেদিন যেভাবে উনি আমাদের বিদায় জানিয়েছেন—আমাকে এবং তোমাকেও—তাতে আমার মনে হয়েছে আমাদের কেউ আবার ওবাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষুক, উনি চান না।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'কিন্তু, জো—'

'হ্যাঁ, বলো, পিপ বাবু ?'

'এটা তো স্বীকার করবে একবার অন্তত ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার ভদ্রমহিলাকে।'

'তা উচিত,' বললো জো। 'কিন্তু ওঁর ধন্যবাদের প্রয়োজন আছে কিনা জানা দরকার না? বরং তুমি যদি কোনো উপহার নিয়ে যাও—'

'না, জো, অমন কিছু আমি ভাবছি না। আমি কী উপহার দেবো মিস হ্যাভিশ্যামকে ?'

'কিছু একটা। ওঁর কাছে হয়তো তুচ্ছ মনে হবে তবু—'

'না, জো, না,' আমি মরিয়া কণ্ঠে বললাম, 'কোনো উপহারের কথা আমি ভাবছি না। আমি শুধু যাবো, দেখা করবো মিস এস্ট—হ্যাভিশ্যামের সাথে। তারপর—'

'ভদ্রমহিলার নাম এস্ট্যাভিশ্যাম নয়, পিপ,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো জো, 'অবশ্য এর ভেতর উনি নাম বদলে থাকলে অন্য কথা।'

'জানি জো,' আমি বললাম। 'মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। আমি যা বলতে চাইছি, কাল তুমি যদি আধবেলা ছুটি দাও আমাকে, আমি যেতে পারি শহরে।'

আমার বিশ্বাস আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে জো। সেজন্যেই ঠেকাতে চেষ্টা করছিলো। যখন বুঝলো আমি নাছোড়বান্দা তখন বললো, 'ঠিক আছে, কাল পাবে তুমি আধবেলা ছুটি।'

জো-র এক কর্মচারী আছে নাম অরলিক। সাপ্তাহিক বেতনে কাজ করে। শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান লোক। দুনিয়ার কাউকে সে পছন্দ করে

না, দুনিয়ার কেউও তাকে পছন্দ করে না। আমার জন্যে ওর অপছন্দটা সবচেয়ে বেশি। আমি যখন খুব ছোট তখন থেকেই সে আমাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। জো-র অনুপস্থিতিতে আমি কামারশালায় ঢুকলেই আমাকে ভয় দেখাতো, আমাকে জ্বালানী ক'রে একদিন সে আগুন জ্বালাবে বলে। জো-র কাছে কাজ শিখতে শুরু করার পর আমার প্রতি ওর বিদ্বেষটা আরো বেড়েছে। সম্ভবত ওর ধারণা হয়েছে আমি পুরোদস্তুর কাজ শিখে গেলে ওর আর প্রয়োজন থাকবে না জো-র কাছে, চাকরিটা ও হারাবে।

যাহোক পরদিন যখন আমি জো-কে আধবেলা ছুটি দেয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি তখন এই অরলিক কামারশালায় রয়েছে। আমি হাপর চালাচ্ছি, জো আর ও লাল-তপ্ত একটা লোহা পিটিয়ে আকার দিচ্ছে। হাতের কাজটা শেষ হওয়ার পর হাতুড়ি নামিয়ে রাখতে রাখতে অরলিক জো-কে বললো :

'আপনি মালিক, নিশ্চয়ই আপনি দু'জন কর্মচারীর সঙ্গে দু'-রকম ব্যবহার করতে পারেন না? পিপ যদি আধবেলা ছুটি পায় বুড়ো অরলিকেরও পাওয়া উচিত, তাই না?'

ও সবসময় নিজেকে বুড়ো অরলিক বলে, যদিও ওর বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ বছর।

'কেন?' জো জিজ্ঞেস করলো, 'আধবেলা ছুটি দিয়ে কী করবে তুমি?'

'কী করবো? ও কী করবে?' বললো অরলিক। 'ও যা করবে আমিও তাই করবো।'

'পিপ তো শহরে যাবে।'

'তাহলে বুড়ো অরলিকও শহরে যাবে। দু'জন আমরা এক সাথেই যেতে পারি। একজন শহরে যাবে আরেকজন এখানে বসে হাতুড়ি পিটবে এ হতে পারে না।'

'অরলিক, কী বলছো বুঝে শুনে বলো,' শান্ত কণ্ঠে বললো জো।

'বুঝেই বলছি,' গোঁয়ারের মতো বললো অরলিক। 'আপনি মালিক হয়েও বুঝতে চাইছেন না। ওকে আধবেলা ছুটি দিলে আমাকেও দিতে হবে।'

জো নির্বিরোধী মানুষ। একটু চিন্তা ক'রে বললো, 'ঠিক আছে, অরলিক, পাবে তুমিও আধবেলা ছুটি। এবার যাও কাজে মন দাও।'

আমার বোন যে কখন কামারশালার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি কেউ। যে-ই না জো উচ্চারণ করেছে, 'ঠিক আছে, অরলিক, পাবে তুমিও আধবেলা ছুটি।...' অমনি সে ছুটে এসে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো ভেতরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলো:

'এই! এই, গাধা! ঐ কুড়ের বাদশাটাকে ছুটি দিলে কী বলে? অনেক টাকা হয়ে গেছে তোমার? এজন্যেই তো দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেলাম না জীবনে। আমি বদমাশটার মনিব হলে ছুটি ভালো মতো দিয়ে দিতাম!'

'চাইলে তো সবারই মনিব হতে পারেন আপনি,' কুৎসিত একটা হাসি হেসে বললো অরলিক।

'চুপ করো, অরলিক!' মৃদু স্বরে ধমক দিলো জো।

'হ্যাঁ, হলে ভালোই হতো!' চেঁচালো আমার বোন। 'তোর

মতো বদমাশদের শায়েস্তা করার কায়দা আমি ভালোই জানি। কাজের নামে ঢন ঢন কিন্তু ছুটি দিতে হবে চাওয়া মাত্র!'

'মুখ সামলে কথা বলুন!' গর্জে উঠলো অরলিক।

ভাগ্য ভালো জানালায় বোনের মুখ দেখেই আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি। নইলে হয়তো কামারশালায় ঢুকে মেরেই বসতো অরলিককে।

'চুপ করবে তুমি, অরলিক?' বললো জো।

'কী! কী বললি তুই?' খ্যাপার মতো চিৎকার করলো আমার বোন। 'আমাকে বলিস মুখ সামলাতে! দাঁড়া—' বলে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা মারলো সে। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি ক'রেও যখন দরজা খুলতে পারলো না তখন আবার চিৎকার শুরু করলো। অরলিকও পাল্টা চিৎকার করতে লাগলো।

এরকম চলতে লাগলো। দু'জনেরই চিৎকার উত্তরোত্তর বাড়ছে। জো-র কণ্ঠস্বরও আস্তে আস্তে কড়া হচ্ছে: 'চুপ করো, অরলিক! বলছি চুপ করো!' কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এদিকে আমার বোনের চেঁচানি ক্রমশঃ হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হয়ে উঠছে।

'ওহ! ওহ! আমার স্বামীর সামনে! আমার স্বামীর সামনে এমন অপমান আমার! এরপরও বাঁচতে হবে আমাকে!' বলতে বলতে জানালার শিক ধরে বসে পড়লো সে। প্রচণ্ড ক্রোধে, জ্ঞান হারিয়েছে।

অরলিক চিৎকার করলো, 'অপমান? পারলে তোমাকে পিষে মারতাম!'

আর ধৈর্য রাখতে পারলো না জো। কষে এক চড় লাগালো

অরলিকের গালে। অমনি রুখে দাঁড়ালো অরলিক।

সন্দেহ নেই অরলিক শক্তিশালী, বিশালদেহী। কিন্তু জো-র তুলনায় ও শিশু। জো-র মতো শক্তিশালী, পেশল শরীরঅলা মানুষ এ তল্লাটে আর একটাও নেই। দু'সেকেণ্ড যেতে না যেতেই অরলিককে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। উঠতে পারছে না সে। দরজা খুলে কামারশালার বাইরে বেরিয়ে এলো জো। অচেতন স্ত্রীকে জানালার সামনে থেকে তুলে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

সামান্য পরিচর্যাতেই জ্ঞান ফিরে এলো আমার বোনের। এবং চোখ মেলেই তড়াক ক'রে উঠে বসে খামচে ধরলো জো-র চুল। তারপর শান্ত সে। মুহূর্তেই সব ক্রোধ তার প্রশমিত হয়েছে। আমি আমার ঘরে চলে গেলাম কাপড় পাল্টাতে।

আমার সবচেয়ে ভালো পোশাকটা পরে যখন আবার কামারশালায় ঢুকলাম, দেখি জো আর অরলিক মেঝে পরিষ্কার করছে। দু'জনই ঝগড়া, মারামারির কথা ভুলে গেছে। বন্ধুভাবে এক পাত্র থেকে মদ ভাগ ক'রে খাচ্ছে। অরলিকের মুখ থেকে জো-র আঘাতের চিহ্নটা অবশ্য যায়নি এখনো।

শহরে পৌঁছে সোজা মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে গেলাম। কিন্তু ঘণ্টা বাজানোর সাহস হলো না। অনেকক্ষণ ফটকের সামনে পায়চারি করলাম। মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে ডাকেননি, আমার দিক থেকেও আসার তেমন যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই—কেমন ব্যবহার পাবো কে জানে। এস্টেলাকে দেখতে এসেছি, কিন্তু একথা

তো কাউকে বলতে পারবো না। অবশেষে অনেক চেষ্টায় বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে বাজালাম ঘণ্টা।

এস্টেলা নয়, মিস সারাহ পকেট এলেন। ফটক না খুলেই জিজ্ঞেস করলেন :

'কী ব্যাপার ? তুমি আবার এসেছো ? কী চাও ?'

'মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'দাঁড়াও !'

চলে গেলেন সারাহ পকেট। ফিরলেন একটু পরেই। ফটক খুলে দিয়ে বললেন, 'এসো।'

সবকিছু আগের মতো আছে ; একটুও পরিবর্তন হয়নি। মিস হ্যাভিশ্যাম একা বসে আছেন ঘরে।

'তারপর ?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'আশা করি কিছু চাইতে আসোনি। চাইলে পাবে না।'

'না, মিস হ্যাভিশ্যাম,' আমি বললাম, 'কিছু চাইতে আসিনি। এসেছি আপনাকে জানাতে, যে আমি ভালোই কাজ শিখছি। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা !' অস্থির আঙুলগুলো নেড়ে বললেন তিনি। 'মাঝে মাঝে এসো তুমি, হ্যাঁ। তোমার জন্মদিনে এসো।···কী দেখছো চারদিকে ? এস্টেলা আছে কিনা ?'

সত্যিই আমি চারদিকে তাকাচ্ছিলাম, এবং এস্টেলার খোঁজেই। প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেলাম।

'ও—ও নিশ্চয়ই ভালো আছে ?' কোনোমতে জবাব দিলাম।

'বিদেশে,' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'নামকরা এক স্কুলে ভদ্রমহিলা হিশেবে গড়ে উঠছে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে।

যে দেখে সে-ই ওর রূপের প্রশংসা করে। তোমার কি মনে হয় ওকে হারিয়েছো তুমি ?'

শেষের কথা ক'টা এমন এক ভঙ্গিতে বললেন যে, আমার মনে হলো, বলতে পেরে খুবই উল্লসিত বোধ করছেন তিনি। কী জবাব দেবো আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্য জবাব দেয়ার সুযোগও তিনি দিলেন না। বিদায় জানালেন আমাকে।

মিস পকেট যখন বিরাট ফটকটা আমার মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দিলেন, কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি। আমার বাড়ি, আমার কাজ আগে থেকেই খারাপ লাগে আমার, এখন আরো খারাপ লাগতে লাগলো। বিষণ্ণ মনে এগিয়ে চললাম শহরের দিকে।

শহরের রাস্তায় মিস্টার ওপস্‌ল-এর সাথে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সাথে গেলাম আঙ্কল পুমব্‌লচুকের বাড়িতে। ওখানে কিছুক্ষণ বসে আমরা রওনা হলাম বাড়ির পথে। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে। পথে এক লোকের সাথে দেখা হলো। এমন পরিস্থিতিতে, এমনভাবে দেখাটা হলো যে, আমি ধারণা করতে বাধ্য হলাম, স্রেফ ঘটানাচক্রে দেখা হয়ে যায়নি লোকটার সাথে, সে অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্যে। অন্ধকারে আমি বুঝতে পারলাম না সে কে।

'কে!' দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন মিস্টার ওপস্‌ল। 'অরলিক নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লোকটা। 'সঙ্গীর আশায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'রাত ক'রে ফেলেছো তুমি,' আমি বললাম।

'তা-ই ?' বিদ্রূপের সুরে বললো অরলিক। 'তাহলে তুমি কী

করেছো?' মিস্টার ওপস্‌ল-এর দিকে তাকালো সে। 'বাড়ি যাচ্ছি। আপনারাও নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'ভালোই হলো, আপনাদের সাথে যেতে পারবো।'

তিনজন হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। অরলিক মিস্টার ওপস্‌ল-এর সাথে নানা বিষয়ে কথা বলে চললো। আমি চুপ। অরলিকের সাথে নেহায়েত প্রয়োজন না পড়লে আমি কথা বলি না। তাছাড়া কথা বলার মতো মেজাজে এখন নেই আমি। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে ভেসে আসা কামানের গর্জন শুনলাম কয়েকবার। মিস্টার ওপস্‌ল বললেন:

'আবার কোনো কয়েদী পালিয়েছে।'

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে গ্রামে পৌঁছুলাম আমরা। থ্রি জলি বার্গমেন-এর সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। দরজা খোলা সরাইখানাটার, যা কখনোই থাকে না। সামনে অনেক মানুষের জটলা। তাদের কয়েকজনের হাতে লণ্ঠন। সবাইকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

মিস্টার ওপস্‌ল এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে কী হয়েছে জানতে। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই দেখলাম ছুটতে ছুটতে আসছেন তিনি।

'তোমাদের বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে, পিপ,' ছোটার গতি না কমিয়েই বললেন তিনি। 'জলদি চলো!'

'কী হয়েছে?' তাঁর পাশে পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি জিজ্ঞেস করলাম। অরলিকও দৌড়াচ্ছে আমাদের পেছন পেছন।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না,' জবাব দিলেন মিস্টার ওপস্‌ল।

'জো যখন সরাইখানায় ছিলো তখন কেউ ঢুকেছিলো তোমাদের বাড়িতে। কাউকে আঘাত ক'রে মারাত্মক জখম করেছে।'

আর কোনো কথা না বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেলাম আমরা। বাড়ি পৌঁছে দেখলাম প্রতিবেশীরা সব ভীড় ক'রে আছে রান্না-ঘরে। জো-ও আছে তাদের ভেতর। এক ডাক্তারকেও দেখলাম। আমাকে এগোতে দেয়ার জন্যে সবাই পেছনে সরে পথ ক'রে দিলো। তারপর দেখলাম, আমার বোন পড়ে আছে মাটিতে। মাথার পেছন দিকে আঘাত করা হয়েছে তাকে।

এর পর আর কখনো তার রুদ্রমূর্তি দেখা যায়নি, তর্জনগর্জন শোনা যায়নি।

পরদিন ঠাণ্ডা মাথায় আমি ভাবতে লাগলাম, কার কাজ হতে পারে এটা। জো রাত সোয়া আটটা থেকে পৌনে দশটা পর্যন্ত ছিলো থ্রি জলি বার্গমেন-এ। আমার বোন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরতা এক কৃষকের সাথে শুভরাত্রি বিনিময় করেছিলো। কৃষকটির বক্তব্য তখন রাত নটা টটা হবে। জো দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় বাড়ি ফিরে দেখে আমার বোন মেঝেতে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ও সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করে।

বাড়ি থেকে কোনো জিনিস খোয়া যায়নি, শুধু মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়া হয়েছিলো। ভারি এবং ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে আমার বোনের মাথায়। তার অচেতন দেহের পাশে পাওয়া গেছে একটা রেতি ঘষে কাটা বেড়ি। জো কামারের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে পরীক্ষা ক'রে ঘোষণা করেছে, বেড়িটা কাটা হয়েছে অনেকদিন

আগে। আর জানা গেছে গত রাতে যে দু'জন কয়েদী পালিয়েছে তাদের একজন ধরা পড়েছে। তার পায়ের বেড়ি ঠিকই আছে।

ব্যাপারগুলো জানার পর আমার প্রথমেই মনে হলো, যে কয়েদীকে আমি রেতি দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই একাজ তার। বেড়িটা যে তার পায়ের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু ভাবতেই বুঝতে পারলাম বেড়িটা তার পায়ের হলেও কাজটা তার হতে পারে না। কেটে ফেলা বেড়ি নিশ্চয়ই লোকটা সংরক্ষণ করেনি। করলেও আবার যখন ধরা পড়ে ওটা ওকে কাছে রাখতে দেয়নি রক্ষীরা। এরপর মনে হলো একাজ হয় অরলিকের নয়তো সেই অচেনা লোকটার, যে থ্রি জলি বার্গমেন-এ আমাকে দেখিয়ে রেতি দিয়ে গ্লাসের রাম নেড়েছিলো।

অরলিককে ধরতেই সে সরাসরি অস্বীকার করলো। বললো, সে আমার পরপরই বেরিয়েছে, সারা বিকেল শহরে কাটিয়েছে, ফিরেছে আমারই সাথে। তাহলে কখন সে করলো এ কাজ? সেই অচেনা লোকটাই বা কেন করতে যাবে? তার দু'খানা এক পাউণ্ডের নোট তো ফিরিয়েই দিতে চেয়েছিলো আমার বোন। সে যদি ওদুটো ভুল ক'রে দিয়ে থাকে এসে ফেরত চাইলেই পেয়ে যেতো। আরেকটা ব্যাপার: আমার বোনের সাথে আঘাতকারীর কোনো ধস্তাধস্তি হয়নি। তেমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি ঘরে। যার কাজই হোক সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আচমকা আঘাত করেছে আমার বোনকে। মোমবাতিটা আঘাত করার আগে না পরে নিভিয়েছে, নাকি ওটা আপনা থেকেই নিভেছে তা জানার কোনো উপায় নেই।

পুলিস যথারীতি এ নিয়ে কয়েকদিন হৈ চৈ করলো। নিরপরাধ

কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করলো। লণ্ডন থেকেও এলো উঁচুদরের তদন্তকারীরা। কিন্তু অপরাধীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে রইলো আমার বোন। অবশেষে একটু সুস্থ হলো। তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সে আর কোনোদিনই হলো না। মাথার পেছনে প্রচণ্ড আঘাতের পরিণামে চলাফেরার এবং স্পষ্ট ক'রে দেখার ও কথা বলার ক্ষমতা চিরতরে হারালো। কিছু বলতে চাইলে এখন তাকে শ্লেটে লিখে বোঝাতে হয়। লিখতেও ভালো-ভাবে পারে না। হাত কাঁপে। লেখা জড়িয়ে যায়, আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। অনেক কষ্টে তার পাঠোদ্ধার করতে হয়। এখন অনেক ধৈর্যশীলাও হয়েছে সে। একেবারে যেন মাটির মানুষ হয়ে গেছে। কখনো রাগ করে না—না আমার ওপর, না জো-র ওপর।

জো প্রথম কিছুদিন সব কাজ ফেলে স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করলো। কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না। জো যদি সারাদিন ঘরের কাজ করে তাহলে ওর ব্যবসা মানে কামারশালা চালাবে কে, উপার্জন করবে কে? এই দুঃসময়ে মিস্টার ওপস্‌ল তাঁর ভাইঝি বিডিকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের বাড়িতে। খুবই উপকার হয়েছে তাতে আমাদের। আমার বোনের সেবা যত্ন থেকে শুরু ক'রে বাড়ির সব কাজ করে বিডি। জো-র প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করে ও। বেচারা জো! স্ত্রীর এই মর্মান্তিক পরিণতিতে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে সে। আমার বোন বিয়ের পর থেকে হয়তো একদিনও ভালো আচরণ করেনি ওর সাথে তবু ও সব সময়ই ভালোবেসে এসেছে তাকে।

বিডি আসার ঠিক আগ দিয়ে ক'দিন ধরে আমার বোন শ্লেটে 'টি' অক্ষরটা লিখছিলো। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না

এ দিয়ে সে কী বোঝাতে চাইছে। বুদ্ধিমতী বিডি এসেই সমাধান ক'রে দিলো। জো আর আমাকে নিয়ে কামারশালায় গেল ও। অরলিককে দেখিয়ে বললো :

'ওর কথা বলতে চাইছে মিসেস জো। দেখছো না, ওর হাতে হাতুড়ি।'

সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হলো তা-ই। হাতুড়ির চেহারা অনেকটা 'টি' অক্ষরের মতো। নিশ্চয়ই অরলিকের নাম ভুলে গেছে আমার বোন। ওর হাতুড়ি এঁকে বোঝাতে চাইছে ওর কথা।

অরলিককে আমরা ঘরে ডেকে আনলাম। ভেবেছিলাম ওকে দেখেই খেপে উঠবে আমার বোন। কিন্তু ঘটলো ঠিক তার উল্টো। বিদ্বেষের বদলে বন্ধুত্বের ছাপ ফুটে উঠলো তার চেহারায়। ইশারায় অরলিককে কিছু পান করতে দিতে বললো। ভাবভঙ্গি এবং ইশারায় বোঝালো যেন ওর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি না হয়।

এর পর থেকে প্রতিদিনই কিছুটা সময় আমার বোনের ঘরে এসে কাটাতে হয় অরলিককে। হঠাৎ ক'রে ওর ওপর তার এই আসক্তির কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না।

# দশ

কয়েক দিনের উত্তেজনার পর আবার সেই একঘেয়ে কাজ। রোজ কামারশালায় জো-কে সাহায্য করা—হাপর চালানো, নয়তো হাতুড়ি পেটানো।

আমার শিক্ষানবিশ জীবনের একমাত্র বৈচিত্র্য হলো আমার জন্মদিনে মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করতে যাওয়া। মিস সারাহ পকেটই ফটক খুলে দেন। মিস হ্যাভিশ্যাম একই সুরে একই ভঙ্গিতে কথা বলেন। ব্যতিক্রমের মধ্যে প্রতি জন্মদিনে তিনি একটা ক'রে গিনি উপহার দেন আমাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে তা নিতে হয়। কিন্তু এস্টেলাকে কোনোদিন দেখি না। এস্টেলার মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। ওর জন্যেই আমি আমার বাড়ি বা কাজ কোনোটাতেই কোনো রকম আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি না।

এদিকে লক্ষ্য করছি, বিডির ভেতর একটু একটু ক'রে কেমন একটা পরিবর্তন আসছে। ওর জুতোর গোড়ালি আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে; চুল উজ্জ্বল হচ্ছে, পরিপাটি হচ্ছে, হাত সবসময় থাকে

পরিষ্কার। পোশাক আশাকও দেখছি আগের চেয়ে অনেক যত্ন নিয়ে সুন্দর ক'রে পরে। চেহারার দিক দিয়ে খুবই সাধারণ ও, যত সাজসজ্জাই করুক না কেন এস্টেলার মতো হতে পারবে না। তবে স্বভাবটা বড় ভালো; কোমল, মধুর, নিরহঙ্কার। ওর এই মধুর স্বভাব আরো মধুর হচ্ছে যেন।

কাজের শেষে রোজ সন্ধ্যায় আমি লেখাপড়া করতে বসি; বিডি আগুনের সামনে বসে সেলাই করে বা উল বোনে। পড়তে পড়তে বা লিখতে লিখতে কখনো যদি মুখ তুলে তাকাই দেখি ও আমার দিকে চেয়ে আছে। অদ্ভুত সুন্দর ভাষাময় ওর চোখ দুটো। চোখ দেখলেই বোঝা যায় ও বুদ্ধিমতী।

এক রোববার বিকেলে আমি বিডিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। জো রইলো আমার বোনের কাছে।

বিকেলটা চমৎকার। কিছুক্ষণ জলাভূমির আশপাশে ঘুরে বেড়ানোর পর নদীর পাড়ে গিয়ে বসলাম দু'জন। আমার দুঃখের কথা, আমার আশার কথা শোনাতে চাই বিডিকে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবো? কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম:

'বিডি, এখন যে কথা বলবো, কথা দাও তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

'দিলাম,' মৃদু হেসে বললো বিডি।

'আমি ভদ্রলোক হতে চাই, বিডি।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিডি বললো, 'তোমার জায়গায় আমি হলে তা চাইতাম না। যাহোক, আমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না। তুমিই ভালো বোঝো কিসে তোমার

ভালো হবে।'

'বিডি, আমার ভদ্রলোক হতে চাওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ আছে। যে জীবন আমি কাটাচ্ছি এ আর আমার ভালো লাগছে না।'

'জো-র শিক্ষানবিশ থাকতে তোমার ভালো লাগছে না ?।'

'না, বিডি, না! একদম ভালো লাগছে না। প্রথমদিন থেকেই আমার অসহ্য লাগছে একাজ। আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমি—আমি মনে করি একমাত্র ভদ্রলোক হতে পারলেই আমি সুখী হবো। প্রথমে তো কামার হতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। জো-র মতো আমিও ভাবতাম আমি ওর সহকারী হবো, হয়তো একদিন ওর অংশীদারও। কিন্তু একজন যেদিন আমাকে রুক্ষ বলেছে, সাধারণ কাজের ছেলে, ছোটলোক বলেছে; আমি কামার হতে চাই শুনে হেসেছে, সেদিন থেকে আমি এ জীবনকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। জো-কে বলতে পারিনি, ও দুঃখ পাবে ভেবে। কিন্তু আমি যে কী অসহ্য কষ্ট ভোগ করছি—'

'এসব কথা যে-ই বলে থাকুক সে বাজে কথা বলেছে,' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো বিডি। 'তুমি মোটেই রুক্ষ নও, মোটেই সাধারণ কাজের ছেলে নও। আর কামার হতে চাও শুনে হাসার কী আছে? কে এসব বলেছে?'

'মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ির সেই মেয়েটা। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। ওর জন্যেই আমি ভদ্রলোক হতে চাই।'

চুপ ক'রে রইলো বিডি। কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি ওকে রাগানোর জন্যে ভদ্রলোক হতে চাও? প্রমাণ করতে

চাও ও ভুল বলেছে ? নাকি ওকে খুশি করতে চাও ?'

'জানি না,' বেশ একটু ঝাঁঝের সাথে আমি বললাম।

'যদি ওকে রাগাতে চাও তাহলে ভদ্রলোক না হওয়াই উচিত হবে তোমার,' বলে চললো বিডি। 'ভুলে যাও ও কী বলেছে। ওর কথা মনেও রেখো না। আর যদি তুমি ওর মন জয় করতে চাও তবু বলবো ; সময় নষ্ট কোরো না, ভুলে যাও ওকে। যে তোমাকে রুক্ষ, ছোটলোক, কাজের ছেলে বলতে পারে তার মন জয় করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার।'

একথা আমিও ভেবেছি অনেকবার, কিন্তু মনকে বোঝাতে পারিনি।

'হয়তো—হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো, বিডি,' আমি বললাম। 'কিন্তু ও এত সুন্দর, আমি ওকে ভুলতে পারবো না।'

বিডি বুদ্ধিমতি মেয়ে। আর কিছু বললো না ও। আলতো ক'রে আমার হাতে হাত রাখলো। তারপর মাথায়। আঙুল দিয়ে চুলে বিলি কেটে দিলো কিছুক্ষণ। আমার দু'চোখ ভিজে উঠলো জলে। জামার হাতা দিয়ে যখন চোখ মুছছি আমার কাঁধে মৃদু চাপড় দিলো বিডি। যেন বলতে চাইলো, 'কাঁদার কী আছে এতে ?' আমি স্বাভাবিক হওয়ার পর বিডি বললো :

'তুমি যে বিশ্বাস ক'রে তোমার মনের কথা আমাকে বলতে পেরেছো এতেই আমি খুশি। আমি কোনোদিন তোমার এই বিশ্বাসের অমর্যাদা করবো না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। 'আমরা কি আরেকটু হাঁটবো না বাড়ি ফিরবো ?'

'বিডি,' ওর কাঁধে হাত রেখে আমি বললাম, 'আমি সবসময়

আমার সব কথা বলবো তোমাকে। কিছুই গোপন করবো না।'

'যতদিন না ভদ্রলোক হচ্ছো বোলো।'

'তুমি ভালো করেই জানো কোনোদিনই আমি হতে পারবো না।' একটু হাসলাম আমি। 'সুতরাং আজীবন আমি আমার সব কথা তোমাকে বলে যাবো।'

'আরেকটু বেড়াবো আমরা, না বাড়ি ফিরবো?' বিডি আবার করলো প্রশ্নটা।

'আরেকটু হাঁটি,' বললাম আমি।

উঠে আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। গ্রীষ্মের বিকেল আস্তে আস্তে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছটা অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেছে। জলাভূমির দিক থেকে ভেসে আসছে ভেজা হাওয়া। এমন পরিবেশ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

'বিডি,' ওর হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, 'আশা করি তুমি আমাকে ঠিক থাকার শক্তি যোগাবে।'

'আশাকরি।'

'এস্টেলাকে ভুলে গিয়ে তোমাকে যদি ভালোবাসতে পারতাম! —খোলাখুলি বললাম কথাটা, কিছু মনে করোনি তো?'

'না, না, কী যে বলো! আমার কথা ভেবো না।'

'যদি পারতাম, আমার জন্যে সবচেয়ে ভালো হতো সেটা।'

'পারবে না, দেখো,' বললো বিডি।

নীরবে পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমরা। একটু পরেই অরলিকের সঙ্গে দেখা।

'আরে তোমরা!' বাঁকা একটু হাসি হেসে সে বললো। 'দু'জন

এক সাথে। যাচ্ছো কোথায়?'

'বাড়ি ছাড়া আর কোথায় মনে হয় তোমার?' আমিও বাঁক ক'রে বললাম।

'দেখা হয়ে গেল অথচ একসাথে গেলাম না, অভদ্রতা হয়ে যাবে না? চলো আমিও যাই তোমাদের সাথে।'

'না, পিপ, ওকে আসতে দিও না,' ফিস ফিস ক'রে বললো বিডি। 'আমি ওকে পছন্দ করি না।'

আমিও পছন্দ করি না অরলিককে। বললাম, 'ধন্যবাদ, অরলিক, আসতে চেয়েছো বলে। কিন্তু তার কোনো দরকার নেই। তোমাকে ছাড়াই আমরা যেতে পারবো, কিছু মনে করবো না।'

অপমানটা নীরবে হজম করলো অরলিক। চেষ্টা ক'রে একটু হেসে বললো, 'ঠিক আছে, বাবা, যাও, তোমাদের বিরক্ত করবো না।'

আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ খানিকটা পেছনে থেকে আসতে লাগলো অরলিক। আমি বিডিকে জিজ্ঞেস করলাম:

'ওকে পছন্দ করো না কেন?'

'ওহ!' পেছন ফিরে দেখলো বিডি অরলিকের অবয়বটা। 'আমার —আমার সন্দেহ ও আমাকে পছন্দ করে।

'কখনো বলেছে তোমাকে?'

'না, ওর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছি। কিন্তু তাতে তোমার কী শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো বিডি।

'আমার কিছু না ঠিক,' একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'তবু— তবু আমি এটা মানতে পারছি না।'

'আমিও পারি না। কিন্তু তাতে তোমার কী এসে গেল?'

'দেখ, বিডি, তুমিও যদি ওকে পছন্দ করতে আমার কিছু

বলার ছিলো না। কিন্তু তুমি পছন্দ করো না অথচ ও তোমাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করছে, এটা সহ্য করা সম্ভব নয়।'

বিডি কিছু বললো না। মনে হলো একটা দীর্ঘশ্বাস যেন চেপে গেল সে। সেদিন থেকে অরলিকের দিকে নজর রাখতে শুরু করলাম আমি। আমাদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ তীব্রতর হলো।

## এগারো

আমার একঘেয়ে নিরানন্দ শিক্ষানবিশ জীবনের চতুর্থ বছর চলছে।

এক শনিবার সন্ধ্যায় জো আর আমি কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় লোকের সঙ্গে বসে আছি সরাইখানার আগুনের সামনে। মিস্টার ওপস্‌ল খবরের কাগজ পড়ছেন জোরে জোরে, আমরা শুনছি। পড়া শেষ হতেই যে খবরটা পড়া হয়েছে সেটার ওপর মতামত প্রকাশ করতে লাগলো বিভিন্নজন।

উপস্থিত সবাই আমাদের গ্রামের লোক। কেবল একজনকেই দেখলাম অপরিচিত। আমার সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। বেশ ভারিক্কী চেহারা। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আমার দিকে, জো-র দিকে। অন্য সবার দিকেও তাকাচ্ছেন। অন্য-

সন্ধানী দৃষ্টি তাঁর চোখে। তিনিও দু'চারটে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করলেন খবরটা সম্পর্কে। তারপর হঠাৎই কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন :

'আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে একজন কামার আছে। তার নাম জোসেফ, জোসেফ গারগেরি। কে সে ?'

'আমি,' বললো জো।

'আপনার একজন শিক্ষানবিশ আছে,' বললেন ভদ্রলোক। 'তাঁর নাম পিপ। ও কি এখানে আছে ?'

'আছি,' আমি জবাব দিলাম।

ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু আমি, এখন ভালো ক'রে তাকাতেই চিনতে পারলাম তাঁকে। মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে দ্বিতীয়বার যখন যাই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো সিঁড়িতে। আমার গাল চেপে ধরে ভদ্র আচরণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

'আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, মিস্টার গারগেরি,' জো-র দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার সাথে আর এই ছেলেটা—মানে পিপের সাথে। এত মানুষের ভেতর বলা যাবে না, তাছাড়া একটু সময়ও লাগবে। আপনার বাড়িতে গেলেই ভালো হয়।'

থ্রি জলি বার্গমেন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু নীরবে হাঁটলেন ভদ্রলোক। ঘরে ঢুকে পার্লারে বসলাম তিনজন টেবিল ঘিরে। টেবিলে একটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। ভদ্রলোক সেটা নিজের কাছে টেনে নিলেন। পকেট থেকে ছোট একটা বাঁধানো খাতা বের ক'রে উল্টেপাল্টে দেখলেন দু'একটা পাতা। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন :

'আমার নাম জ্যাগার্স। ওকালতি করি। উকিল হিশেবে লণ্ডনে আমার মোটামুটি নাম ডাক আছে। আমার এক মক্কেলের এক উদ্ভট কাজ করার জন্যে আসতে হয়েছে আপনাদের এখানে। যাহোক, কাজের কথায় আসি। মিস্টার গারগেরি, আপনার শিক্ষানবিশ মানে পিপের শিক্ষানবিশী শেষ হতে এখনও তো কয়েক বছর বাকি তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললো জো।

'কিন্তু আমার এই মক্কেল এখনই পিপের ভার থেকে মুক্তি দিতে চান আপনাকে। অবশ্যই পিপের ভালোর জন্যে এটা তিনি করতে চান। এখন কথা হচ্ছে পিপকে কি আপনি এমনি এমনি ছেড়ে দিতে রাজি হবেন?'

জো এমন হতভম্ব হয়ে গেছে যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। তারপর আস্তে আস্তে বললো:

'না—ঈশ্বর না করুন, কেন আমি পিপের যাতে ভালো হবে তাতে বাধা দিতে যাবো?'

'ঈশ্বর না করুন কথাটা বেশ ধর্মভীরু ধরনের কিন্তু বিশেষ কাজের না,' বললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কিছু চান কি না? চান?'

'জবাবটা হচ্ছে,' জো রুক্ষস্বরে বললো, 'না।'

মিস্টার জ্যাগার্সের চোখে যে দৃষ্টি ফুটলো তা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইলো না তিনি জো-কে রামগর্দভ মনে করছেন।

'ভালো ক'রে ভেবে বলুন,' বললেন উকিল, 'একটু পরেই আবার মত বদলাবেন না যেন।'

'এতে ভাবাভাবির কিছু নেই মিস্টার জ্যাগার্স।'

'বেশ, তাহলে ঠিক হয়ে গেল কথা, পিপকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন। এবার পিপের সাথে কথা বলি। পিপ, তোমার সামনে এখন বিরাট সম্ভাবনা, আশা।'

জো আর আমি বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওই করলাম।

'খুব শিগগিরই তুমি ধনী হতে চলেছো,' বলে চললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'মোটা একটা সম্পত্তির মালিক হবে তুমি। আমার মক্কেল তোমাকে লিখে দেবেন। কিন্তু তাঁর শর্ত হচ্ছে সম্পত্তি পাওয়ার আগে তোমাকে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হতে হবে—এক কথায় তোমার ভেতর যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে তাকে বিকশিত করতে হবে।'

আমার মনে হলো, আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে বেশ বড় একটা সম্পত্তি দান করতে চলেছেন। আমাকে সুখী এবং ধনী একজন মানুষ হিশেবে গড়ে তুলতে চান তিনি। মিস হ্যাভিশ্যাম ছাড়া আর কে হতে পারে এই দাতা?

'এবার, পিপ,' বলতে লাগলেন উকিল, 'আমার মক্কেলের বাকি ইচ্ছাগুলোর কথা শোনো। তিনি চান তুমি পিপ নামেই ভবিষ্যৎ জীবনে পরিচিত হবে। আর আমার মক্কেল যতদিন না নিজে থেকে জানাবেন ততদিন তুমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইবে না বা জানার চেষ্টা করবে না। সময় হলে তিনি নিজেই পরিচয় দেবেন। তবে সময়টা কখন হবে, কেউ বলতে পারে না একমাত্র আমার মক্কেল ছাড়া। দশ বা বিশ বছরও পরে হতে পারে। এখন বলো, এ প্রস্তাবে তুমি রাজি? না হলে এখনই তোমাকে জানাতে হবে। বলো, কী তোমার মত?'

'আমার—আমার কোনো আপত্তি নেই,' কোনোমতে আমি জবাব দিলাম।

'এবার বাকি বিষয়গুলো—' বলে চললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'প্রথম কথা তোমাকে ভদ্রলোক হতে হবে। সেজন্যে তোমাকে লেখাপড়া এবং ভদ্রলোকের মতো আচার আচরণ, কথা বলা ইত্যাদি শিখতে হবে। লণ্ডন যেতে হবে। ওখানে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে তোমাকে সব শিখবার জন্যে। চিন্তার কিছু নেই, আমার অভিভাবকত্বে থাকবে। যা খরচখরচা লাগবে আমার কাছ থেকে পাবে মাসে মাসে—টাকাটা অবশ্যই তোমাকে যিনি সম্পত্তি দিতে চাইছেন তাঁর কাছ থেকে আসবে।

'লণ্ডনে একজন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হবে তোমার। জানা-শোনা কেউ আছে?···নেই। বেশ, আমার একজন আছেন চেনা। উনি তোমাকে শেখাবেন। তাঁর নাম মিস্টার ম্যাথ্যু পকেট।'

চমকে উঠলাম আমি। নামটা মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে শুনেছিলাম তাঁর জন্মদিনে, মিস হ্যাভিশ্যামের কথা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর যাঁর স্থান হবে টেবিলের মাথার কাছে, যিনি একমাত্র তাঁর মৃত্যুর পর দেখতে যাবেন তাঁকে! আমার চমকে ওঠা দৃষ্টি এড়ায়নি মিস্টার জ্যাগার্সের।

'নামটা আগে শুনেছো নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'তাহলে বলো, এই ভদ্রলোকের কাছে লেখাপড়া আদবকায়দা শিখতে কেমন লাগবে তোমার?'

'আমি খুশিই হবো।'

'বেশ, তাহলে তো আর কোনো সমস্যা রইলো না, এঁর কাছেই

তুমি লিখবে। লণ্ডনে গিয়ে ভদ্রলোকের সাথে দেখা করবে। আমি আগে থাকতেই বলে রাখবো।··· একটা কাজ করতে পারো, তুমি বরং আগে গিয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করবে। ও-ও লণ্ডনে থাকে। কবে নাগাদ লণ্ডনে আসতে পারবে বলো তো?'

জো তাকিয়ে আছে আমাদের দু'জনের দিকে। মুখ দেখে আন্দাজ করার উপায় নেই ওর মনের ভেতর কী চলছে; খুশি হচ্ছে না দুঃখ পাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমি জবাব দিলাম মিস্টার জ্যাগার্সের প্রশ্নের।

'আপনি বললে এখনই যেতে পারি।'

'আগে তোমাকে কিছু নতুন কাপড়চোপড় বানাতে হবে,' বললেন উকিল, 'সেজন্যে কয়েকটা দিন সময় লাগবে তাই না? টাকাও লাগবে। বিশ পাউণ্ড দিয়ে যাচ্ছি আমি। এ দিয়ে নতুন পোশাক তৈরি করিয়ে নাও। দিন সাতেকের মধ্যে হয়ে যাবে, কী বলো? তারপর চলে এসো লণ্ডনে।'

পকেট থেকে থলে বের ক'রে বিশটা গিনি গুনে গুনে আমার হাতে দিলেন মিস্টার জ্যাগার্স। তারপর তাকালেন জো-র দিকে।

'মিস্টার জোসেফ গারগেরি,' বললেন তিনি, 'আপনি যেন একটু অবাক হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?'

'সত্যিই তাই, মিস্টার জ্যাগার্স,' বললো জো।

'যদিও বলেছেন পিপকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে কিছু চান না, তবু আপনাকে কিছু টাকা আমি দিতে চাই। এটা আমার মক্কেলের নির্দেশ। পিপ চলে গেলে আপনার কাজের ক্ষতি হবে, তাই না?'

'আমি আগে যা বলেছি এখনও তা-ই বলছি, আমার কিছু চাই না,' বললো জো। সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রাখলো ও।

'আপনার মক্কেলকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। পিপ বড়লোক হবে, ভদ্রলোক হবে এতেই আমি খুশি। আমার ক্ষতি হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা টাকা দিয়ে পূরণ করার মতো নয়। ও যখন ছোট্ট বাচ্চা তখন আমার বাড়িতে এসেছে, আমার সামনে এত বড়টা হয়েছে। সেই ছোটবেলা থেকেই ও আমার বন্ধু। ও চলে গেলে আমার ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ক্ষতি টাকার নয়—' আর কিছু বলতে পারলো না জো, আবেগে বুঁজে এলো ওর গলা, ছল ছল ক'রে উঠলো চোখ।

জো সাধারণ গ্রাম্য কামার। তার শরীর বিশাল। সেই বিশাল শরীরের ভেতর মনটাও যে এত বিশাল আমার ধারণা ছিলো না। আমারও চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো।

মিস্টার জ্যাগার্স নীরবে শুনলেন জো-র কথা। সন্দেহ নেই আরো একবার ওকে তিনি রামগর্দভ ভাবলেন। জো-কে আত্মসংবরণ করার জন্যে কয়েকটা সেকেণ্ড দিলেন তিনি। তারপর বললেন:

'তাহলে, মিস্টার পিপ, তুমি ভদ্রলোক হতে যাচ্ছো। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি লণ্ডনে আসবে ততই মঙ্গল। আশাকরি এক সপ্তার মধ্যেই তুমি আসতে পারবে। একটা কোচ ধরে সোজা চলে আসবে আমার কাছে।' এরপর নিজের ঠিকানা দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

মিস্টার জ্যাগার্স বেরিয়ে যেতেই একটা কথা মনে পড়লো আমার। ছুটে গিয়ে ধরলাম তাঁকে।

'মিস্টার জ্যাগার্স,' বললাম আমি, 'এখানে এবং শহরে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের সাথে দেখা করতে পারবো তো যাওয়ার আগে?'

আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন তিনি, মনে হলো যেন

বোঝাতে চাইলেন, 'আচ্ছা বোকা তো ছেলেটা!' বললেন :

'নিশ্চয়ই পারবে। তোমার যা ইচ্ছা করতে পারবে।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম জো বসে আছে আগুনের সামনে। শান্ত মুখে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। আমি আস্তে গিয়ে বসলাম ওর পাশে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললাম না। আমার বোন বসে আছে তার চেয়ারে। বিডিও বসে আছে, হাতে তার সেলাই। সবাই চুপ।

'জো, বিডিকে বলেছো?' অবশেষে নীরবতা ভাঙলাম আমি।

'না,' বললো জো। এখনও আগুনের দিকে তাকিয়ে সে। 'তুমিই বলো।'

'তুমিই বলো, জো।'

'পিপ ধনী, ভদ্রলোক হতে চলেছে,' বললো জো, 'কামনা করি ও সুখী হোক।'

বিডির সেলাই থেমে গেছে। মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। জো-ও তাকালো। একে একে ওদের দু'জনেরই মুখ দেখলাম আমি। আন্তরিকভাবে আমাকে অভিনন্দন জানালো দু'জন, কিন্তু মুখ থেকে বিষণ্ণ ভাবটা কাটাতে পারলো না কেউ। বিডিকে আমি বললাম মিস্টার জ্যাগার্স যা যা বলে গেছেন সব। যিনি আমার এতবড় একটা উপকার করছেন তিনি অনির্দিষ্টকাল তাঁর নাম পরিচয় গোপন রাখতে চান শুনেও অবাক হলো। কিন্তু কিছু বললো না তা নিয়ে। শুধু বললো :

'আর সাত দিন। মাত্র সাতটা দিন তুমি এখানে আছো!'

আমার বোনকে এই 'সুসংবাদ' জানানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি

করলো না বিডি। কিন্তু সে কতটুকু বুঝলো সে-ই জানে। আমার ধারণা কিছুই বুঝলো না, যদিও ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো প্রসন্ন হাসিতে। 'পিপ' আর 'সৌভাগ্য' শব্দদুটো জড়িত স্বরে উচ্চারণ করলো কয়েকবার, সম্ভবত কী ঘটতে যাচ্ছে না বুঝেই সে উচ্চারণ করলো শব্দ দুটো।

জো-ও যেন বাক্যহারা হয়ে গেছে। আমাকে অভিনন্দন জানানোর পর আর একটা কথাও বলেনি সে। আর আমার প্রতিক্রিয়া মিশ্র এক দিকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অকৃত্রিম আনন্দে উদ্বেল হৃদয় অন্য দিকে স্বজন হারানোর ব্যথায় ভারাক্রান্ত বুক।

রাতে ঘুমোতে পারলাম না আমি। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম নিঝুম রাতের দিকে।

ভোরের আলো আমার মনের জড়তা ছাড়িয়ে দিলো। চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো ভবিষ্যতের সোনালি দিনগুলো—মিস হ্যাভিশ্যাম, এস্টেলা, লণ্ডন.

সকালে নাশতার পর জো আমার শিকানবিশীর চুক্তিপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে আগুনে ফেলে দিলো। আইনগত দিক থেকে আমি এখন মুক্ত।

জো-র সঙ্গে গির্জায় গেলাম আমি। ফিরেই খেয়ে নিলাম দুপুরের খাওয়া। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া হলো আজ। খাওয়ার পর হাঁটতে বেরুলাম একা একা। উত্তেজনায় টগবগ করছে ভেতরটা। আমার সামনে এখন স্বপ্ন, কেবল স্বপ্ন আর স্বপ্ন, আশা আর আশা, সম্ভাবনা আর সম্ভাবনা। হাঁটতে হাঁটতে

চলে গেলাম পুরনো কামানটার কাছে, যেখানে চুরি ক'রে খাবার আর রেতি নিয়ে গিয়েছিলাম আমার কয়েদীর জন্যে। ঘাসের ওপর বসে ছেড়ে দিলাম কল্পনার রাশ। কখন যে শুয়ে পড়লাম নিজেও জানি না। একটা কথাই মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, এই সৌভাগ্যের দ্বার আমার সামনে খুলে দিলেন কেন মিস হ্যাভিশ্যাম? এস্টেলার উপযুক্ত ক'রে তুলতে চান আমাকে? ভাবতে ভাবতে চোখ জড়িয়ে এলো। ঘুমিয়ে গেলাম আমি।

ঘুম ভেঙে দেখি জো বসে আছে সামনে। মুখে পাইপ। আমাকে চোখ মেলতে দেখে মৃদু হাসলো সে।

'শেষবারের মতো তোমার পেছন পেছন এলাম।'

উঠে বসলাম আমি। 'আমি খুব খুশি হয়েছি, জো, তুমি এসেছো।'

'ধন্যবাদ, পিপ।'

'একটা কথা নিশ্চিত জেনো, জো,' ওর হাত ধরে বললাম, 'আমি কোনোদিন ভুলবো না তোমাকে।'

'জানি। জানি, পিপ বাবু,' আগের মতোই হেসে বললো জো। 'তবু তোমার অভাব আমরা অনুভব করবো। অবশ্য আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম তো একটু খারাপ লাগবেই, তাই না?'

আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা আলাপ করতে করতে আমরা বাড়ি ফিরলাম। এক সাথে চা খেলাম। তারপর বিডিকে নিয়ে আমি আমাদের ছোট্ট বাগানটায় গেলাম। ওর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম:

'বিডি, আমি চলে যাওয়ার পর জো-কে তুমি একটু গড়ে পিটে

তুলো।'

'গড়েপিটে তুলবো মানে?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো বিডি।

'মানে—মানে জো এমনিতে চমৎকার মানুষ, সত্যিকথা বলতে কি ওর মতো ভালো মানুষ হয় না। কিন্তু লেখাপড়া, আদব কায়দা বিশেষ জানে না।'

'ও, আদবকায়দা। ওর এখনকার আদবকায়দায় তাহলে চলবে না তোমার?'

'বিডি, বিডি। তুমি বুঝতে পারছো না আমি কী বলতে চাইছি। এখানকার পরিবেশে ভালোই মানিয়ে যায় ওকে। কিন্তু—'

'কিন্তু?' বিডি বাঁকা একটা চাউনি হানলো আমার উদ্দেশ্যে।

'কিন্তু আমি যখন সম্পত্তি পাবো, শহরে বাস করবো এবং জো-কে নিয়ে যাবো আমার কাছে তখন শহরের মানুষরা ওর প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তুমি কি ভাবো জো তা জানে না?'

প্রশ্নটা এমন খোঁচামারা। আমার সারা শরীর জ্বলে উঠলো রাগে। 'কী বলতে চাইছো তুমি, বিডি?'

'তোমার কি কখনও মনে হয়নি জো-র মতো ভালো মানুষেরও একটু অহঙ্কার থাকতে পারে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো বিডি।

'অহঙ্কার!'

'হ্যাঁ, অহঙ্কার। তুমি চাইলেই ও তোমার আশ্রয়ে চলে যাবে ভাবছো কেন? এখানে ও নিজের বাড়িতে, স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানকার সবাই ওকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। এসব ছেড়ে কেন ও যাবে অজানা অচেনা এক পরিবেশে? অবশ্য এটা নিছক আমার ধারণা, জো-কে তুমি আমার চাইতে ভালো

চেনো, ও কী করবে না করবে তা তুমি জানবেও ভালো।'

'বিডি, তুমি এমনভাবে কথা বলছো, সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার মনে হচ্ছে আমার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে তুমি ঠিক মেনে নিতে পারছো না।'

'তোমার যদি তাই মনে হয়, মনে করো, যতখুশি তুমি মনে করো। আমার কিছু বলার নেই।'

আমি আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারলাম না, চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'জো-র ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। সোজা কথার এমন বাঁকা অর্থ করতে পারো তুমি আমার জানা ছিলো না!' বলে আমি হন হন ক'রে বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম যেদিকে চোখ যায়।

এরাতেও আমার ঘুম হলো না।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালেও আমার বিষণ্ণতা কাটলো না। কিন্তু হাতে সময় আছে মাত্র কয়েকটা দিন, মন খারাপ ক'রে বসে থাকার উপায় নেই। আমার সেরা পোশাকটা গায়ে চাপিয়ে শহরে চললাম নতুন কাপড়চোপড় বানাতে দেয়ার জন্যে।

এতদিন সস্তা কাপড় বানিয়েছি। আজ দামী কাপড় তৈরি করতে দেয়ায় দরজি বেশ খাতির করলো। টাকার এমনই মহিমা। কাপড় বানাতে দিয়ে গেলাম জুতার দোকানে, তারপর হ্যাটের দোকানে, তারপর অন্যান্য দোকানে। কেনাকাটা সব শেষ ক'রে গেলাম আঙ্কল প্যামব্লচুকের বাসায়।

যিনি এতদিন আমার প্রতিটা কাজে দোষ, প্রতিটা আচরণে খুঁত ছাড়া কিছু দেখতে পাননি আজ তাঁর কাছেই সে কী সমাদর

আমার। রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। এমন ভাব করলেন মিস্টার প্যুমব্‌লচুক, যেন আমার চেয়ে প্রিয়জন তাঁর আর নেই। এরও কারণ যে আমার টাকা বা সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা তা বুঝতে বাকি রইলো না। খবরটা তাঁর কানেও পৌঁছেছে।

মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার চলে গেল দেখতে দেখতে। শনিবার দিন আমার রওনা হওয়ার কথা। শুক্রবার সকালে নতুন পোশাক পরে আমি গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করতে। সারাহ পকেট এলেন ফটক খুলতে। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা যা হলো সে দেখার মতো।

'তুমি!' বললেন তিনি। 'তুমি? ও ঈশ্বর! কী চাও?'

'মিস পকেট,' বললাম আমি, 'শিগগিরই আমি লণ্ডন চলে যাচ্ছি। মিস হ্যাভিশ্যামের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।'

মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে নিয়ে গেলেন আমাকে সারাহ। মিস হ্যাভিশ্যাম তখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন ঘরের ভেতর। আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যাচ্ছিলেন মিস পকেট।

'যেও না, সারাহ', বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'তারপর, পিপ?'

'আমি লণ্ডন চলে যাচ্ছি, মিস হ্যাভিশ্যাম,' আমি বললাম। 'কালই রওনা হবো। ভাবলাম যাওয়ার আগে আপনার সাথে দেখা ক'রে যাই।'

'ভালো, ভালো, খুব খুশি হয়েছি আমি, পিপ।'

'আপনার সাথে গতবার দেখা ক'রে যাওয়ার পরপরই আমার ভাগ্য এমন প্রসন্ন হয়ে উঠেছে! আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, মিস হ্যাভিশ্যাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'মিস্টার জ্যাগার্স আমাকে সব

বলেছেন। তাহলে, পিপ, তুমি কালই রওনা হচ্ছো?'

'হ্যাঁ, মিস হ্যাভিশ্যাম।'

'খুব ধনী কেউ তোমাকে সম্পত্তি দিতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'নাম পরিচয় গোপন রেখেছেন ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'মিস্টার জ্যাগার্স আপাতত তোমার অভিভাবক হিশেবে দায়িত্ব পালন করবেন?'

'হ্যাঁ।'

এই প্রশ্নগুলো যে তিনি সারাহর মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্যে করলেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না।

'বেশ,' বলে চললেন তিনি, 'সামনের দিনগুলো বেশ সুখেই কাটবে তোমার, আশা করি। ভালো হয়ে চোলো। মিস্টার জ্যাগার্স যা বলেন শুনো সবসময়। খারাপ কিছু কোরো না কখনো। তোমার নামের মর্যাদা তোমাকে রাখতে হবে। কেউ যেন খারাপ কিছু কখনো বলতে না পারে তোমার বিরুদ্ধে। এবার তাহলে এসো, পিপ।'

'জি, মিস হ্যাভিশ্যাম।'

'বিদায়, পিপ।'

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাঁটুগেড়ে বসে আমি হাতটায় চুমু খেলাম। তারপর উঠে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সারাহ পকেট আমাকে নিয়ে গেলেন ফটকের কাছে। নিঃশব্দে ফটক খুলে দিলেন।

'আসি, মিস পকেট,' আমি বললাম।

জবাবে কিছু বলা দূরে থাক আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত

ভোর পাঁচটায় আমার রওনা হওয়ার কথা। জো-কে বলেছি, আমি একাই যাবো, আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে ওকে খামোকা কষ্ট করতে হবে না। আসল কারণটা হচ্ছে, আমি চাই না কোচ স্টেশন পর্যন্ত জো আমার সাথে যাক, কোচের অন্য যাত্রীরা সাধারণ এক কামারের সাথে আমাকে দেখুক তা আমি চাই না। কিন্তু আমি এমন ভাব দেখালাম যে, এটা আসলে কারণ নয়, সত্যিই আমি জো-কে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

বাড়িতে শেষ রাতটাও খুব কষ্টে কাটলো আমার—আপনজনদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট তো আছেই তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জো-র সঙ্গে ছলনার আশ্রয় নেয়ার কষ্ট। জানি, জো-কে কোচ স্টেশন পর্যন্ত সাথে যেতে বলা উচিত ছিলো আমার; কিন্তু তা তো বলিইনি, বরং মানা করেছি যেতে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বিডি নাশতা তৈরি ক'রে দিলো। হাতে বেশি সময় না থাকায় আয়োজন সামান্যই হলো। এই সামান্য জিনিসও আমি খেতে পারলাম না। কোনোমতে একটু মুখে দিয়ে উঠে পড়লাম। মনে বিষণ্ণতা থাকলে খাওয়া যায় না।

'এবার তাহলে যেতে হয়!' বলে আমি আমার বোনকে চুমু খেলাম। ও হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালো আমার দিকে তাকিয়ে। বিডিকে চুমু খেলাম। তারপর জড়িয়ে ধরলাম জো-কে। অনেকক্ষণ আমরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে রইলাম। বিডির তাড়া খেয়ে অবশেষে আলাদা হলাম। আমার ছোট পোর্টম্যান্টোটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। ওরা দাঁড়িয়ে রইলো দরজায়।

কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। জো চিৎকার ক'রে বললো, 'ভালো থেকো!'

বিডি দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে। নিশ্চয়ই কাঁদছে।

দ্রুত হেঁটে গ্রামের সীমানায় পৌঁছুলাম। গ্রামের নাম ফলক-টার সামনে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করলাম ওটা। বিড় বিড় ক'রে উচ্চারণ করলাম:

'বিদায়! বিদায়, প্রিয় বন্ধু!'

# বার

লণ্ডনে কোচ স্টেশনের কাছেই মিস্টার জ্যাগার্সের অফিস। খুঁজে পেতে বেশি দেরি হলো না। ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম, মিস্টার জ্যাগার্স আছেন কিনা।

'না,' জবাব দিলো এক কেরানী। 'আদালতে গেছেন। আমি কি মিস্টার পিপের সাথে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'আচ্ছা! মিস্টার জ্যাগার্স বলে গেছেন আপনি আসলে যেন বসিয়ে রাখি। আপনি বসুন। আদালতে কাজ শেষ হলেই উনি

এসে পড়বেন।'

অপেক্ষা করতে করতে যখন বিরক্ত হয়ে উঠেছি তখন ফিরলেন মিস্টার জ্যাগার্স। আমার মতোই আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছিলো ঘরে। তাদের সঙ্গে আগে কথা—কারো সাথে নরম সুরে, কারো সাথে গরম সুরে—বললেন তিনি। তারপর মন দিলেন আমার দিকে। আমাকে নিয়ে নিজের একান্তকক্ষে ঢুকে একটা বাক্স থেকে স্যাণ্ডউইচ বের ক'রে খেতে শুরু করলেন। আমাকে সাধলেন না।

খেতে খেতে তিনি বলে চললেন : আমার জন্যে সব ব্যবস্থা তিনি ক'রে রেখেছেন। আপাতত আমাকে 'বার্নার্ড'স ইন'-এ তরুণ মিস্টার পকেট-এর কাছে যেতে হবে। তার সাথে সোমবার পর্যন্ত থাকবো আমি। তারপর সে-ই আমাকে নিয়ে যাবে তার বাবা অর্থাৎ আমার শিক্ষক মিস্টার পকেটের কাছে। আমার খরচপত্র সম্পর্কেও আলাপ করলেন মিস্টার জ্যাগার্স। প্রতি মাসে আমাকে যে অঙ্কের টাকা দেয়া হবে, তা মোটামুটি ভালো। একজন মানুষের সচ্ছল ভাবে চলে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

'কোনো রকম বাজে খরচ যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে তোমাকে,' বললেন তিনি। 'অসৎসংসর্গে মিশে বাজে খরচ যদি করো তার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আমার কাছে এসে তখন কোনো ফল পাবে না।' এর পর মিস্টার জ্যাগার্স তাঁর কেরানীকে ডাকলেন, 'ওয়েমিক! একে বার্নার্ড'স ইন-এ মিস্টার হারবার্ট পকেটের কাছে পৌঁছে দাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম বার্নার্ড'স ইন-এ। নাম শুনে মনে হয়েছিলো কোনো উঁচুদরের হোটেল হবে। এখন দেখছি

উঁচুদরের তো দূরের কথা নিচু দরের বলাও মুশকিল। তার চেয়েও খারাপ হোটেল বার্নার্ড'স ইন। জরাজীর্ণ একটা বাড়ি। পলস্তারা খসে খসে পড়ছে। কত বছর যে সংস্কার হয় না তার ঠিক নেই।

নোংরা, ধুলোজমা সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম। সারি সারি ঘর। একটা ঘরের দরজায় রঙ দিয়ে সুন্দর ক'রে লেখা, 'মিস্টার পকেট জুনিয়ার'। দরজার পাশে চিঠির বাক্সে এক টুকরো কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা, 'শিগগিরই ফিরবো।'

'আপনি এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন বোধহয় ভাবেননি উনি,' ব্যাখ্যা করলেন মিস্টার ওয়েমিক। 'আমাকে তো আর দরকার নেই?'

'না, ধন্যবাদ,' আমি বললাম।

'টাকা পয়সা সব আমার হাত দিয়ে লেনদেন হয়,' বললেন মিস্টার ওয়েমিক, 'আশাকরি মাঝে মধ্যেই আমাদের দেখা হবে। আসি এখন তাহলে।'

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি হারবার্ট পকেটের দরজার সামনে। আধঘণ্টা পর এলো সে। দু'বগলের নিচে দুটো কাগজের ঠোঙা। হাঁপাচ্ছে। সম্ভবত দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কারণে। আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো:

'মিস্টার পিপ?'

'মিস্টার পকেট?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'ও হো! অত্যন্ত দুঃখিত, আমি দেরি ক'রে ফেলেছি,' বললো সে এত তাড়াতাড়ি তুমি এসে পড়বে ভাবিনি। অবশ্য তোমার জন্যেই বাইরে গিয়েছিলাম। মনে হলো খাওয়ার পর তোমার হয়তো স্ট্রবেরি খেতে ভালো লাগবে, তাই আনতে গেছিলাম।

বাজারে। দাঁড়াও, দরজা খুলি।'

'আমাকে একটা ঠোঙা দিতে পারো ইচ্ছে করলে,' আমি বললাম।

খুশি হয়েই দিলো মিস্টার পকেট জুনিয়ার। তারপর পকেট থেকে চাবি বের ক'রে তালা খুললো দরজার।

'এসো,' বললো সে। ঘরে ঢুকলাম আমরা। এবার একটু কৈফিয়তের সুরে সে বললো, 'আমার সব জিনিসপত্র নেহায়েত শাদাসিধা ধরনের, আশা করি এর ভেতর কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পারবে সোমবার পর্যন্ত। বুঝলে, বাবার কাছ থেকে আমি কোনো টাকাপয়সা নেই না, নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হয়। আমার বাবা খুব বড়লোক নন। অবশ্য বড়লোক হলেও আমি তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতাম না।···এই হলো আমার বসার ঘর। টেবিল চেয়ারগুলো বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি।···এই হলো তোমার শোয়ার ঘর, ওপাশেরটা আমার। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, কেউ বিশেষ বিরক্ত করে না।···ও ঈশ্বর! এতক্ষণ তুমি ঠোঙাটা ধরে আছো!'

ব্যস্ত ভঙ্গিতে আমার হাত থেকে ঠোঙাটা নিতে এগিয়ে এলো সে। চোখাচোখি হলো আমাদের। অমনি মিস্টার পকেট জুনিয়ারের চিৎকার:

'আরে! তুমি না সেই ছেলেটা! মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ির জানালায় উঁকি ঝুঁকি মারছিলে!'

'আর তুমি সেই ফ্যাকাসে ছেলেটা?' আমি বললাম। 'তোমার সাথে মারামারি করেছিলাম আমি!'

একজন আরেকজনকে চিনতে পেরে আমরা হেসে উঠলাম হো-হো ক'রে।

'আশাকরি সেদিনের সেই মারামারির কথা তুমি মনে রাখোনি,' মিস্টার পকেট জুনিয়ার বললো। 'সেদিন তোমাকে প্রথমেই ঘুসি মেরে বসাটা আমার অন্যায় হয়েছিলো।'

প্রথম ঘুসিটা ও মারেনি মেরেছিলাম আমি। কিন্তু তা ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম না। বললাম:

'ও সব পুরনো কথা তুলছো কেন খামোকা?' এখন আমরা দু'জন বন্ধু, এটাই শুধু মনে রাখবো।' বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

উষ্ণভাবে করমর্দন করলাম দু'জন।

'তখনও তোমার ভাগ্য খোলেনি, তাই সাহস পেয়েছিলাম মারার।' বললো হারবার্ট। 'এখন তো তুমি ভাগ্যবান, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'যখন মারামারি করি তখন আমিও সৌভাগ্যের আশায় দিন গুনছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে ডেকেছিলো ওবাড়িতে। আমাকে পছন্দ হয় কিনা দেখতে চেয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, পছন্দ হয়নি তার। সেদিন যদি বুড়ি আমাকে পছন্দ করতো এস্টেলাকে হয়তো বিয়ে করতে পারতাম।'

'তুমি দুঃখ পাওনি?'

'খুব একটা না। ওকে খুশি করা বড় শক্ত কাজ।'

'মিস হ্যাভিশ্যামের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, ওকে তো বটেই এস্টেলাকেও। ভীষণ বিশ্রী স্বভাব, অহঙ্কারী—অন্তত তখন ছিলো। পুরুষজাতের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার একটা অস্ত্র হিশেবে ওকে গড়ে তুলেছিলো মিস হ্যাভিশ্যাম।'

'মিস হ্যাভিশ্যামের কে হয় ও?'

'কেউ না। পালছে আর কি। তবে মিস হ্যাভিশ্যাম ওকে নিজের মেয়ের মতোই দেখে।'

'কেন উনি পুরুষ জাতের ওপর এত খ্যাপা?'

'তুমি জানো না, মিস্টার পিপ? কিছুই শোনোনি?'

'না।'

'আ-হা! সে এক লম্বা কাহিনী। খাওয়ার পর বলবো। এখন আমার একটা কৌতূহল মেটাও তো, সেদিন তুমি ও বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?'

বললাম আমি। মন দিয়ে শুনলো হারবার্ট। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার জ্যাগার্স এখন তোমার অভিভাবক?'

'হ্যাঁ।'

'জানো তো উনি মিস হ্যাভিশ্যামের পরামর্শদাতা? আইন বিষয়ে তো বটেই অন্য সব ব্যাপারেও মিস হ্যাভিশ্যামকে উনি পরামর্শ দেন। বুড়ি ওঁকে যতটা বিশ্বাস করে ততটা আর কাউকে করে না। উনিই আমার বাবাকে তোমার শিক্ষক হতে অনুরোধ করেছেন। আগে থেকে চেনেন উনি বাবাকে। মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বাবার—জ্ঞাতি ভাই আর কি। কিন্তু দু'জনের সম্পর্ক ভালো না। বাবা কাউকে তোষামোদ ক'রে চলতে পারে না। কিন্তু তোষামোদ না করলে মিস হ্যাভিশ্যামের ওখানে পাত্তা পাওয়া যায় না।'

মিস্টার পকেট জুনিয়ারের এতকথা শোনার পর আমার মনে হলো এবার আমারও কিছু বলা উচিত নিজের সম্পর্কে। আমার সংক্ষিপ্ত কাহিনী—শোনালাম ওকে। আরো বললাম, আমি গ্রামের ছেলে, মানুষ হয়েছি কামারের বাড়িতে, শহরের রীতিনীতি আদব-কায়দা বিশেষ জানি না, কোনো ভুল ত্রুটি যদি করি ও যেন শুধরে দেয়।

'নিশ্চয়ই দেবো,' বললো সে। 'যদিও আমার ধারণা তার খুব একটা প্রয়োজন পড়বে না, তুমি নিজেই সব শিখে নেবে। আরেক-টা কথা, আমাদের প্রায়ই দেখা হবে, তাই আমার মনে হয় আমা-দের মাঝে কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতার বাধা না থাকলেই ভালো। তুমি এখন থেকেই আমাকে আমার খ্রিষ্টান নাম হারবার্ট বলে ডাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ, হারবার্ট,' আমি বললাম, 'তুমিও যদি তাই করো আমি খুশি হবো। আমার খ্রিষ্টান নাম ফিলিপ।'

'না, ওসব ফিলিপ-টিলিপ চলবে না, কেমন গম্ভীর গম্ভীর শোনায়। আমি তোমাকে হ্যানডেল বলে ডাকবো। রাজি?'

'রাজি।'

'বেশ, তাহলে তুমি হ্যানডেল, আমি হারবার্ট। এবার চলো খেয়ে নেয়া যাক।'

খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে আমি হারবার্টকে বললাম, 'মনে আছে তো, তুমি বলেছিলে মিস হ্যাভিশ্যামের কাহিনী শোনাবে খাওয়ার সময়?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বললো হারবার্ট। 'তাহলে শুরু করি: মিস

হ্যাভিশ্যাম যখন খুব ছোট তখনই তার মা মারা যায়। মা মরা মেয়ের কোনো আব্দারই তার বাবা অপূর্ণ রাখতেন না। ফল যা হওয়ার তা-ই হলো—অল্প বয়েসেই বখে গেল মেয়েটা। মিস্টার হ্যাভিশ্যামের মদ তৈরির কারখানা ছিলো। প্রচুর আয় হতো তা থেকে। টাকার গরমে তাঁর মাটিতে পা পড়তো না। মিস হ্যাভিশ্যামও বাপের মতো অহঙ্কারী হয়ে উঠলো।'

'মিস হ্যাভিশ্যাম কি ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, একটা ছেলেও ছিলো তাঁর। ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন—অবশ্যই গোপনে। মিস হ্যাভিশ্যাম এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না। অবশেষে একদিন একমাত্র ছেলেকে রেখে এই দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা গেল। এবার মিস্টার হ্যাভিশ্যাম মেয়েকে খুলে বললেন তার সৎমায়ের কথা, সৎভাইয়ের কথা। এবং বাড়িতে নিয়ে এলেন ছেলেকে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা হয়ে উঠলো বদের ধাড়ি দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র, উচ্ছৃঙ্খল। শেষ পর্যন্ত তাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিতে বাধ্য হলেন মিস্টার হ্যাভিশ্যাম এবং ঘোষণা করলেন, ছেলেকে সম্পত্তির এক কানাকড়িও দেবেন না। অবশ্য মৃত্যুর আগে মিস্টার হ্যাভিশ্যামের মন একটু নরম হয়, ছেলেকে সম্পত্তির মোটামুটি একটা অংশ দিয়ে যান, যদিও মিস হ্যাভিশ্যামের ভাগে যা পড়ে তার তুলনায় সেটা কিছুই না।

'ভাই অল্প ক'দিনেই সব টাকা উড়িয়ে দিলো। মানুষের কাছ থেকে ধার দেনা ক'রে কোনো মতে দিন চলতে লাগলো তার। আগে থেকেই মিস হ্যাভিশ্যামকে সে ঈর্ষা করতো বাপ তাকে বেশি

সম্পত্তি দিয়ে গেছে বলে। এখন কপর্দকহীন হয়ে এই ঈর্ষা আরো বেড়ে গেল। এবার আসছি কাহিনীর সবচেয়ে মর্মান্তিক অংশে।

'বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই দেখা যেতে লাগলো মিস হ্যাভিশ্যাম যেখানেই যায়—ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা বল নাচের আসরে বা যেখানে খুশি—একটা লোক তার আশপাশে ঘুর ঘুর করে, তার কাছে প্রেম নিবেদন করে, প্রমাণ করতে চায় সে তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। লোকটার চেহারা ছবি ভালো ছিলো, আচার আচরণে চৌকষ। কিছুদিন যেতে না যেতেই মিস হ্যাভিশ্যাম তার প্রেমে পড়লো। লোকটা এমন ভাব দেখাতে লাগলো যে মিস হ্যাভিশ্যামকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু লোকটা আসলে মোটেই ভালো ছিলো না। মিস হ্যাভিশ্যাম প্রেমে পড়েছে টের পাওয়ার পর থেকেই সে তার কাছ থেকে টাকা নিতে লাগলো। মিস হ্যাভিশ্যামও তখন এমন মজা মজেছে যে লোকটা যা চায় তা-ই দেয়। এসব দেখে শুনে আমার বাবার বুঝতে বাকি ছিলো না লোকটার স্বভাব চরিত্র। মিস হ্যাভিশ্যামকে তিনি সতর্ক ক'রে দেন। বলেন লোকটাকে যেন অত লাই না দেয়। কিন্তু মিস হ্যাভিশ্যাম শোনেনি বাবার কথা। উল্টো বাবার সাথেই নাকি একদিন ঝগড়া করে তার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন বলে। এই প্রেমিকের পরামর্শেই মিস হ্যাভিশ্যাম অনেক বেশি টাকা দিয়ে পৈতৃক মদের কারখানায় তার ভাইয়ের অংশ কিনে নেয়। এসময়ও বাবা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। মিস হ্যাভিশ্যাম বাবার সদুপদেশের কদর্থ তো করলোই, সবার সামনে বাবাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিতেও পিছ পা হয়নি। সেই থেকে বাবা

আর ওবাড়ির ছায়াও মাড়ান না।

'ঐ লোকের সাথেই শেষ পর্যন্ত মিস হ্যাভিশ্যামের বিয়ের কথা পাকাপাকি হলো। দিন ক্ষণও ঠিক হলো। বিয়ের পোশাক-আশাক কেনা হলো। অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হলো। কিন্তু বিয়ের দিন বর এলো না। এলো তার একখানা চিঠি—।'

'মিস হ্যাভিশ্যাম তখন বিয়ের পোশাক পরছিলেন,' আমি বললাম। 'ঘড়িতে তখন ঠিক ন'টা বাজতে বিশমিনিট তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো হারবার্ট। 'পরে তার আদেশে বাড়ির সবকটা ঘড়ি বন্ধ ক'রে দেয়া হয় ন'টা বাজতে বিশ মিনিট বাজিয়ে। লোকটা যে কেন শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো না জানি না। বিয়ে করলে তো সে সব সম্পত্তির মালিক হতো। হয়তো লোকটা বিবাহিতই ছিলো, শুধু টাকার জন্যে মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে প্রেমের অভিনয় ক'রে গেছে। এমনও হতে পারে তাকে জব্দ করার জন্যে তার ভাইই লোকটাকে নিয়োগ করেছিলো। যাহোক, কারণ যা-ই হোক বিয়েটা না হওয়ায় মিস হ্যাভিশ্যাম একেবারে ভেঙে পড়লো। বাড়িঘরের যত্ন নেয়া বন্ধ ক'রে দিলো, বাগানের যত্ন নেয়াও বন্ধ হলো। ঘরে ঘরে ধুলো জমতে লাগলো, মাকড়শা জাল বুনে চললো। এখন বাড়ির কী অবস্থা তুমি তো নিজেই দেখেছো।'

'এখন কোথায় মিস হ্যাভিশ্যামের সেই ভাই আর প্রেমিক প্রবর?'

'জানি না। তবে শুনেছি তাদের কপালে সুখ তো জোটেইনি, জুটেছিলো আরো বেশি লজ্জা, আরো বেশি দুর্ভোগ।'

'এখনও বেঁচে আছে তারা ?'

'তা-ও জানি না।'

'আচ্ছা, তুমি বলেছিলে এস্টেলাকে পোষ্য নিয়েছেন মিস হ্যাভিশ্যাম ; কবে ?'

'সে-ও জানি না। যখন থেকে মিস হ্যাভিশ্যামের কথা শুনে আসছি তখন থেকে এস্টেলার কথাও শুনে আসছি। এর পর আমি যা জানি তুমিও তা জানো।'

মিস হ্যাভিশ্যাম প্রসঙ্গের ইতি হলো। হারবার্ট আর আমি নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে চললাম। ইতিমধ্যে আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে। বসবার ঘরে বসে আলাপ করছি আমরা। এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'আচ্ছা, হারবার্ট, তুমি কী করো ?'

'পুঁজিপতি বলতে পারো,' হেসে জবাব দিলো সে। 'জাহাজের বীমা।'

কিন্তু ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে আমি জাহাজ ব্যবসা বা পুঁজির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

'এখনও অবশ্য কাজ শুরু করিনি আমি,' ব্যাখ্যা দিলো হারবার্ট। 'শহরে একটা আফিসে যাচ্ছি কিছুদিন ধরে। কিন্তু এখনও কোনো কাজ পাইনি। কাজ শিখছি বলতে পারো। শেখা হয়ে গেলে যখন কাজ পাবো তখন দেখো কী রকম টাকা আসতে থাকে। শুধু জাহাজের বীমা করেই আমি চুপ ক'রে থাকবো ভেবো না, জীবন বীমায়ও টাকা খাটাবো। তারপর অন্যান্য ব্যবসায়।...'

ভবিষ্যতের রঙিন পরিকল্পনার কথা সহজভাবে বলে যেতে লাগলো হারবার্ট। আমি শুনতে লাগলাম। বেশ আশাবাদী মনে

হলো ছেলেটাকে। ভবিষ্যতের কল্পনায় সে বর্তমানের দারিদ্র্য হাসিমুখে সয়ে যাচ্ছে।

বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত এরাস্তা সেরাস্তা ঘুরে গেলাম থিয়েটার দেখতে। পরদিন রোববার সকালে গেলাম ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে। বিকেলে পার্কে। এর ভেতরেই আমার মনে হতে শুরু করেছে জো-কে, বিডিকে কতদিন হয়ে গেল ছেড়ে এসেছি।

সোমবার সকালে হারবার্ট ওর অফিসে গেল। ফিরলো দুপুরে। আমি পোর্টম্যাণ্টো গুছিয়ে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ও আসতেই এক সরাইখানায় খেয়ে নিয়ে কোচ ভাড়া ক'রে রওনা হলাম হ্যামারস্মিথের পথে। জায়গাটা লণ্ডনের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। ওখানেই হারবার্টের বাবা মিস্টার ম্যাথ্যু পকেটের বাড়ি। ও বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে এখন থেকে।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছুলাম ওখানে। মিস্টার পকেট তখন বাড়িতে নেই। হারবার্ট ওর মা-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো আমার। বেশ একটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার সম্ভাষণের জবাব দিলেন তিনি। ভদ্রমহিলাকে মোটেই ভালো লাগলো না আমার। সারা বাড়িতে কেমন একটা অগোছালো ভাব। হারবার্ট ছাড়া তার আরো সাতটা ছেলেমেয়ে আছে। সবচেয়ে ছোটটার বয়েস দু'বছর হবে খুব বেশি হলে। এই বাচ্চাটি থেকে শুরু ক'রে সবগুলো ছেলেমেয়ে—এমন কি পুরো সংসারের ভার পর্যন্ত দুই কাজের মহিলার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা তুলে কাটান তিনি। পরে জেনেছি ভীষণ খরচ করার অভ্যাস মহিলার অথচ স্বামী বেচারা অত টাকা দিতে পারেন না তাঁকে। তাই প্রায়

সব সময় দু'জনের খিটিমিটি লেগেই থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন মিস্টার ম্যাথ্যু পকেট। বয়েস খুব বেশি নয়, তবু এরই মধ্যে মাথার চুল বেশিরভাগ শাদা হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে আমার হারবার্টের মতোই প্রাণখোলা মনে হলো। পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতেই বললেন :

'তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, আশাকরি তুমিও হতাশ হওনি আমাকে দেখে। সত্যি কথা বলতে কি আমি মোটেই ভয় পাওয়ার মতো লোক নই।'

হ্যারো এবং কেমব্রিজে তিনি লেখাপড়া করেছেন। কৃতী ছাত্র হিশেবে বেশ নাম ছিলো ছাত্রজীবনে। আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। মোটামুটি সাজানো গোছানো ঘর। দেখে অখুশি হলাম না। আরো দুটি ছাত্র আছে তাঁর। আমার ঘরের পাশেই দুটো ঘরে থাকে তারা। দু'জনকে ডেকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার পকেট। একজনের নাম বেন্টলি ড্রাম্‌ল, বদমেজাজী, চেহারা তত ভালো নয়; অন্যজন স্টারটপ, নম্র, ভদ্র এবং বিনয়ী। রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে দেখলাম খাবার দাবারের ব্যবস্থাও তত খারাপ নয়। আশা হলো দিনগুলো এখানে ভালোই কাটবে।

দু'দিন কেটে গেল ভালোই। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে পরিচিত হলাম, গৃহকর্ত্রীকে আরো ভালো ক'রে চিনলাম, দুই কাজের মহিলার চালচলন, হাবভাব সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান লাভ করলাম। স্টারটপের সাথেও ঘনিষ্ঠতা হলো। ড্রাম্‌লের সাথে ঘনিষ্ঠতা হলো না তবে একটু জানাশোনা হলো। ছেলেটা এমন বদমেজাজী আর

মাঝামোটা, ওর সাথে কারো ঘনিষ্ঠতা হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এই'দিনে রোজ একবার ক'রে লণ্ডনে গিয়ে হারবার্টের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছি, মিস্টার পকেটের নির্দেশ মতো কিনে এনেছি আমার লেখাপড়ার সরঞ্জাম—বইপত্র, খাতা-কলম ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয়দিন মিস্টার পকেটের সাথে দীর্ঘ আলাপ হলো কী পদ্ধতিতে কী কী বিষয়ে আমি পড়াশোনা করবো, কীভাবে চলবো ইত্যাদি নিয়ে। মিস্টার জ্যাগার্স তাঁকে জানিয়েছেন, বেঁচে থাকার জন্যে আমাকে কোনো কাজ করতে হবে না, অর্থাৎ কোনো ধরনের পেশাগত বিদ্যা আমাকে শিখতে হবে না। একজন ভদ্রলোক যে ধরনের লেখাপড়া শেখে তা-ই আমাকে শিখতে হবে আর শিখতে হবে ভদ্রলোকের আচার আচরণ, ভদ্রলোকের সাথে মেলামেশা করার নিয়মকানুন। মিস্টার পকেট জানাতে ভুললেন না, ব্যাপারটাকে আমি যেন মোটেই সহজ মনে না করি আর হালকা ভাবে না নেই। ভদ্রলোকের আচার আচরণ রপ্ত করার পাশাপাশি আমাকে শিখতে হবে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং আরো অনেক কিছু। এসব বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যে আমাকে লণ্ডনের কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দিলেন মিস্টার পকেট। বাকিটা তিনি বাড়িতে দেখবেন, পরামর্শ দেবেন, সাহায্য করবেন।

শিখতেই আমি চাই। সুতরাং কঠিন পরিশ্রমের কথা শুনে ঘাবড়ালাম না বরং খুশি হলাম। এই সব ব্যাপারগুলো ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর আমি মিস্টার পকেটকে বললাম :

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি লণ্ডনে বার্নার্ড'স ইন-এ একটা ঘর রাখতে চাই। অবসর সময়গুলো ওখানে হারবার্টের

সাথে কাটাতে পারবো।'

শুধু অবসর কাটানো নয়, আমার এই ইচ্ছার পেছনে আরো একটা কারণ আছে। আমি একটা ঘর নিলে হারবার্টের কিছুটা হলেও সাশ্রয় হবে খরচের দিক দিয়ে।

'আমার আপত্তির কী আছে?' বললেন মিস্টার পকেট। 'তবে তোমার অভিভাবক মিস্টার জ্যাগার্সের মত নেয়া দরকার, আমি মনে করি।'

মিস্টার জ্যাগার্সের মত পেতেও অসুবিধা হলো না।

'কিছু আসবাবপত্র আর কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিলেই স্বচ্ছন্দে আমি মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারবো হারবার্টের ওখানে,' বললাম আমি। 'ঘরের ভাড়া দু'জন ভাগাভাগি ক'রে দেবো।'

'ভালো কথা,' বললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কত লাগবে তোমার ওসব জিনিসপত্র কিনতে?'

আমি বললাম আমার কোনো ধারণা নেই।

'পঞ্চাশ পাউণ্ড?'

'না, না, অত নিশ্চয়ই লাগবে না,' ব্যস্ত হয়ে আমি বললাম।

'তাহলে কত, পাঁচ পাউণ্ড?'

'একটু বেশি কম হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।'

হাসলেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'তাহলে কত? দশ পাউণ্ড? বিশ পাউণ্ড?'

'বিশ পাউণ্ডে বোধহয় চলবে।'

'ওয়েমিক!' ডাকলেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'মিস্টার পিপকে কুড়ি পাউণ্ড দিয়ে একটা রসিদ রেখে দাও।'

মিস্টার ওয়েমিকের সামনে গিয়ে বসলাম আমি। মিস্টার জ্যাগার্স যেমন গম্ভীর, স্বল্পভাষী তাঁর এই কেরানীটি ঠিক তার উল্টো। গল্প পেলে আর কিছু চান না। টাকাটা নেয়ার পর আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো :

'অদ্ভুত লোক এই মিস্টার জ্যাগার্স!'

অমনি কথাটা লুফে নিলেন ওয়েমিক। 'ওঁর সামনে বোলো, উনি এটাকে প্রশংসা হিশেবেই নেবেন।'

'মানে!' আমি অবাক হয়ে বললাম।

'মানে? ওঁর পেশাগত দিকের কথা বলছি। যেন ফাঁদ পেতে বসে আছেন। মানুষরা আসছে আর খপ ক'রে ধরা পড়ছে।'

'মানে!' আবার আমি বললাম।

'মানে? উকিল হিশেবে এমন দক্ষ, শহরের যে কোনো মানুষ আইনগত কোনো সমস্যায় পড়লেই ভাবে জ্যাগার্স ছাড়া উপায় নেই। ছুটে আসে তারা আমার মনিবের কাছে। আর উনি বুঝে শুনে মালদার লোকটিকে নেন মক্কেল হিশেবে। আমরা চার চারজন কেরানী তাঁর নথিপত্র ঠিকঠাক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।...'

এমনি ধরনের কথা একের পর এক বলে যেতে লাগলেন মিস্টার ওয়েমিক। আমার বুঝতে বেশ অসুবিধাই হলো, ভদ্রলোক মালিকের নিন্দা করছেন না প্রশংসা করছেন। আমার মতো শ্রোতা পেয়ে খুশি মনে হলো তাঁকে। উকিল মিস্টার জ্যাগার্স সম্পর্কে সব কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর বললেন :

'একদিন এসো না আমার বাড়িতে, প্রাণ খুলে আলাপ করা যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবো,' আমি বললাম।

'এসো। সত্যিই খুশি হবো।'

মিস্টার ওয়েমিককে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম মিস্টার জ্যাগার্সের অফিস থেকে।

## তের

বেন্টলি ড্রামল বদমেজাজী, মাথামোটা আগেই বলেছি। আরো কিছু বদগুণ আছে তার। একগুঁয়ে, অলস, কৃপণ এবং সন্দেহপ্রবণ। লেখাপড়া শুরু করেছে বেশি বয়েসে। তবে অভিজাত ঘরের ছেলে। ভবিষ্যতে খেতাব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই মিসেস পকেট ওকে খুব পছন্দ করেন। আর স্টারটপ মায়ের আদুরে ছেলে। মায়ের আদরে ও বখে যেতে যেতে কোনোমতে বেঁচে গেছে। চেহারা স্বভাব মেয়েলী। তবে লেখাপড়ায় ভালো। দু'জনের মধ্যে ওকেই আমার বেশি পছন্দ।

তবে আমার সত্যিকারের বন্ধু হারবার্ট। একমাত্র ওর সাথেই আমি প্রাণ খুলে কথা বলি। মাঝে মাঝে মিস্টার এবং মিসেস ক্যামিলা আর জর্জিয়ানা মিসেস পকেটের সাথে দেখা করতে

আসেন। ক্যামিলা মিস্টার পকেটের আপন বোন আর জর্জিয়ানা খালাতো। মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে প্রথম দেখা হওয়ার দিন যেমন নির্লিপ্ত দেখেছি এখনও তাঁরা তেমনই নির্লিপ্ত আচরণ করেন আমার সাথে।

এই পরিবেশেই আমার দিন কাটছে। ইতিমধ্যে আমার খরচের হাত বেড়েছে অনেক। দিন দিন আরো বাড়ছে। প্রচুর বাজে খরচ করি। পুরনো জীবনের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। তবে একটা ব্যাপারে এখনো ঠিক আছি, পড়াশোনায় কখনো ফাঁকি দেই না।

বেশ ক'সপ্তাহ হয়ে গেল মিস্টার ওয়েমিকের সাথে দেখা হয় না। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সেই আমন্ত্রণও রক্ষা করা হয়নি।

অবশেষে একদিন তাঁকে চিঠি লিখে জানালাম, আমি যেতে চাই তাঁর বাসায়। কবে যেতে চাই তা-ও উল্লেখ করলাম চিঠিতে। মিস্টার ওয়েমিক জবাব দিলেন, আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে তিনি সত্যিই খুশি হবেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি যেন ঠিক ছ'টার সময় চলে যাই তাঁর অফিসে।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় পৌঁছুলাম আমি।

'ওয়ালওআর্থ পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে তো?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ওয়েমিক।

'নিশ্চয়ই পারবো।'

'তাহলে চলো। পাহুটো সারাদিন ডেস্কের নিচে অচল থাকে তো, দিনের শেষে একটু সচল করতে পারলে ভালোই লাগে

মিস্টার জ্যাগার্সের অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম

দু'জন। সারাপথ বকবক ক'রে গেলেন মিস্টার ওয়েমিক। প্রধানত তাঁর মনিব মিস্টার জ্যাগার্স সম্পর্কে। অবশেষে পৌঁছুলাম তাঁর বাড়িতে।

ছোট্ট বাড়িটা। কাঠের। প্রাচীন দুর্গ-প্রাসাদের আদলে তৈরি করা হয়েছে। বাড়ির ছাদের দিকটা এমনভাবে রঙ করা হয়েছে যে দেখলে মনে হয় সত্যিকারের দুর্গ-প্রাসাদ। বাড়ির চারপাশে বাগান। বাগান ঘিরে পরিখা—মোটে চারফুট চওড়া আর দু'ফুট গভীর, তবু পরিখা তো। একটা পুরু তক্তা ব্যবহার করা হয় ঝুল-সেতু হিশেবে। পরিখা পেরিয়ে তক্তাটা টেনে রাখতে রাখতে মিস্টার ওয়েমিক বললেন :

'এসে গেছি আমার দুর্গ-প্রাসাদে। স্বাগতম, মিস্টার পিপ। আমি নিজের হাতে বানিয়েছি। ভালো না দেখতে?'

আমি উচ্ছ্বাসতকণ্ঠে প্রশংসা করলাম বাড়িটার, যদিও ওটা সম্ভবত আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ছোট বাড়ি।

'ঐ যে দেখছো,' বললেন তিনি, 'ওটা সত্যিকারের পতাকা-দণ্ড। প্রত্যেক রবিবার আমি নিজ হাতে ওটায় পতাকা উত্তোলন করি। আর এই যে ঝুলসেতু, এটা তুলে নিলেই' (যদিও এইমাত্র তিনি যা করেছেন সেটা তুলে নেয়া নয় টেনে নেয়া) 'বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন আমার দুর্গ।'

এমন এক পরিতৃপ্তি আর অহঙ্কার নিয়ে ভদ্রলোক কথা বলছেন যে হাসি পেলেও আমি হাসতে পারলাম না।

'প্রতিদিন রাত ন'টায়, গ্রিনউইচ সময় অনুযায়ী, গর্জে ওঠে কামান। ঐ যে ওটা।'

মিস্টার ওয়েমিকের ইশারা অনুসরণ ক'রে তাকিয়ে সত্যিই

একটা কামান দেখতে পেলাম। তবে ওটা এত ছোট! কামানের চেহারার পিস্তল বলা যেতে পারে। ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্যে ওপরে ছোট একটা ছাতার মতো ত্রিপলের ছাউনি দেয়া।

'এছাড়াও পেছনে আছে—,' বলে চললেন ওয়েমিক, 'দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে—একটা শূকর, আরো আছে মোরগ-মুরগি, খরগোশ। পেছনের বাগানে আমি তরিতরকারি ফলাই। কেন জানো?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মিস্টার ওয়েমিক। আমি কিছু বলার আগেই তিনি দিতে শুরু করলেন জবাবটা: 'বহিঃশত্রু কখনো যদি দুর্গ অবরোধ করে মোটামুটি একটা সময় পর্যন্ত খাদ্যের অভাব হবে না আমার।'

এরপর তিনি গঞ্জবারো দূরে এক লতাঘেরা কুঞ্জে নিয়ে গেলেন আমাকে। 'ঝুলসেতু' থেকে কুঞ্জের দূরত্ব বারোগজ হলেও সরু রাস্তাটা বাগানের ভেতর দিয়ে এমন এঁকেবেঁকে গেছে যে মনে হলো অনেকটা পথ এলাম। ছোট্ট একটা টেবিল পাতা কুঞ্জে। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলে সাজানো রয়েছে গ্লাস। পাঞ্চ (লেবুর রস, পানি, মশলা ইত্যাদি মেশানো মদ) ঠাণ্ডা করতে দেয়া হয়েছে পাশের এক হ্রদে। হ্রদটা লম্বায় চওড়ায় কতটা তা আমি বলতে চাই না, এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ওটার মাঝখানে বৃত্তাকার একটা দ্বীপ আছে। দ্বীপটার আকার কোনো মতে একটা থালার সমান হলেও হতে পারে। দ্বীপের মাঝখানে একটা ফোয়ারাও আছে। হ্রদের তীরে বসানো একটা চরকিকল ঘোরালে ঐ ফোয়ারা দিয়ে এত জোরে পানি বেরোয় যে তার ওপর হাত রাখলে বেশ ভিজে যায় হাতটা।

'আমিই স্থপতি এ দুর্গের,' আমার প্রশংসার জবাবে বললেন

মিস্টার ওয়েমিক, 'আমিই মিস্ত্রী, আমিই ছুতোর, আমিই মালী, আমিই সব। এ-ই ভালো। নিজের কাজ নিজে করতে পারায় একটা আনন্দ আছে। চলো, আমার বুড়ো বাবার সাথে আলাপ করিয়ে দেই।'

আমাকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন তিনি। ফ্লানেলের কোট পরা খুথুরে এক বুড়ো আগুনের সামনে বসে আছেন। খুশি খুশি এক প্রশান্তির ভাব বৃদ্ধের চেহারায়। কানে খাটো ভদ্রলোক।

'তারপর, বাবা,' এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের সাথে করমর্দন করতে করতে চেঁচালেন মিস্টার ওয়েমিক, 'কেমন আছো?'

'ভালো, জন, ভালো!' বললেন বৃদ্ধ।

'বাবা,' আগের মতোই চেঁচিয়ে বললেন ওয়েমিক, 'এ মিস্টার পিপ—শুনতে পেয়েছো?—মিস্টার পিপ। ওঁর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাও, মিস্টার পিপ, উনি খুশি হবেন।'

মিস্টার ওয়েমিকের কথা মতো কাজ করলাম আমি।

'আমার ছেলের এই বাড়ি, চমৎকার না?' চিৎকার করলেন বৃদ্ধ।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

বৃদ্ধের সাথে আরো দু'একটা কথা বলে আমরা ফিরে এলাম কুঞ্জে। মিস্টার ওয়েমিক হ্রদ থেকে তুলে আনলেন পাঞ্চের বোতল। টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসে পান করলাম। পাঞ্চটা সত্যিই ভালো।

ন'টা বাজতে কয়েক মিনিট থাকতে উঠলাম আমরা। কামান-টার কাছে গেলাম। মিস্টার ওয়েমিক বারুদ ঠাসলেন ওটায়। তার-পর ঠিক ন'টায় আগুন দিলেন পলতেয়। পিস্তলের গুলির চেয়ে

সামান্য জোর একটা আওয়াজ হলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস্টার ওয়েমিক।

'এই শব্দটা শুনলে খুব খুশি হয় বাবা।'

এরপর ঘরে গিয়ে মিস্টার ওয়েমিক তার ধনসম্পদ সব দেখালেন আমাকে। বেশির ভাগই মিস্টার জ্যাগার্সের মক্কেলদের কাছ থেকে পেয়েছেন 'উপহার' হিশেবে। তারপর খাওয়া। ছোট এক কাজের মেয়ে আছে বাড়িতে। দিনের বেলায় মিস্টার ওয়েমিকের বাবার দেখাশোনা করে সে, রান্না বাড়াও করে। খাবার পরিবেশন করলো সে-ই। খাবার ব্যবস্থা ভালোই ছিলো। পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়া হলো।

রাতটা মিস্টার ওয়েমিকের প্রাসাদেই কাটালাম।

পরের সোমবার সকালের ডাকে বিডির একটা চিঠি পেলাম। বিডি লিখেছে :

প্রিয় মিস্টার পিপ,

মিস্টার গারগেরির অনুরোধে এই চিঠি লিখছি। মিস্টার ওপস্‌লের সঙ্গে উনি লণ্ডন যাচ্ছেন। অনুগ্রহ ক'রে তুমি যদি তাঁকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দাও উনি খুশি হবেন। আগামী মঙ্গলবার সকাল ন'টায় ওরা বার্নার্ড'স হোটেলে পৌছুবেন। ঐ সময় তোমার যদি দেখা করতে আপত্তি থাকে তাহলে জানাও চিঠি লিখে। তোমার বোন যেমন দেখে গিয়েছিলে তেমনই আছেন। প্রতিরাতে আমরা রান্নাঘরে তোমার কথা আলোচনা করি, ভাবি তুমি কী বলছো বা করছো। পুরনো

দিনের কথা স্মরণ ক'রে আমি তোমাকে আমার ভালোবাসা জানানোর সাহস দেখাচ্ছি।

তোমার চির অনুগত, ও বিশ্বস্ত দাসী,

বিডি।

পুনশ্চ : মিস্টার গারগেরির কথা মতো আরো লিখছি, তুমি এখন ভদ্রসমাজের ভদ্রলোক হলেও আশা করি তোমার তাঁর সাথে দেখা করতে আপত্তি হবে না। যতটুকু জানি তুমি বরাবরই উদার হৃদয়, আর তাঁর জন্যে বিশেষ একটা অনুভূতি ছিলো তোমার মনে। শেষের এই বাক্যটা ছাড়া পুরো চিঠিই পড়ে শোনাচ্ছি তাঁকে।

সত্যি কথা বলতে কি এ চিঠি পেয়ে আমি মোটেই খুশি হলাম না। মঙ্গলবার মানে কালই। জো তার গেঁয়ো পোশাকে গেঁয়ো কথাবার্তা বলবে আর আমি অপদস্থ হবো মানুষের সামনে। টাকা দিয়ে যদি ওর আসা বন্ধ করা সম্ভব হতো নিশ্চয়ই আমি তা-ই করতাম। তবু ভাগ্যভালো ও বার্নার্ড'স ইন-এ আসছে, হ্যামারস্মিথে মিস্টার পকেটের বাড়িতে না। আর সবার কথা বাদ দিলাম, ড্রাম্‌ল যদি দেখতো জো-কে এবং টের পেতো ও আমার ভগ্নিপতি, নির্ঘাৎ সে তার মনে যত বিষ আছে সবটা দিয়ে বিদ্রূপ এবং অপমান করতো আমাকে, নিঃসন্দেহে জো-কেও।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আমার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। বেলা যত বাড়ছে মনের অস্থিরতাও তত বাড়ছে। কতবার যে ভাবলাম ছুটে পালিয়ে যাই।

অবশেষে এগিয়ে এলো সময়। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেলাম। আওয়াজের ধরন শুনেই বুঝতে পারলাম, জো ছাড়া আর কেউ নয়। শহরের কেউ অমন শব্দ ক'রে সিঁড়িবেয়ে ওঠে না। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দীর্ঘ সময় নিয়ে জুতোর তলা পরিষ্কার করলো। তারপর আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে ঢুকলো ঘরে।

'জো, কেমন আছো, জো?'

'তুমি কেমন আছো, পিপ?'

এগিয়ে এসে আমার দু'হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগলো সে।

'খুব খুশি হয়েছি, তুমি এসেছো, জো। দাও, তোমার হ্যাটটা দাও।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে সাবধানে—ডিমসহ পাখির বাসা পাড়ছে এমন ভঙ্গিতে মাথা থেকে হ্যাট খুললো জো। তারপর ধরে রইলো বুকের কাছে মহামূল্য কোনো সম্পত্তির মতো।

'কত বড় হয়েছো তুমি, পিপ!' বললো সে। 'মোটাও হয়েছো। এখন তুমি পুরো দস্তুর ভদ্রলোক। আমরা সবাই গর্বিত তোমাকে নিয়ে।'

'তোমাকেও বেশ ভালো, স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে, জো।'

'ধন্যবাদ সেজন্যে ঈশ্বরকে,' বললো জো। 'বেশিরভাগ মানুষের স্বাস্থ্য যেমন আমারও তেমন, এ আর আশ্চর্য কী! তোমার বোনও ভালো আছে। বিডিও। খালি মিস্টার ওপস্‌লের একটু অধঃপতন হয়েছে।'

'অধঃপতন?'

'হ্যাঁ, গির্জার কাজ ছেড়ে উনি নাটকে নেমেছেন,' গলা নামিয়ে

বললো জো। 'সেজন্যেই এসেছেন লণ্ডনে, আমাকেও নিয়ে এসেছেন।'

হ্যাটটা এক হাতে নিয়ে পকেট থেকে দুমড়ানো মোচড়ানো একটা কাগজ বের ক'রে আমার হাতে দিলো ও। দেখলাম কাগজটা মেট্রোপলিটান থিয়েটারের একটা বিজ্ঞপ্তি।

'তুমিও ছিলে এ নাটকে, জো?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ছিলাম।'

'কী দেখলে? খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে?'

'তা তো একটু পড়েছে—'

আচমকা ভূত দেখে চমকে ওঠা অভিব্যক্তি হলো জো-র মুখে। বুঝলাম, হারবার্ট এসেছে। আমি ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম জো-র। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো হারবার্ট। জড়সড় হয়ে পিছিয়ে গেল জো। এইসময় নাশতা নিয়ে ঢুকলো হোটেলের এক ছোকরা পরিচারক।

'আপনি কি চা খাবেন না কফি, মিস্টার গারগেরি?' জিজ্ঞেস করলো হারবার্ট।

'ধন্যবাদ, স্যার,' পা থেকে মাথা পর্যন্ত আড়ষ্ঠ হয়ে বললো জো, 'আপনারা যা খাবেন আমিও তা-ই খাবো।'

'বেশ, তাহলে চায়ের কথাই বলি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

হারবার্টকে অফিস যেতে হবে, তাই তাড়াহুড়ো ক'রে খেয়ে ও বেরিয়ে গেল।

'এবার, স্যার, আমরা দু'জন একা—' শুরু করলো জো।

'জো,' ওকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'আমাকে তুমি স্যার

'বলছো কী ক'রে?'

অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালো জো। যেন বোঝাতে চাইলো: 'বলবো না? তুমি আর আমি কি আর এক আছি? তোমার জীবন আর আমার জীবন এখন আলাদা। তুমি লণ্ডনের ভদ্রলোক, আমি গ্রামের কামার। স্যার ছাড়া আর কী বলে ডাকবো তোমাকে?'

'আমরা দু'জন এখন একা,' আবার শুরু করলো জো, 'আমি বেশিক্ষণ থাকবো না। একটা খবর দেয়ার ছিলো তাই এসেছি এখানে। সত্যি বলছি, আর কোনো কারণ নেই আমার আসার।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। ওর সেই অদ্ভুত চাউনি আর দেখতে চাই না। ও বলে চললো:

'ব্যাপারটা, স্যার, ঘটেছে এভাবে: এক সন্ধ্যায় আমি বসে আছি জলি বার্গমেন-এ, এই সময় এলেন আঙ্কল প্যুমব্‌লচুক। বুঝলে, পিপ,' সম্ভবতঃ যখন জো-র মনে পড়ে যাচ্ছে আমি ভদ্রলোক তখন বলছে স্যার, যখন মনে থাকছে না তখন পুরনো দিনের মতো ডাকছে পিপ বলেই, 'উনি বললেন, "জোসেফ, মিস হ্যাভিশ্যাম তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।" '

'মিস হ্যাভিশ্যাম, জো?'

'আঙ্কল বললেন, "ভদ্রমহিলা কী যেন বলবেন তোমাকে।" '

'তারপর, জো?'

'পরদিন, স্যার, আমি আমার সবচেয়ে ভালো কাপড়চোপড় পরে গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের ওখানে। উনি জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার গারগেরি, পিপ তো তোমার কাছে চিঠিপত্র লেখে, তাই না?" তোমার একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাই জবাব দিলাম, "হ্যাঁ।"

এরপর উনি বললেন, "পিপকে একটা খবর দিতে পারবে যে, এস্টেলা বাড়িতে এসেছে ? পিপকে একবার দেখতে পেলে ও খুশি হবে।'

'বাড়ি ফিরে বিডিকে বললাম খবরটা তোমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে। কিন্তু বিডি বললো, "তুমি নিজে গিয়ে যদি খবরটা দাও পিপ খুশি হবে।" তাই আসতে হলো।

'আমার যা বলার ছিলো, স্যার, বলে ফেলেছি। তোমার দীর্ঘ জীবন এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি, পিপ, তুমি অনেক অনেক ধনী হও।' উঠে দাঁড়ালো জো।

'তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছো না, জো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ডিনারের সময় আসছো, নিশ্চয়ই ?'

'না, পিপ বাবু, একটু পরেই আমি কোচ ধরবো। এই অচেনা পরিবেশে আমি ঠিক স্বস্তি বোধ করছি না। আমার কামারশালা, রান্নাঘর বা জলাভূমির বাইরে আমার ভালো লাগে না। আজ আমার আচরণে যদি কোনো দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা ক'রে দিও। লণ্ডনে এসে তোমার সাথে দেখা করা আমার উচিত হয়নি। সাধারণ এক গেঁয়ো কামার মনে ক'রে যদি তাকাও আমার দিকে, যতটা দোষ আজ আমার ভেতর দেখতে পেলে তার অর্ধেকও পাবে না। পিপ, কখনো যদি আমাকে দেখার ইচ্ছে হয় চলে এসো গ্রামে, আমার কামারশালার জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিও, দেখবে কামার জো কাজ করছে, তেমন কোনো ভুল ত্রুটি করছে না। এবার তাহলে আসি, পিপ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

আমি স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছি। জো এগিয়ে এসে

আমার কপালে আলতো ক'রে হাত ছুঁইয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

একটু পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছুটলাম জো-কে ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু আশপাশের সবগুলো রাস্তায় খুঁজেও তাকে পেলাম না।

# চোদ্দ

জানি, যে খবর পেয়েছি এর পর আর দেরি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, পরদিনই রওনা হতে হবে মিস হ্যাভিশ্যামের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সুতরাং অবিলম্বে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম যাত্রার। প্রথমে ঠিক করলাম গিয়ে জো-র বাড়িতেই উঠবো, তাহলে আজ ও যে দুঃখ পেয়ে গেছে কিছুটা হলেও তার উপশম হবে। কিন্তু কোচে আসনের বন্দোবস্ত ক'রে, মিস্টার পকেটকে বলে সন্ধ্যায় বার্নার্ড'স ইন-এ ফিরতে ফিরতে আমার মত বদলে গেল। ঠিক করলাম শহরের হোটেল ব্লুবোর-এ উঠবো। এতে জো দুঃখ পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু কী করা যাবে, একজন ভদ্রলোক তো গ্রামের সামান্য এক কামারের বাড়িতে উঠতে পারে না। জো যাতে কম দুঃখ পায় সে-জন্যে ভাব দেখাবো হঠাৎ ক'রে কোনোরকম খবর না দিয়ে এসে

উঠলে ওদের অসুবিধা হতে পারে ভেবেই আমি হোটেলে উঠেছি। তাছাড়া মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে যাওয়া হোটেল থেকেই সহজ, এটাও বুঝিয়ে বলতে পারবো।

পরদিন বিকেলের গাড়িতে আসন পেয়েছি। সময় মতো কোচ স্টেশনে উপস্থিত হলাম। হারবার্ট এসেছে আমাকে তুলে দিতে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার সহযাত্রীদের ভেতর দু'জন কয়েদীও রয়েছে। একজন রক্ষী তাদের নিয়ে যাচ্ছে।

কয়েদী দু'জনের হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। একজনকে দেখেই চিনতে পারলাম। একটা আধবোঁজা চোখ। থ্রি জলি বার্গমেন-এ যে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো, এবং চলে আসার সময় দুটো এক পাউণ্ড নোটে মুড়ে একটা শিলিং দিয়েছিলো এ সেই লোক। আমার বর্তমান চেহারা এবং পোশাক যা তাতে, ওর পক্ষে আমাকে চেনা অসম্ভব, তাছাড়া হারবার্ট বিদায় নেয়ার সময় আমাকে পিপ না বলে হ্যানডেল বলে সম্বোধন করলো এতেও আমার পরিচয় প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কমলো। তবু অস্বস্তির একটা কাঁটা খচ খচ ক'রে বিঁধতে লাগলো আমার মনে।

কোচের ভেতর আমার ঠিক পেছনের আসনে জায়গা হলো দুই কয়েদী আর তাদের রক্ষীর। ভাগ্যভালো সামনের আসনে হয়নি। তাহলে অস্বস্তি আরো বাড়তো।

কোচ ছুটে চলেছে। আমি নিজের চিন্তায় মগ্ন। মিস হ্যাভিশ্যাম ডেকে পাঠিয়েছেন! নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণ আছে। হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে এলো দুই কয়েদীর একজনের গলা :

'...দুটো এক পাউণ্ডের নোট।' মুখ না দেখেই বুঝতে পারলাম এ গলা আমার চেনা কয়েদীটার।

'কোথায় পেয়েছিলো?' প্রশ্ন করলো অচেনা কয়েদী।

'কী ক'রে জানবো? কোনোভাবে জোগাড় করেছিলো।'

'তারপর কী হলো?'

'হাতে বেশি সময় ছিলো না। ও তাড়াতাড়ি আমার হাতে নোট দুটো গুঁজে দিয়ে বললো, "তুমি তো ছাড়া পেয়ে যাচ্ছো। ছেলেটার নাম পিপ, যদি খুঁজে বের করতে পারো নোট দুটো তাকে দিও। আমার দুঃসময়ে আমাকে খাইয়েছিলো ও, আমার সাথে দেখা হওয়ার কথা গোপন রেখেছিলো। আমার এই কাজটুকু ক'রে দিতে পারবে না, ভাই?" আমি বলেছিলাম, পারবো; এবং করেছিলাম।'

'মানে সেই ছেলেকে খুঁজে নোট দুটো দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি হলে অমন বোকামি করতাম না। ইচ্ছে মতো খরচ করতাম দু'পাউণ্ড। আচ্ছা শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিলো লোকটার?'

'আবার পালিয়েছিলো জাহাজ থেকে। তারপর আবার যখন ধরা পড়ে, শুনেছি, যাবজ্জীবন হয়ে যায়।'

এরপর অন্য প্রসঙ্গে আলাপ করতে লাগলো দুই কয়েদী। আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। মাথাটা নাড়তেও ভয় হচ্ছে। কিসের ভয় বলতে পারবো না। কিন্তু ভয় পাচ্ছি।

ব্রুবোর ইন-এর কাছে কোচ আসতেই আমি নেমে পড়লাম এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকলাম হোটেলে।

* * *

পরদিন ভোরে আমি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ির উদ্দেশে। কিন্তু তখনও বেলা ভালো ক'রে ওঠেনি। এত সকালে ও বাড়িতে যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারলাম না। শহরের যে অংশে বাড়িটা সে অংশে হাঁটাহাঁটি ক'রে সময় কাটাতে লাগলাম। মাথার ভেতর চলছে চিন্তা, উড়ছে কল্পনার ফানুস। মিস হ্যাভিশ্যাম এস্টেলাকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছেন, আমাকেও ছেলের মতো মানুষ করার ব্যবস্থা করেছেন (এখনও আমার বদ্ধমূল ধারণা আমার সামনে সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন যিনি তিনি মিস হ্যাভিশ্যাম)। কেন? নিশ্চয়ই আমাদের দু'জনকে এক করতে চান তিনি। আমাদের বিয়ে দিয়ে তাঁর বিষণ্ণ নিরানন্দ বাড়ি আবার আনন্দমুখর ক'রে তোলা ছাড়া আর কী হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য?

অবশেষে যথেষ্ট বেলা হলো। কল্পনার জাল বুনতে বুনতে গিয়ে হাজির হলাম বাড়ির ফটকে। ঘণ্টা বাজাতেই যে এসে ফটক খুলে দিলো তাকে দেখে চমকে উঠলাম। এস্টেলা বা মিস পকেট নয়, দরজা খুলেছে অরলিক।

'অরলিক! তুমি এখানে এলে কী ক'রে?'

'কী ক'রে আবার? পায়ে হেঁটে,' ফটক বন্ধ করতে করতে জবাব দিলো অরলিক, ঠাট্টার সুর ওর গলায়।

'কামারশালা তাহলে ছেড়ে দিয়েছো?'

কৌতুকের চোখে চারপাশে তাকালো অরলিক। 'কেন, এ জায়গাটা কি কামারশালার মতো মনে হচ্ছে?'

'কতদিন হলো জো-র কাজ ছেড়েছো?'

'দিন তারিখ তো মনে ক'রে রাখিনি, তবে তুমি চলে যাওয়ার

কিছুদিন পরই।

ইতিমধ্যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। দরজা পেরোতেই এক পাশে অরলিকের ঘর। খুবই ছোট ঘর। একটা মাত্র জানালা উঠানের দিকটায়। দেয়ালে ঝুলছে অনেকগুলো চাবি। ফটকের চাবিটাও ওগুলোর সাথে স্থান পেলো। ওর সাথে আর কথা বলার ইচ্ছে হলো না আমার। জিজ্ঞেস করলাম :

'যাবো ওপরে? মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'আমি কী ক'রে জানবো? তোমার ইচ্ছে হলে চলে যাও। আমার দৌড় এই ঘর পর্যন্ত। বড় জোর যেটা করতে পারি এই হাতুড়ি দিয়ে ঐ ঘণ্টায় একটা বাড়ি দিতে পারি। তুমি অলিপথে ঢুকে পড়ো, ঘণ্টা শুনে কেউ যদি আসে তার কাছেই জেনে নিও যেতে পারবে কি পারবে না।'

অলিপথ ধরে এগোতে শুরু করলাম আমি। পেছন থেকে ভেসে এলো ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টার অনুরণণ তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে অলিপথে, দেখলাম সারাহ পকেট মোমবাতি হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির গোড়ায়।

'ওহ!' বললেন তিনি। 'মিস্টার পিপ, তুমি?'

'হ্যাঁ, মিস পকেট।' মিস্টার পকেট এবং তাঁর পরিবারের সবাই ভালো আছেন, খবরটা জানালাম তাঁকে।

'ভালো থাকলেই ভালো,' বিরক্তির সঙ্গে বললেন সারাহ পকেট। 'কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি ওদের একটু বেড়েছে না আগের মতোই আছে?' প্রশ্নটার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না তিনি। 'পথ নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার?'

নিশ্চয়ই আছে। মিস পকেটের আগে আগে উঠে চললাম

আমি। মিস হ্যাভিশ্যামের দরজায় পৌঁছে টোকা দিলাম।

'পিপের টোকা!' সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ভেসে এলো মিস হ্যাভিশ্যামের গলা। 'ভেতরে এসো, পিপ।'

ঘরের সবকিছু আগের মতো আছে। কিছুই বদলায়নি। মিস হ্যাভিশ্যামও না। আগের মতোই সাজটেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে আছেন তিনি। সেই একই পোশাক গায়ে। হাত ছড়ির ওপর। দৃষ্টি আগুনের দিকে। তাঁর পাশেই তাঁর না পরা জুতোটা হাতে ক'রে বসে আছে দারুণ পোশাক পরা এক ভদ্রমহিলা। আগে কখনো দেখিনি তাকে। মুখ নিচু ক'রে আছে, যেন মনোযোগ দিয়ে দেখছে মিস হ্যাভিশ্যামের জুতোটা।

'এসো, পিপ,' আগুনের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'কেমন আছো? আহ্, এমন ভাবে আমার হাতে চুমু খাচ্ছো, যেন আমি রানী!—তারপর?'

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি আমার দিকে। আবার করলেন প্রশ্নটা:

'তারপর?'

'শুনলাম আপনি নাকি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। আমাকে মনে রেখেছেন এ আপনার অসীম অনুগ্রহ।'

মিস হ্যাভিশ্যামের পাশে বসা ভদ্রমহিলা এবার মুখ তুললো। ঘাড়টা সামান্য বাঁকিয়ে তাকালো আমার দিকে। এতক্ষণ যাকে মনে হচ্ছিলো আগে কখনো দেখিনি এখন এক মুহূর্তও লাগলো না তাকে চিনতে। এস্টেলা। এত বদলে গেছে ও। সুন্দরী ও আগেই ছিলো, এখন আরো সুন্দরী হয়েছে, পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছে। ওর অপূর্ব রূপ, চোখ ধাঁধানো পোশাক আর তীর্যক চাউনি দেখে আমি

ভেতরে ভেতরে আবার সেই রুক্ষ, অমার্জিত, জড়সড়, সাধারণ কাজের ছেলে হয়ে উঠলাম। মনে হলো ও যেন অনেক দূরের, আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরের কোনো নারী।

ও একটা হাত এগিয়ে দিলো আমার দিকে। আমি কী করবো বা বলবো বুঝতে পারলাম না।

'ও কি এতই বদলে গেছে, পিপ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'মুখ তোলার আগ পর্যন্ত কল্পনাই করতে পারিনি ও এস্টেলা। এখন দেখছি সেই পুরনো—'

'উদ্ধত, অহঙ্কারী এস্টেলা?' আমাকে বাধা দিয়ে বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'মনে আছে, পিপ, তুমি ওর কাছ থেকে পালাতে চাইতে কেবল?'

'অনেক দিন আগের কথা,' বিড় বিড় ক'রে আমি বললাম, 'তখন দুনিয়ার কিছুই জানতাম না আমি।'

মিষ্টি ক'রে হাসলো এস্টেলা, শান্ত হাসি। 'সত্যিই তুমি কিছুই জানতে না তখন,' বললো সে। 'আমার স্বভাবটাও সহ্য করার মতো ছিলো না।'

'বদলেছে ও?' মিস হ্যাভিশ্যাম জিজ্ঞেস করলেন এস্টেলাকে।

'অনেক,' আমার দিকে তাকিয়ে বললো এস্টেলা।

'আগের চেয়ে কম রুক্ষ, অমার্জিত, সাধারণ?' এস্টেলার চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

কিছু বললো না এস্টেলা। মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিলো।

সেই অদ্ভুত, প্রাচীনের গন্ধমাখা, স্বপ্নের মতো ঘরটায় বসে আমরা আলাপ করতে লাগলাম। জানতে পারলাম এস্টেলা মাত্র

ক'দিন হলো ফ্রান্স থেকে এসেছে, লণ্ডন যাবে ক'দিন পরে। আগের মতো উদ্ধত এবং অহঙ্কারী ও আছে কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝতে পারলাম আমার মনে ওকে প্রথম দিন দেখে যে আকর্ষণ জেগেছিলো তা এখনো আছে। শুধু আছে বললে ভুল হবে, এখন ওকে দেখার পর সেই আকর্ষণ দুর্নিবার, অদম্য হয়ে উঠেছে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করছি, এস্টেলা আমার অস্তিত্বের অংশ, আমার অন্তর থেকে ওকে নির্বাসিত করা কখনোই সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ঠিক হলো দিনটা আমি এবাড়িতেই কাটাবো, রাতে ফিরবো হোটেলে। কাল রওনা হয়ে যাবো লণ্ডনের পথে। কিছুক্ষণ আমরা তিনজন কথাবার্তা বললাম। তারপর মিস হ্যাভিশ্যাম বললেন :

'যাও তোমরা দু'জন বেড়িয়ে এসো বাগান থেকে। ফিরে, পিপ, তুমি পুরনো দিনের মতো চেয়ার ঠেলে ঘোরাবে আমাকে।'

দীর্ঘদিন অবহেলিত পড়ে আছে যে বাগান তার ভেতর পাশাপাশি হাঁটছি এস্টেলা আর আমি। হারবার্টের সাথে যেখানে মারামারি করেছিলাম সে জায়গায় পৌঁছুতেই এস্টেলা বললো :

'সেদিন লুকিয়ে আমি তোমাদের লড়াই দেখেছিলাম। যা মজা পেয়েছিলাম দেখে!'

'তার পুরস্কারও তো আমাকে দিয়েছিলে।'

'দিয়েছিলাম নাকি?' কিছুই মনে নেই এমন ভঙ্গিতে বললো ও। 'সেদিন ওর মার খাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না ও এবাড়িতে মানুষ হবে আর আমার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করবে।'

'ও আর আমি এখন সত্যিকারের বন্ধু।'

'আচ্ছা! হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন, তুমি তো ওর বাবার কাছেই পড়াশোনা করছো?'

'হ্যাঁ।'

'ভাগ্য বদলের সাথে সাথে বন্ধুবান্ধবও তুমি বদলে ফেলেছো, তাই না?'

'স্বাভাবিক ভাবেই।'

'একদিন যারা যোগ্য ছিলো তোমার সঙ্গী হবার, বন্ধু হবার আজ তারা সব অযোগ্য হয়ে গেছে। হতেই হবে। কারণ তুমি এখন ভদ্রলোক, ওরা নয়।'

জো-র সাথে দেখা করার যে ক্ষীণ ইচ্ছাটুকু মনের ভেতর ছিলো তা দূর হয়ে গেল এই কথায়।

বাগানটা আগাছায় ভর্তি। তার ভেতর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর। কোনোমতে দুটো কি তিনটে চক্কর দিয়ে আমরা চলে এলাম উঠানে। হাঁটতে লাগলাম মদের কারখানাটার দিকে। কারখানার সামনে সাজিয়ে রাখা পিপের সারি দেখিয়ে বললাম:

'মনে আছে, একদিন তুমি ঐ পিপেগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছিলে লাফিয়ে লাফিয়ে?'

'হাঁটছিলাম নাকি? আমার মনে নেই।'

'আমাকে যে কাঁদিয়েছিলে সে কথা মনে আছে?'

'না,' সামনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে।

ওর এই মনে না করতে পারা আবার আমাকে কাঁদালো মনে মনে—আর কে না জানে মনে মনে কান্নাই তীব্রতম কান্না।

হঠাৎ ক'রেই আমার দিকে মুখ ফেরালো সে। 'একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার, আমার হৃদয় বলে কিছু নেই, সেজন্যে স্মৃতিতেও কিছু থাকে না।'

আমার মনে হলো কথাটা ওর অহঙ্কারেরই বহিঃপ্রকাশ। মনে হলো সুন্দরমাত্রেরই এই অহঙ্কারটুকু থাকে।

'আমার যে হৃদয় আছে,' বলে চললো এস্টেলা, 'তাতে ছুরি মারা যায়, গুলি করা চলে; তার স্পন্দন বন্ধ হলে আমারও হেঁটে চলে বেড়ানো শেষ—এ পর্যন্তই। আমি কী বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো। আমার হৃদয়ে কোনো কোমলতা নেই, নেই কোনো অনুভূতি—দয়া—মায়া—আবেগ।'

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। এ কি মিস হ্যাভিশ্যামেরই প্রতিচ্ছায়া? তাঁর হাতে গড়া বলেই কি ওর মুখে এসব কথা?

'আমি সত্যি কথাই বলছি,' আবেগশূন্য কণ্ঠে বললো এস্টেলা, 'আমাদের যদি আরো ঘনিষ্ঠতার দিকে ঠেলে দেয়া হয় তবে এখনই তোমার এটা জেনে রাখা উচিত—এপর্যন্ত কারো প্রতিই আমার কোনো অনুরাগ জন্মেনি, জন্মাবেও না।'

নীরবে হেঁটে চললাম আমরা। একটু পরেই পৌঁছুলাম দীর্ঘ দিনের অব্যবহৃত চোলাইখানাটার কাছে। এস্টেলা সারি দিয়ে রাখা পিপেগুলোর দিকে হাত উঁচিয়ে কোমল স্বরে বললো:

'ওগুলোর ওপর দিয়ে আমি হেঁটেছিলাম, না? আর ঐ কোনায় লুকিয়ে তুমি কেঁদেছিলে। ওখানে তোমাকে আমি খেতে দিয়েছিলাম প্রথম দিন।'

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার দশা। এ আবার কী রূপ

এস্টেলার।

'কী ব্যাপার?' আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো ও। 'ঘাবড়ে গেলে নাকি? কাঁদবে আজ আবার?'

'এতক্ষণে যা বললে সব বিশ্বাস করলে ঘাবড়ানোরই কথা।'

'তাহলে করোনি বিশ্বাস? ঠিক আছে, চলো এখন। বাগানে আর একটা চক্কর দিয়ে আমরা ঘরে ঢুকবো। মিস হ্যাভিশ্যাম হয়-তো এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছেন দেরি দেখে। এসো, আজ আর কোনো কান্নাকাটি নয়। আজ তুমি আমার সাথী, তোমার হাত ধরে ঘুরবো।'

মিস হ্যাভিশ্যাম আমাদের মিলন চান মনে ক'রে যে উত্তুঙ্গ আনন্দ নিয়ে ঢুকেছিলাম এবাড়িতে তা এস্টেলার অদ্ভুত, বিভ্রান্তি-কর আচরণে আছড়ে পড়েছে মাটিতে। বাড়িতে ঢোকার আগে এস্টেলার হাত ধরে আরো দু'তিনটে চক্কর দিলাম বাগানে, কিন্তু আমি স্বাভাবিক আর হতে পারলাম না।

অবশেষে বাড়িতে ফিরলাম আমরা। ডিনারের সময় প্রায় হয়ে গেছে। আমাকে মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস্টেলা চলে গেল তৈরি হতে। মিস হ্যাভিশ্যাম চাকাওয়ালা চেয়ারটায় বসে আছেন। আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম ঠেলবার জন্যে। কিন্তু সে সুযোগ তিনি দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন:

'কী মনে হলো, এস্টেলা অনেক সুন্দর হয়েছে? আকর্ষণীয় হয়েছে? ভালো লাগলো ওকে তোমার?'

'ওকে যে দেখবে তারই ভালো লাগবে, মিস হ্যাভিশ্যাম।'

কাঁধ ধরে আমাকে কাছে টানলেন তিনি। ফিস ফিস ক'রে বল-লেন:

'ভালোবাসো ওকে! ভালোবাসো! ভালোবাসো! কেমন ব্যবহার করলো আজ তোমার সাথে?' আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না তিনি। বলে চললেন আগের মতোই ফিস ফিসে স্বরে, 'ভালোবাসো ওকে, ভালোবাসো! ও যদি প্রশ্রয় দেয়, ভালোবাসো! যদি আঘাত করে, তবু ভালোবাসো! যদি তোমার হৃদয় গুঁড়িয়ে দেয়, তবু ভালোবাসো! ভালোবাসো ওকে! ভালোবাসো! ভালোবাসো!'

এমন আবেগতাড়িত আগ্রহ আমি আগে কারো কথায় শুনিনি। কাঁধে তাঁর শীর্ণ হাতের চাপ অনুভব করছি। আবার শুরু করলেন তিনি উন্মাদ-একাগ্রতায় :

'শোনো, পিপ! একজন—মাত্র একজনের ভালোবাসার ধন হবে বলেই ওকে আমি মানুষ করেছি, ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, গড়ে তুলেছি। ভালোবাসো ওকে! ভালোবাসো! শোনো, তোমাকে বলি সত্যিকারের ভালোবাসা কী! এ হচ্ছে অন্ধ অনুরাগ, নিজের সত্তার প্রশ্নাতীত অবলুপ্তি, নিঃশেষে আত্মদান, পৃথিবীর সব ভুলে শুধু এক জনেরই ধ্যান করা, তোমার সমস্ত হৃদয় মন একজনের জন্যে নিবেদিত করা—যেমন করেছিলাম আমি! ওহ!'

সবহারানো এক আর্তনাদ ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁপছেন থর থর ক'রে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে আবার বসিয়ে দিলাম। বসে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। এই সময় ঘরে ঢুকলেন মিস্টার জ্যাগার্স। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মিস হ্যাভিশ্যামের দিকে মুখ ফেরালাম আমি। দেখলাম সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্বাভাবিক তিনি। আত্মসংবরণ করার জন্যে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

'বরাবরের মতো একেবারে ঠিকসময়ে হাজির!' বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক সময়ে,' জবাব দিলেন জ্যাগার্স। 'পিপ, তুমি এখানে! কখন এলে?'

'এসেছি সকালে,' বললাম আমি। 'মিস হ্যাভিশ্যাম ডেকে পাঠিয়েছিলেন এস্টেলাকে দেখতে।'

'আহ! চমৎকার মেয়ে! মিস হ্যাভিশ্যাম, একটু ঠেলবো আপনাকে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জ্যাগার্স। এবং জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঠেলতে শুরু করলেন চেয়ারটা।

'তারপর, পিপ!' একটু পরে বললেন তিনি, 'মিস এস্টেলাকে এর আগে ক'বার দেখেছো তুমি?'

'ক'বার?'

'হ্যাঁ, ক'বার? দশ হাজার বার?'

'নাহ্, নিশ্চয়ই অতবার না।'

'দু'বার?'

আমাকে পরম স্বস্তি দান ক'রে তাঁকে বাধা দিলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'জ্যাগার্স, এনিয়ে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না পিপকে। যাও তোমরা, খেয়ে নাওগে।'

বেরিয়ে এলাম আমরা ঘর থেকে। খাওয়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে মিস্টার জ্যাগার্স জিজ্ঞেস করলেন:

'মিস হ্যাভিশ্যামকে কখনো কিছু খেতে বা পান করতে দেখেছো?'

একটু ভেবে আমি বললাম, 'না।'

'দেখবেও না। যেদিন থেকে এখনকার এই জীবন শুরু করে-

ছেন সেদিন থেকে কাউকে উনি ওঁর খাওয়া দেখতে দেন না। রাতে কেউ যখন কাছে থাকে না তখন খান একা একা।'

'স্যার,' আমি বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে?'

'করতে পারো। তবে জবাব দেবো বা দিতে পারবো কি না জানি না। করো তোমার প্রশ্ন।'

'এস্টেলার পদবী, স্যার, হ্যাভিশ্যাম, না—?'

'না কী?'

'হ্যাভিশ্যাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাভিশ্যাম।'

ডিনার টেবিলে পৌঁছে গেছি। এস্টেলা আর সারাহ পকেট অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। বসে পড়লাম আমরা। মিস্টার জ্যাগার্স এস্টেলার সামনে, আমি সারাহ পকেটের সামনে। পরিবেশন করলো এক চাকরাণী; যাকে এর আগে কখনো আমি দেখিনি যদিও মনে মনে জেনেছি এই রহস্যময় বাড়িতে এমন একজন মানুষ আছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, খাওয়ার সময় একবারও মিস্টার জ্যাগার্স এস্টেলার দিকে তাকালেন না। ও কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, কিন্তু তাকালেন না মুখ তুলে।

ডিনারের পর কিছুক্ষণ মিস্টার জ্যাগার্স আর আমি একা কাটালাম। আমি চুপচাপ বসে রইলাম, উনি তারিয়ে তারিয়ে পান করলেন এক গ্লাস মদ। কেউ কারো সাথে কথা বললাম না। অবশেষে মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে ডাক পড়লো আবার। সেখানে রাত ন'টা পর্যন্ত আমরা তাস খেললাম—মিস হ্যাভিশ্যাম, মিস্টার

জ্যাগার্স, এস্টেলা আর আমি। বিদায় নিলাম তারপর। বিদায়ের আগে মিস হ্যাভিশ্যাম আমাকে বললেন, শিগগিরই এস্টেলা লণ্ডন যাবে, আমি যেন কোচ স্টেশনে যাই ওকে নিতে। কবে ও লণ্ডন পৌঁছুবে সময় মতো আমাকে জানানো হবে।

মিস্টার জ্যাগার্সও ব্লুবোর হোটেলে উঠেছেন। একসাথে ফিরলাম আমরা। তারপর উনি ঢুকে গেলেন ওঁর কামরায়, আমি আমার কামরায়।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। যতক্ষণ জেগে রইলাম ততক্ষণ তো বটেই, ঘুমের ভেতরেও কানে বাজতে লাগলো মিস হ্যাভিশ্যামের আবেগকম্পিত একাগ্র কণ্ঠস্বর: 'ভালোবাসো ওকে। ভালোবাসো। ভালোবাসো!' কখন যে শব্দগুলো বদলে গেল জানি না। হঠাৎ টের পেলাম আমার মন বলছে: 'ভালোবাসি ওকে। ভালোবাসি। ভালোবাসি।' কিন্তু কবে ও আগ্রহী হবে আমার প্রতি? কবে ওর ভেতরের ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগাতে পারবো আমি?

# পনর

পরদিন সকালে পোশাক পরতে পরতে ভালো ক'রে আমি ভেবে দেখলাম, অরলিক যে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে কাজ করার যোগ্য

নয়, ওকে আর বহাল রাখা উচিত নয় এটা মিস্টার জ্যাগার্সকে জানানো উচিত।

নাশতা করার সময় আমি যখন কথাটা বললাম উনি জবাব দিলেন, 'আমি জানি, পিপ, ও যোগ্য নয়। বিশ্বাসের কাজে, দায়িত্বের কাজে যাকেই বহাল করা হোক না কেন, কোনো না কোনো দিক দিয়ে তার খুঁত বেরোবেই।'

আমি তখন অরলিক সম্পর্কে যা যা জানি সব বললাম।

'বেশ, এক্ষুণি আমি যাচ্ছি,' শুনে বললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'ওর পাওনা চুকিয়ে বিদায় ক'রে দেবো।'

এত দ্রুত তৎপর হয়ে উঠবেন মিস্টার জ্যাগার্স ভাবিনি। তাড়াতাড়ি বললাম, 'লোকটা খারাপ। আপনি গিয়ে বললেন আর চলে গেল এমন না-ও হতে পারে। ঝামেলা পাকাতে পারে বদমাশটা।'

'সে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' বললেন আমার অভিভাবক, 'ওর মতো লোককে কী ক'রে সামলাতে হয় আমি জানি। কোনো ঝামেলাই ও করবে না।'

দুপুরে একই গাড়িতে আমাদের লণ্ডন ফেরার কথা। কিন্তু তার আগে জো-র সাথে একবার দেখা ক'রে না যাওয়াটা অন্যায় হবে। এই ভেবে মিস্টার জ্যাগার্সকে বললাম, তিনি যেন যথাসময়ে রওনা হয়ে যান, আমি পথে গাড়িতে উঠবো।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কিছুক্ষণ হাঁটলাম শহরের রাস্তায়। পুরনো পরিচিত অনেকেই চেনা চেনা লাগছে অথচ ঠিক চিনতে পারছি না এমন মুখ ক'রে দেখতে লাগলো আমাকে। আমি মুখে পরিচয়ের কোনো চিহ্ন না ফুটিয়ে এগিয়ে চললাম। বেশ একটা মজা পাচ্ছি আমি ব্যাপারটায়। কিন্তু যেই গ্রামের পথ ধরলাম,

অমনি ঘনিয়ে এলো বিপর্যয়। আমার পুরনো দর্জি দোকানের ছেলেটা পিছু নিলো।

কাছে এসে যতই সে আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলো ততই আমি তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ চললো এভাবে। শেষ মেষ ছোকরা রেগে গিয়ে বলে উঠলো :

'ও! চিনতে পারছো না?' মুখে আর কিছু বললো না কিন্তু ওর চাউনি দেখেই বুঝতে পারলাম মনে মনে বলছে, 'এই সেদিনও ছিলে কামারের সহকারী আর আজ এমন ভদ্দর লোক হয়েছো যে চিনতেই পারছো না!'

ভীষণ লজ্জায় আমি আর এগোতে পারলাম না। কোনোমতে ছোঁড়াকে এড়িয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। দুপুরের আগে আর বেরোলাম না বাইরে। কোচে উঠলাম মিস্টার জ্যাগার্সের সাথেই।

লণ্ডনে পৌঁছুলাম যথাসময়ে। কিন্তু জো-র সাথে দেখা ক'রে না আসায় মনটা খুঁত খুঁত করছে। তাই লণ্ডনে নেমেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক কড মাছ আর ছোট এক পিপে অয়েস্টার পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম জো-র কাছে। তারপর গেলাম বার্নার্ড'স ইন-এ।

হারবার্ট তখন খেতে বসেছে। কাজের ছেলেটাকে পাঠিয়ে আমার খাবারও আনিয়ে নিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর হারবার্টকে বললাম :

'তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই আমি, হারবার্ট।'

'প্রিয় হ্যানডেল,' ও বললো, 'তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমার গোপন কথা গোপনই থাকবে।'

একটু ইতস্তত করলাম আমি, তারপর বলেই ফেললাম, 'হারবার্ট, আমি—আমি ভালোবাসি এস্টেলাকে।'

একটুও অবাক হলো না হারবার্ট। 'বেশ?

'বেশ। এছাড়া আর কিছু বলার নেই তোমার, হারবার্ট?'

'আমি বলতে চেয়েছি, তারপর? তুমি এস্টেলাকে ভালোবাসো সে তো জানিই। তারপর কী?'

'কী ক'রে জানলে?'

'তোমার কাছ থেকেই।'

'আমার কাছ থেকে!'

'মুখে না বললেও তোমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি আছে, তুমি ওকে ভালোবাসো? মুখে বলোনি তা-ই বা বলি কী ভাবে? তোমার জীবন কাহিনী যেদিন শুনিয়েছিলে সেদিনই তো বলেছিলে, প্রথম দেখায়ই ওকে তোমার ভালো লেগেছিলো।'

'বেশ, তাই যদি বলে থাকি তো এখন বলছি, এখন আর শুধু ভালো লাগে নয়, ওকে আমি ভালোবাসি। এখন যে ও কী অপরূপ সুন্দরী হয়েছে! কাল ওর সাথে দেখা হয়েছে আমার।'

'তুমি ভাগ্যবান, হ্যানডেল। কিন্তু ওর মনের কোনো খোঁজ পেলে? ও কী ভাবছে তোমার সম্পর্কে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'ওর মন! হাজার হাজার মাইল দূরে আমার থেকে।'

'ধৈর্য ধরো, হ্যানডেল: এখনো প্রচুর সময় আছে। আর কিছু বলবে তুমি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে। তুমি আমাকে ভাগ্যবান বললে—হয়তো আমি তা-ই। কালও ছিলাম কামারের শিক্ষানবিশ আর আজ—'

'আজ ভদ্রলোক। খুবই ভালো একজন তরুণ। সামনে উজ্জ্বল

ভবিষ্যৎ।'

'কিন্তু সেই উজ্জ্বলতার স্বরূপটা যে কী এখনো বুঝতে পারলাম না।'

'যা-ই হোক, খারাপ কিছু যে না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। নইলে মিস্টার জ্যাগার্সের মতো লোক তোমার অভিভাবক হতে রাজি হতেন না। এটা আমার বাবার অভিমত।'

'তা ঠিক।'

'সুতরাং কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো, দেখ কী হয়।' আমি চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে হারবার্ট আবার বললো, 'এবার শোনো, আমার অভিমত। এমন একটা অভিমত যা শুনে তুমি হয়তো রেগে যাবে; অন্তত খুশি যে হবে না তা বলতে পারি।'

'বলে ফেল অভিমতটা।'

'তোমার মুখে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যতদূর শুনেছি, ভবিষ্যতে কোনো এক সময় কিছু ধনসম্পত্তি পাবে, একথাই মিস্টার জ্যাগার্স তোমাকে বলেছেন, তাই না? এস্টেলার ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি।'

'না।'

'আরেকটা কথা, মিস হ্যাভিশ্যাম কখনো বলেছেন, উনি এস্টেলার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান তোমার?'

'না, পরিষ্কার ক'রে কখনো বলেননি। তবে আভাস ইঙ্গিতে মনে হয়েছে—'

'আভাস ইঙ্গিতের কথা মনে ঠাঁই না দেয়াই উচিত হবে, হ্যান্ডেল। মহিলা কী আভাস দিতে চেয়েছে আর তুমি কী বুঝেছো কে জানে? এই পরিস্থিতিতে আমার পরামর্শ হবে, এস্টেলার কথা

মন থেকে মুছে ফেল তুমি। মিস হ্যাভিশ্যাম ওকে কেমনভাবে মানুষ করেছে ভেবে দেখ, মিস হ্যাভিশ্যামের নিজের জীবনটার কথা ভেবে দেখ। ওকে ভালোবাসার পরিণাম ভালো হবে, মনে হয় না আমার।'

'জানি, হারবার্ট,' বললাম আমি। 'কিন্তু আমি নিরুপায়।'

'ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না?'

'না। অসম্ভব।'

'চেষ্টাও করতে পারবে না?'

'অসম্ভব!'

'বেশ, তাহলে আর কিছু বলার নেই আমার। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। দেখ কী হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ঘরের ভেতর পায়চারি করলো হারবার্ট। মনে হলো কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিলো মনে মনে। তারপর বললো:

'এবার, হ্যানডেল, আমার একটা গোপন কথা বলি তোমাকে। আমাদের পরিবারটাকে কেমন মনে হয় তোমার?'

'কেন? ভালোই তো। স্বচ্ছল।'

'স্বচ্ছল, তবে খেয়াল করেছো কিনা জানি না, অসুখী।' একথার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলা শোভন হবে কিনা বুঝতে না পেরে আমি চুপ ক'রে রইলাম। হারবার্ট বলে চললো, 'মা-র সঙ্গে বাবার খটাখটি লেগেই থাকে। এর পরিণতি কী হয়েছে জানো?' আমি জানি না, সব অসুখী পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থা এমন হয় কিনা —।'

'কেমন?'

'সবাই যেন বিয়ে করার জন্যে মুখিয়ে আছে।'

'তাই নাকি ?'

'আমার তা-ই মনে হয়। অন্তত আমাদের পরিবারের বেলায় তেমন ঘটেছে। আমার ঠিক ছোট যে বোনটা—শার্লট এর জ্বলন্ত উদাহরণ। চোদ্দ বছর বয়েসে মারা গেছে। কিন্তু তার আগেই ঠিক ক'রে ফেলেছিলো, বিয়ে করবে এক ছোকরাকে। জেন-এর অবস্থাও তা-ই। এমন কি ফ্রক পরে যে অ্যালিক, ও পর্যন্ত কিউ-এর এক ছোকরার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে ফেলেছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা সবাই—একমাত্র দু'বছরের বাচ্চাটা ছাড়া—যার যার জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী প্রায় বাছাই ক'রে ফেলেছি।'

'তুমিও ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা এখনও গোপন।'

আমার মনে হলো এই কথাটা বলার জন্যেই এতক্ষণ পরিবার সম্পর্কে এতকথা বলেছে হারবার্ট।

'তোমার গোপন কথা গোপনই থাকবে আমার কাছে,' বললাম আমি। 'এবার দয়া ক'রে বলবে মেয়েটা কে ?'

'নাম ক্লারা,' বললো হারবার্ট।

'লণ্ডনেই থাকে ?'

'হ্যাঁ। তবে খুব গরিব ওরা। আমার মা পুত্রবধূ হিশেবে যে ধরনের মেয়ে চায় ঠিক তার উল্টো। ওর বাবা জাহাজে কাজ করতো খুব নিচু পদে।'

'এখন কী করেন উনি ?'

'কিছুই না। অচল। অসুস্থ।'

'কবে তোমরা বিয়ে করছো ?'

'আগে আয় রোজগার শুরু করি,' বললো হারবার্ট। 'এখনও কাজ শিখছি আমি, এই অবস্থায় বিয়ে করি কী ক'রে?'

# ষোল

কয়েক দিন পর, মিস্টার পকেটের বাসায় বসে লেখাপড়া করছি, এই সময় ডাকে একখানা চিঠি পেলাম। অপরিচিত হস্তাক্ষর। সম্ভবত সে কারণেই আশায় মনটা দুলে উঠলো। এস্টেলার চিঠি হতে পারে।

খাম খুলে বের করলাম চিঠিটা। ওপরে কোনো সম্বোধন নেই। সরাসরি শুরু হয়েছে:

পরশুদিন দুপুরের কোচে লণ্ডন আসছি। আশাকরি তোমার মনে আছে, ঠিক হয়েছিলো তুমি কোচ স্টেশনে আসবে আমাকে নিতে। অন্তত মিস হ্যাভিশ্যামের তা-ই ধারণা। তাঁর কথামতোই এচিঠি লিখছি। উনি তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

—তোমার, এস্টেলা।

যদি সময় থাকতো নিঃসন্দেহে আমি এই উপলক্ষ্যে কয়েক প্রস্থ নতুন পোশাক বানিয়ে ফেলতাম। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূর হয়ে গেল। মন অশান্ত হয়ে উঠলো। চরম উত্তেজনার ভেতর কাটতে লাগলো সময়।

অবশেষে দিনটা এলো। যথাসম্ভব সাজগোজ ক'রে কোচ আসার সময় হওয়ার অনেক আগেই হাজির হলাম স্টেশনে। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলাম। একটু পরপরই গিয়ে অফিসে খবর নিতে লাগলাম, ক'টার সময় পৌঁছানোর কথা গাড়ির, আসতে দেরি হবে না তো?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট সময়ে কোচ এসে পৌঁছুলো। জানালায় ওর মুখ দেখতে পেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

ছুটে গেলাম আমি গাড়ির কাছে। ফারের ভ্রমণ পোশাক পরে নেমে এলো এস্টেলা। মনে হলো, ক'দিনে আরো সুন্দর হয়েছে ও। স্বভাবও যেন বদলেছে একটু—আগের চেয়ে অনেক সহজ, সপ্রতিভ এবং সদয়।

ওর জিনিসপত্র সব নামিয়ে একজায়গায় করার পর আমার মনে পড়লো, ও কোথায় যাবে সে সম্পর্কে কিছুই জানি না।

'রিচমণ্ডে যাবো আমি,' বললো এস্টেলা। 'জানো তো দুটো রিচমণ্ড আছে, সারে-তে একটা ইয়র্কশায়ারে একটা। আমারটা সারে রিচমণ্ড। দশ মাইল মতো এখান থেকে। একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। এই যে আমার টাকার থলে। এখান থেকে গাড়িভাড়া মেটাবে। থলেটা রাখো তোমার কাছে। কই নাও। উঁহুঁ, এছাড়া কোনো গতি নেই—না তোমার না

আমার। নির্দেশ পালন করতে হবে। নিজেদের মতে চলার স্বাধীনতা নেই আমাদের।'

অগত্যা আমি নিলাম টাকার থলেটা। এস্টেলাকে বললাম, 'গাড়ি ডাকতে পাঠাচ্ছি, কিন্তু তার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে না?'

'হ্যাঁ নেবো; একটু চা-ও খাবো। ততক্ষণ তুমি আমার খবরদারি করবে।'

আমার বাহু ধরলো ও, যেন কাজটা করা বাধ্যতামূলক, না করলে কোনো মহা অপরাধ করা হয়ে যেতো। কোচ স্টেশনেই একটা ছোট্ট সরাইখানা আছে। তার এক পরিচারককে ডেকে এস্টেলার মালপত্র সব ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্যে একটা একান্ত কক্ষের ব্যবস্থা করতে বললাম।

দোতলার একটা ছোট কামরায় আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালো লোকটা।

'রিচমণ্ডে কোথায় থাকবে তুমি?' লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম এস্টেলাকে।

'এক ধনী এবং প্রভাবশালী মহিলার বাড়িতে। থাকা খাওয়া বাবদ প্রচুর টাকা দিতে হবে। ও-বাড়িতে থাকলে আমি লণ্ডনের অভিজাত সমাজে মেলামেশা করার সুযোগ পাবো।'

'নিশ্চয়ই বৈচিত্র্যের স্বাদ এবং স্তাবকও পাবে প্রচুর?'

'হয়তো।'

এমন তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলো এস্টেলা যে আমি বলতে বাধ্য হলাম:

'তুমি এমনভাবে নিজের সম্পর্কে কথা বলো যেন অন্য কারো সম্পর্কে বলছো।'

'অন্যদের সম্পর্কে কী ভাবে কথা বলি, তুমি জানলে কী ক'রে? মৃদু হেসে বললো এস্টেলা। 'তোমার কাছে কথা বলার কায়দা শিখবো এমনটা আশা কোরো না, আমি আমার ঢংয়েই কথা বলবো। মিস্টার পকেটের ওখানে কেমন কাটছে তোমার?'

'ভালোই; অন্তত—'

'অন্তত?'

'তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে যতটা ভালো থাকা যায় ততটা।'

'শুরু হলো বাজে বক বক,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো এস্টেলা। 'এত বাজে বক বক করো কী ক'রে তুমি? মিস্টার ম্যাথ্যু বোধহয় ও পরিবারের আর সবার চেয়ে আলাদা, তাই না?'

'একেবারে আলাদা। কারো শত্রু নন উনি—'

'"নিজের ছাড়া" কথাটা জুড়ে দিও না,' বাধা দিয়ে বললো এস্টেলা। 'এধরনের মানুষ আমি চুচোখে দেখতে পারি না। তাহলে সত্যিই লোকটা ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি, ঈর্ষা এসবের ঊর্ধ্বে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আরগুলো সব একেবারে উল্টো। মিস হ্যাভিশ্যামের কাছে এমন সব কথা লাগায় তোমার বিরুদ্ধে! তোমার চালচলন গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে ওরা। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে সত্য মিথ্যা বানিয়ে। কখনো কখনো বেনামীতে। তুমি ভাবতেও পারবে না ওরা কতটা ঘৃণা করে তোমাকে।'

'আশাকরি এসব ক'রে আমার কোনো ক্ষতি ওরা করতে পারেনি।'

জবাব না দিয়ে এস্টেলা হেসে উঠলো খিল খিল ক'রে। হাসির কথা কী বলেছি আমি বুঝতে পারলাম না। সংকোচের সাথে

বললাম :

'আমার কথা হলে তুমি এভাবে হাসতে না, এটাই কি ধরে নেবো ?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমি হাসছি ওদের ব্যর্থতা আর অন্তর্জ্বালার কথা ভেবে। উহ! এই লোকগুলো কী যে করে মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে! ওদের দুরবস্থার কথা কল্পনা ক'রে আমি না হেসে পারি না। দুটো কথা আমি তোমাকে বলছি। প্রথমত, যত চেষ্টাই করুক, মিস হ্যাভিশ্যামের মনে তোমার যে আসন তা থেকে ওরা কিছুতেই তোমাকে টলাতে পারবে না, বিন্দুমাত্রও পারবে না। দ্বিতীয়ত; ওরা যে তোমার পেছনে ওদের সব শক্তি নিয়োগ ক'রেও পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে এজন্যে আমি—আমি খুব খুশি।'

বলে ও খেলার ছলে একটা হাত রাখলো আমার সামনে। হাতটা ধরলাম আমি। তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম।

'বোকা ছেলে!' বললো এস্টেলা। 'আমার সাবধানবাণী মনে নেই? নাকি আমি একদিন যে আবেগে তোমাকে আমার গালে চুমু খেতে দিয়েছিলাম সেই একই আবেগে আজ আমার হাতে চুমু খেলে?'

'কী সেই আবেগ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি একটু। হ্যাঁ, সেই আবেগের নাম চাটুকার আর ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা।'

'যদি বলি হ্যাঁ, আজ আবার চুমু খেতে পারবো তোমার গালে?'

'প্রশ্নটা হাত ধরার আগেই করা উচিত ছিলো।...ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা হলে খেতে পারো।'

আমি সামনে ঝুঁকে ঠোঁট ছোঁয়ালাম ওর শান্ত গালে। সঙ্গে

সঙ্গে মুখটা পিছিয়ে নিয়ে ও রুক্ষস্বরে বললো, 'কথা ছিলো তুমি আমার খবরদারি করবে, একটু চা খাইয়ে পৌঁছে দেবে রিচমণ্ডে।'

সেদিন বাগানে হাঁটার মতো অবস্থা আজও। এই এক রূপ পরক্ষণে আরেক রূপ এস্টেলার। আমি যেন ওর খেলার পুতুল। ইচ্ছে হলো, আদর করলো; আবার ইচ্ছে হলো, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ওর মনে আসলে কী আছে কী ক'রে জানতে পারবো আমি?

ঘন্টা বাজাতেই পরিচারক এলো। চা দিতে বললাম তাকে।

চা খেয়ে নিচে নেমে এলাম আমরা। সেই পরিচারককে দিয়েই গাড়ি ডাকিয়ে আনলাম। এস্টেলার মালপত্র ওঠানো হলো। তারপর সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে, পরিচারককে বকশিশ দিয়ে আমরা রওনা হয়ে গেলাম রিচমণ্ডের পথে।

গাড়িতে ওঠার পর আবার সহজ এস্টেলা। শহরের নানা জায়গা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এটা কী, ওটা কী। আমি জবাব দিয়ে গেলাম। হ্যামারস্মিথ দিয়ে যখন যাচ্ছি মিস্টার ম্যাথ্যু পকেটের বাড়ি দেখালাম ওকে। বললাম:

'এখান থেকে বেশি দূরে নয় রিচমণ্ড, মাঝে মাঝে যদি তোমাকে দেখতে যাই অসুবিধা হবে না তো?'

'কিসের অসুবিধা? নিশ্চয়ই আসবে, যখন খুশি। আমি তোমার কথা বলে রাখবো ও বাড়িতে।'

'অনেক লোক নাকি ওখানে?'

'না। দু'জন মাত্র। মা আর মেয়ে।'

'আমার অবাক লাগছে মিস হ্যাভিশ্যাম এত তাড়াতাড়ি আবার তোমাকে কাছছাড়া করলেন!'

'আমাকে নিয়ে মিস হ্যাভিশ্যামের যে পরিকল্পনা এটা তারই অংশ, পিপ,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো এস্টেলা।

এই প্রথম ও আমার নাম ধরে ডাকলো। আমার ধারণা এটা ও ইচ্ছে ক'রেই করেছে। কারণ ও জানে এ ডাকটুকু আমার হৃদয়ে একটা সম্পদ হয়ে রইবে।

গন্তব্যে পৌঁছুলাম আমরা। এস্টেলা তার নতুন আবাসে প্রবেশ করলো। আমি লণ্ডনে ফিরে এলাম শূন্যমনে।

## সতের

আমার খরচের হাত কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। ভবিষ্যতে কোনো এক সময় প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবো এবং তখন সব শোধ ক'রে দিতে পারবো এই আশায় এস্তার ধার করছি। আমার পাল্লায় পড়ে হ্যারবার্টেরও এক অবস্থা। আয় রোজগার শুরু করার আগ পর্যন্ত শাদাসিধে জীবনযাপনের সংকল্প ভেসে গেছে। ওরও ধারের পরিমাণ আমার মতোই বেড়ে চলেছে।

এ নিয়ে রোজই নানা জল্পনা কল্পনা হয়, ব্যয়-সংকোচের অনেক পরিকল্পনা করি। কিন্তু কাগজে কলমে থেকে যায় সব, কাজে পরি-

গত করা হয় না একটাও।

এমনি যখন অবস্থা তখন এক সন্ধ্যায় আমার নামে একটা চিঠি এলো। লিখেছে আমাদের শহরের 'ট্র্যাব অ্যাণ্ড কোম্পানি'। চিঠির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত: আমার বোন মারা গেছে গত সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা বেজে বিশ মিনিটের সময়। আগামী সোমবার তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, আমি যেন অনুগ্রহ ক'রে তাতে যোগ দেই।

এই প্রথম আমার মসৃণ জীবন পথে একটি কবরের মুখ খুললো।

যখন ছোট ছিলাম সন্দেহ নেই আমার বোন আমাকে আদরের চেয়ে শাসনই করেছে বেশি। কখনো কখনো সে শাসন মাত্রা ছাড়িয়েও গেছে। তবু আজ তার মৃত্যুসংবাদ গভীর এক আঘাত হয়ে বাজলো আমার বুকে। তার জন্যে আমার মনে একটুও যে নরম কোণ ছিলো তা টের পেলাম এই প্রথম।

পরদিনই জো-র কাছে একটা চিঠি পাঠালাম দুঃখ ও শোক প্রকাশ ক'রে। এবং সোমবার ভোরের কোচে রওনা হয়ে গেলাম বাড়ির পথে। শহরে কোচ থেকে নেমে হেঁটে চললাম গ্রামের দিকে।

সুন্দর গ্রীষ্মের দিন। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছে ছোটবেলার কত স্মৃতি। প্রতিটার সাথে জড়িয়ে আছে আমার বোন—বিশেষ ক'রে তার দুর্ব্যবহার, নির্দয় আচরণ। সেসব স্মৃতি আজ কোনো রকম ক্রোধ বা ক্ষোভ জাগাচ্ছে না আমার মনে। বরং বোনের ব্যথায়, সে নেই এই বেদনায় টন টন ক'রে উঠছে বুকের ভেতরটা।

বাড়ি পৌঁছে দেখলাম শবযাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন ক'রে ফেলেছে 'ট্র্যাব অ্যাণ্ড কোম্পানি'। শবযাত্রায় যারা অংশ নেবে

তাদের বেশিরভাগেরই পরনে কালো পোশাক। জো-কে দেখলাম কালো একটা আলখাল্লা আর থুতনীর নিচে বিরাট একটা কালো বো লাগিয়ে বসে আছে বসার ঘরে। আমি ওর কাছে গিয়ে ভারাক্রান্ত স্বরে বললাম :

'কেমন আছো, জো ?'

'পিপ বাবু,' দু'হাতে আমার হাত ধরে জো বললো, 'তুমি তো জানো কত সুন্দর, কত ভালো ছিলো—' আর কিছু বলতে পারলো না ; কান্নায় বুঁজে এলো ওর গলা।

আমি পৌঁছানোর একটু পরেই শুরু হলো শবযাত্রা। আমার বাবা, মা এবং পাঁচ ভাইয়ের কবরের পাশে কবর দেয়া হলো আমার বোনকে।

বাড়ি এসে জো, বিডি আর আমি একসাথে বসে খেলাম। খাওয়ার সময় আবার যেন নতুন ক'রে টের পেলাম বোনের অভাব। চিরদিনই এবাড়িতে রান্নাঘরে বসে খাওয়া দাওয়া হয়, আজ বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটায় বসে খেলাম। তিনজনই কেমন এক আড়ষ্টতার ভেতর খাওয়া শেষ করলাম। পুরনো দিনের মতো সহজ হতে পারলাম না কেউ। তিনজন অপরিচিত যেন ঘটনাচক্রে এক জায়গায় হয়েছি। আমি এখন ভদ্রলোক বলেই সম্ভবত এমনটা হলো।

খাওয়ার পর জো-কে নিয়ে আমি ওর কামারশালায় গেলাম। বাইরের বড় একটা পাথরে বসলাম দু'জন। এবার অনেকখানি সহজ মনে হলো জো-কে। আমি ওকে বললাম, রাতে আমি আমার পুরনো চিলেকোঠার ঘরে ঘুমানোর সুযোগ পেলে খুশি হবো। শুনে খুবই খুশি হলো জো।

সন্ধ্যায় বিডিকে নিয়ে বাগানে গেলাম বেড়াতে। আসলে বেড়ানোর ছলে ওর সাথে কিছু আলাপ করা আমার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর আমি বললাম :

'বিডি, দুঃসংবাদটা জানিয়ে তুমি তো একটা চিঠি লিখতে পারতে।'

'কে জানে? আমার মনে পড়েনি,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো বিডি।

'আমাকে ভুল বুঝো না, বিডি, মনে পড়াটা উচিত ছিলো না কী?'

'কে জানে?' এবারও ও এমন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথা বললো যে আমার আর এ নিয়ে কথা বাড়াতে ইচ্ছে হলো না। অন্য প্রসঙ্গ তুললাম :

'এখানে তো আর বোধহয় তোমার থাকা চলবে না, বিডি?'

'হ্যাঁ। মিসেস হাব্‌ল-এর সঙ্গে কথা হয়েছে, কালই আমি ওবাড়িতে চলে যাবো। ওখান থেকে আমরা দু'জনে যথাসম্ভব দেখা-শোনা করবো মিস্টার গারগেরির।'

'তোমার দিন চলবে কী ক'রে, বিডি? কিছু টা—'

'দিন চলবে কী ক'রে? শোনো, মিস্টার পিপ, গ্রামে নতুন যে স্কুলটা হচ্ছে তাতে চাকরি নেবো ঠিক করেছি। গ্রামের সবাই আমার জন্যে সুপারিশ করবে বলেছে। সুতরাং আমার জন্যে তোমার না ভাবলেও চলবে।'

এদিক থেকেও বিডি নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে ফেলেছে, কারো অপেক্ষায় থাকেনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর আবার ফিরে এলাম বোনের প্রসঙ্গে :

'ওর মৃত্যু সম্পর্কে ভালো ক'রে কিছু শোনা হলো না এখনও,

বিডি।'

'শোনার বিশেষ কিছু নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই অবস্থা খারাপ যাচ্ছিলো। মৃত্যুর দিন চায়ের সময় অনেক কষ্টে একবার "জো" উচ্চারণ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে কামারশালা থেকে ডেকে আনলাম মিস্টার গারগেরিকে। তাঁর ইঙ্গিতে তাঁর হাত দুটো মিস্টার গারগেরির গলায় তুলে দিলাম। মিস্টার গারগেরির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন তিনটে শব্দ—"জো···ক্ষমা···পিপ।" তারপরই তাঁর মাথাটা ঢলে পড়লো এক দিকে। আর সোজা হয়নি সে মাথা।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বিডি। আমারও দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

'কে ওকে আঘাত করেছিলো তার কিছুই জানা যায়নি?'

'না।'

'অরলিক এখন কী করে জানো?'

'পোশাক আশাক দেখে মনে হয় কোনো পাথরের খনিতে কাজ করে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ আমরা। তারপর বিডি বলতে লাগলো, জো আমাকে কতটা ভালোবাসে, ওর মনটা কেমন কোমল, মানুষ হিশেবে ও কেমন খাঁটি, ওর মুখে এখন পর্যন্ত একটা অভিযোগও শোনেনি সে কারো বিরুদ্ধে—আমার কথা স্পষ্ট ক'রে না বললেও বুঝতে অসুবিধা হলো না এই "কারো"টা কে।

'সত্যিই জো-র মতো মানুষ হয় না,' আমি বললাম। 'এখন থেকে মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাবো।'

বিডি চুপ।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, বিডি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পাচ্ছি!'

'তাহলে চুপ ক'রে আছো যে?'

'ভাবছি।'

'ভাবছো?'

'হ্যাঁ ভাবছি, কথাটা তুমি বুঝেশুনে বললে কিনা।'

'ওহ্, বিডি! এমন বাঁকা ক'রে কথা বলতে পারো তুমি! আমাকে বিশ্বাস করো না?'

কোনো জবাব দিলো না বিডি।

পরদিন ভোরে রওনা হলাম লণ্ডনের পথে। তার আগে বিদায় নিলাম জো আর বিডির কাছ থেকে। জো-কে বললাম, এখন থেকে মাঝে মাঝে এসে আমি ওকে দেখে যাবো। বিডির মতো নিরাসক্ত মুখে শুনলো জো, তবে করমর্দন করলো আন্তরিকভাবে। বিডিকে বললাম:

'তোমার কালকের কথায় আমি রাগ করিনি, তবে দুঃখ পেয়েছি।'

'না, তুমি কেন দুঃখ পাবে?' করুণ মুখে বললো বিডি, 'যত দুঃখ সব আমারই থাক।'

ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে চললাম আমি। ধোঁয়ার মতো কুয়াশা উঠে যাচ্ছে ওপরে, আর যেন আমার কানে কানে বলছে, "বিডি ঠিকই বলেছে, তুমি আর আসবে না।"

আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, বিডির মতো কুয়াশারাও ঠিকই বলেছিলো।

হারবার্ট আর আমার অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে।

ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

এর ভেতরই আমার বয়স একুশ বছর পূর্ণ হলো। হারবার্টের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণ ক'রে কোথায় আছি টের পাওয়ার আগেই আমি সাবালক হয়ে গেলাম। হারবার্ট সাবালক হয়েছে আরো আট মাস আগে। তখন থেকেই আমরা তাকিয়ে আছি এদিনটির দিকে। সাবালকত্ব লাভ করার পর নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলবেন।

জন্মদিনের আগেরদিন মিস্টার ওয়েমিকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, আমি যেন পরদিন বিকেল পাঁচটায় মিস্টার জ্যাগার্সের সাথে দেখা করি তাঁর অফিসে।

যথা সময়ে উপস্থিত হলাম মিস্টার জ্যাগার্সের ওখানে। মাসটা নভেম্বর। আমার অভিভাবক দাঁড়িয়ে আছেন আগুনের সামনে। দু'হাত পেছনে, কোটের নিচে।

'এসো, মিস্টার পিপ,' আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। 'আজ থেকে আর শুধু পিপ বলা চলবে না তোমাকে। অভিনন্দন নাও আমার।'

করমর্দন করলাম আমরা। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

'বসো, মিস্টার পিপ,' বললেন মিস্টার জ্যাগার্স।

বসলাম আমি। আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অভিভাবক। যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন কিছু। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে।

'তোমার সাথে কয়েকটা কথা আছে আমার, মিস্টার পিপ।'

'বলুন, স্যার।'

'তোমার মাসিক খরচা কত?'

থতমত খেয়ে আমি এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, 'ঠিক, বলতে পারবো না।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। যাক, তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি; এবার বলো তোমার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা?'

'আছে, স্যার। কিন্তু, আপনার নিষেধাজ্ঞা—'

'একটা করতে পারো।'

'আমাকে যিনি টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছেন তার পরিচয়টা কি আজ জানতে পারবো?'

'না। অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে করো।'

'শিগগির? তাঁর পরিচয় জানতে পারার কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'এ প্রশ্নও চলবে না। অন্য কিছু থাকলে করো।'

'আমার কি কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আজ?'

'এ প্রশ্নটাই তুমি প্রথম করবে ভেবেছিলাম।' দরজা খুলে সামনের কামরা থেকে মিস্টার ওয়েমিককে ডাকলেন তিনি। ওয়েমিক একটা কাগজ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

'মিস্টার পিপ,' বলে চললেন জ্যাগার্স, 'ওয়েমিকের হিশেবে দেখা যাচ্ছে, মাসে মাসে তুমি বেশ দরাজ হাতে টাকা নিচ্ছো তার কাছ থেকে। তার পরও তোমার বাজারে দেনা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তোমার দেনার পরিমাণ কত তা জিজ্ঞেস করবো না, কারণ আমার ধারণা তুমি নিজেও তা জানো না; জানলেও বলতে কিনা

সন্দেহ, বললেও হয়তো কমিয়ে বলতে।'

আমি তাঁর শেষ দুটো কথায় আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি ওরকম বলতে না এ-ই তো বলতে চাইছো? কিন্তু, কিছু মনে কোরো না, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার চেয়ে এসব ব্যাপার আমি অনেক ভালো জানি। এবার, এই কাগজটা নাও তোমার হাতে। নিয়েছো? বেশ, এবার ভাঁজ খুলে আমাকে বলো, কী ওটা?'

'পাঁচশো পাউণ্ডের একটা নোট।'

'হ্যাঁ, পাঁচশো পাউণ্ডের একটা নোট। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'এই মোটা অঙ্কের টাকাটা তোমার জন্মদিনের উপহার। এছাড়া এখন থেকে প্রতিবছর এই পরিমাণ টাকাই তুমি পাবে, যতদিন না দাতা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করছেন। প্রতি তিন মাস অন্তর একশো পঁচিশ পাউণ্ড ক'রে তুলে নেবে তুমি ওয়েমিকের কাছ থেকে, এবং এ দিয়েই তোমাকে চালাতে হবে তিন মাস। আমার ওপর এটাই আমার মক্কেলের নির্দেশ।'

মুক্তকণ্ঠে আমি ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছিলাম আমার দাতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মিস্টার জ্যাগার্স আমার গলা টিপে ধরলেন যেন।

'উঁহুঁ, মিস্টার পিপ,' বললেন তিনি, 'ধন্যবাদ যাকে জানানোর তার সামনেই জানিও। তোমার কথা কারো কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না।'

চুপসে গেলাম আমি। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলাম:

'একটা প্রশ্ন করলে অপরাধ হবে না তো?'

'কী প্রশ্ন?'

'আপনার এই মক্কেল, মানে আমার এত উপকার করছেন যিনি, তাঁর কি শিগগিরই লণ্ডনে আসার বা আমাকে ডেকে পাঠানোর কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'প্রথম দিন তোমাদের বাড়িতে কী বলেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে, মিস্টার জ্যাগার্স। বলেছিলেন তাঁর আত্মপ্রকাশ করতে দশ বা বিশ বছরও লেগে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর সেটাই। শোনো, মিস্টার পিপ, যেদিন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন—কবে জানি না—সেদিন সব কথা তোমরা সরাসরি আলাপ করবে। মাঝখানে আমি থাকবো না। তোমার যত প্রশ্ন সব জমিয়ে রাখো সেদিনের জন্যে। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারবো না।'

শুনে আমার মনে হলো, মিস হ্যাভিশ্যাম যেকোনো কারণেই হোক আমার সাথে এস্টেলার একটা সম্পর্ক যে তিনি গড়তে চান তা জানাননি জ্যাগার্সকে।

মিস্টার জ্যাগার্সের কামরা থেকে বেরিয়ে মিস্টার ওয়েমিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচশো পাউণ্ডের নোটটা হাতে পেয়েই একটা বুদ্ধি খেলে গেছে আমার মাথায়।

'মিস্টার ওয়েমিক, একটা ব্যাপারে আপনার একটু পরামর্শ চাই, বললাম আমি। 'আমার এক বন্ধু ব্যবসা করতে চায়, কিন্তু টাকা নেই তার। আমি কিছু টাকা দিতে চাই তাকে ব্যবসা শুরু করার জন্যে।'

নগদ?'

'হ্যাঁ।'

'তার চেয়ে টাকাগুলো টেমসে ফেলে দিন।'

'এই আপনার পরামর্শ?'

'হ্যাঁ, বন্ধুকে ব্যবসার জন্যে টাকা দেয়া আর টাকা পানিতে ফেলে দেয়া এক কথা।'

'এ-ই আপনার পরামর্শ, মিস্টার ওয়েমিক?' আবার আমি বললাম।

'হ্যাঁ। এই অফিসে এ-ই আমার পরামর্শ।'

'কিন্তু আপনার ওয়ালওয়ার্থের প্রাসাদে গিয়ে যদি চাই পরামর্শ?'

'সে আলাদা কথা, মিস্টার পিপ। বাড়ি আর অফিস এক নয়, যেমন আমার বুড়ো বাবা আর মিস্টার জাগার্স এক নন। তেমনি দু'জায়গায় বসে দেয়া পরামর্শও দু'রকম। অফিসে বসে যে পরামর্শ দেবো বাড়িতে তা দেবো না, বাড়িতে বসে যেটা দেবো অফিসে তা দেবো না।'

'বেশ, তাহলে আপনার বাড়িতেই একদিন যাবো।'

'নিশ্চয়ই, যখন খুশি আপনার!'

# আঠারো

পরের রোববারই বিকেল বেলা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম মিস্টার ওয়েমিকের 'দুর্গ-প্রাসাদে'। বাইরে থেকেই দেখলাম পতাকাদণ্ডে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। ঝুলসেতু ওঠানো (অর্থাৎ টানা ভেতর দিকে)। ফটকের ঘণ্টা বাজাতেই মিস্টার ওয়েমিকের বৃদ্ধ পিতা এসে আমাকে ভেতরে ঢোকালেন। বৃদ্ধের কাছে জানলাম তাঁর ছেলে বাড়িতে নেই, এসে পড়বে যেকোনো সময়। অগত্যা তাঁর সাথেই খানিকক্ষণ গল্প করতে হলো। কানে খাটো মানুষের সাথে বেশিক্ষণ আলাপ চালানো যে কী দুরূহ কাজ তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আজ।

সন্ধ্যার সামান্য আগে বাড়ি ফিরলেন মিস্টার ওয়েমিক। তাঁর সাথে এক মহিলা—মিস স্কিফিনস। কাঠ কাঠ চেহারা, পোশাক পরিচ্ছদও তেমন, পারিপাট্যের অভাব। কাজ করেন এক পোস্ট-অফিসে। বয়েসে বছর দু'তিনেকের ছোট হবেন মিস্টার ওয়েমিকের চেয়ে।

তাঁর চলাফেরা, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো প্রায়ই না হলেও

অন্তত রোববারগুলোতে তিনি আসেন এখানে। মিস্টার ওয়েমিক ও তাঁর বাবাকে সঙ্গ দেন। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হলো, মহিলা বোধহয় মিস্টার ওয়েমিকের ভাবী বধূ।

মিস স্কিফিনস চায়ের আয়োজন করতে লাগলেন। মিস্টার ওয়েমিক আর আমি বাইরে এসে হ্রদের পাশের কুঞ্জে বসলাম। মিস্টার ওয়েমিককে আমি মোটামুটি সবিস্তারে বললাম হারবার্টের জন্যে আমি কতটা অনুভব করি, হারবার্ট আমার কেমন বন্ধু, এবং আমার জন্যে ও আজ কী দুর্দশায় পড়েছে (আমার বিশ্বাস আমার সাথে পরিচয় না হলে আজ বাজারে এত দেনা থাকতো না হারবার্টের, মন দিয়ে ও নিজের কাজ করতো বা শিখতো ফলে হয়তো এতদিনে আয় রোজগার শুরু করতে পারতো)। এরপর আমি তাঁকে বললাম আমার পরিকল্পনার কথা, কীভাবে সাহায্য করতে চাই হারবার্টকে।

'সেদিন যে টাকা পেয়েছি তা থেকে আপাতত একশো পাউণ্ড দিতে চাই হারবার্টকে,' বললাম আমি। 'সরাসরি ওকে না, ওর পক্ষ থেকে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেবো টাকাটা, ব্যবস্থা করবেন আপনি। যদি দেখি টাকা দিয়ে কাজ হচ্ছে তাহলে ভবিষ্যতেও প্রতি বছর অন্তত শ'খানেক পাউণ্ড ক'রে দিয়ে যাবো। যাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের ছোটখাটো একটা অংশীদারী ও লাভ করতে পারে। আপাতত টাকাটা যে প্রতিষ্ঠানে খাটবে তারা ওকে চাকরি দেবে। কিন্তু একটা কথা, মিস্টার ওয়েমিক, ও যে টাকা খাটানোর বিনিময়ে চাকরি পাচ্ছে বা টাকাটা যে আমি দিচ্ছি এসব কথা যেন কোনোমতে জানতে না পারে হারবার্ট। ভীষণ আত্মসম্মান জ্ঞান ওর, মরে গেলেও কারো দয়া গ্রহণ করবে না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন

আমার কথা।'

'হ্যাঁ, মিস্টার পিপ, কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়, মিস্টার ওয়েমিক, হ্যারবার্টের জন্যে এটা আমি করতে চাই। আপনি সাহায্য করবেন কিনা বলুন।'

মাথা নাড়লেন ওয়েমিক। 'সাহায্য করাটা আমার পেশা নয়।'

'এটা আপনার পেশাগত দায়িত্ব পালনের জায়গাও নয়।'

'তা ঠিক, তা ঠিক, পেরেকের একেবারে মাথায় ঘা দিয়েছো, মিস্টার পিপ। ঠিক আছে, ভেবে দেখি কী করা যায়।'

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মিস্টার ওয়েমিকের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, মিস স্কিফিনসের ভাইয়ের সহায়তায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি বেশ কিছুদূর এগিয়েছেন ব্যাপারটা নিয়ে। আমি যেন তাঁর সাথে আরেকবার দেখা করি, অবশ্যই তাঁর বাসায় অফিসে নয়।

সেদিনই গেলাম আমি। তারপর আরো কয়েক দিন গেলাম। এর ভেতর অফিস সময়ের বাইরে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হলো মিস্টার ওয়েমিক বা মিস্টার স্কিফিন্‌স-এর সাথে। অবশেষে একদিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম আমি তরুণ এক ব্যবসায়ীর সাথে। আমদানী রপ্তানী তার ব্যবসা। খুব বেশিদিন হয়নি নেমেছে। পুঁজি এবং বুদ্ধিমান সহযোগী দুটোরই প্রয়োজন আছে তার। এখন যে তার ব্যবসায়ে টাকা খাটাবে তাকে যথাসময়ে অংশীদার ক'রে নিতেও তার আপত্তি নেই। টাকাটা যে সে আমার কাছ থেকে পাচ্ছে এব্যাপারটাও সে খুশি মনেই গোপন রাখতে রাজি।

পুরো ব্যাপারটা এমন কৌশলে সারা হলো যে হ্যারবার্ট বিন্দুমাত্র

সন্দেহ করতে পারলো না। চুক্তিপত্র সই হওয়ার দিন দুই পর এক সন্ধ্যায় হারবার্ট আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে ফিরলো বার্নার্ড'স ইন-এ। বললো, ক্ল্যারিকার (তরুণ ব্যবসায়ীর নাম) নামের এক আমদানী-রপ্তানীকারকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে আজ ওর পরিচয় হয়েছে। লোকটা ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই নাকি এমন মুগ্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে ওকে চাকরি দিতে চেয়েছে তার প্রতিষ্ঠানে এবং জানিয়েছে দক্ষতা দেখাতে পারলে একদিন তার ব্যবসার অংশীদার হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে ওর। এবার ওর ভাগ্যের পরিবর্তন হবে নিশ্চয়ই। একটা সুযোগ যখন এসেছে এটাকে সে কাজে লাগাবে যে ক'রেই হোক।

ওর আনন্দে আমিও অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করলাম। রাতে বিছানায় শুয়ে হারবার্টকে এতখানি খুশি করতে পেরেছি ভেবে আমি না কেঁদে পারলাম না।

লণ্ডনে বার্নার্ড'স ইন-এ বা হ্যামারস্মিথে মিস্টার পকেটের বাড়িতে —যেখানেই থাকি না কেন আমার মন পড়ে থাকে রিচমণ্ডে, মিসেস ব্র্যাণ্ডলির বাড়িতে, যেখানে এস্টেলা থাকে। মিসেস ব্র্যাণ্ডলি বিধবা। একটা মাত্র মেয়ে তাঁর, এস্টেলার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। মা মেয়ের চেহারা স্বভাব একেবারে উল্টো একজনের অন্যজনের থেকে। মা-কেই মনে হয় মেয়ে আর মেয়েকে মা। সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এঁদের। প্রায়ই তাঁরা এস্টেলাকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে, বন-ভোজনে, থিয়েটারে, নাচের আসরে যান। তাঁদের বাড়িতেও মাঝে মাঝে বসে এধরনের আসর অনুষ্ঠান। প্রচুর লোক—বিশেষ ক'রে তরুণ-তরুণী আসে। কখনো

কখনো আমারও ডাক পড়ে। নিজে যেচেও যাই কখনো কখনো।

কিন্তু এতে আমার আনন্দের চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই হয় বেশি। এস্টেলার সঙ্গে দেখা হয়, একজন আরেকজনকে নাম ধরে ডাকি। কিন্তু কখনোই ওর নিবিড় সান্নিধ্য পাই না। আমার সাথে ও সব সময় কেমন একটা উদাসীন দূরত্ব রেখে চলে। এদিকে ওর ভক্ত-স্তাবকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাদের সাথে ওর আচরণ আমার চাইতে অনেক অনেক বেশি অমায়িক, ঘনিষ্ঠ। এটাই আমার কাছে বিশেষ ক'রে অসহ্য লাগে। এ নিয়ে ওকে কিছু বলতে গেলেই ও এমন ভাব করে বা এমন সব কথা বলে, মনে হয়, বাধ্য করা হচ্ছে বলেই ও মিশছে আমার সাথে; মেলামেশার ব্যাপারে যদি স্বাধীনতা থাকতো, কখনোই ও আমাকে আমল দিতো না। মাঝে মাঝে অবশ্য এই মুখোশ খুলে ফেলে ও যে আমার সাথে আন্তরিক আচরণ করে না তা নয়। তবে তা কদাচিৎ।

একদিন ও আমাকে দেখা করার জন্যে খবর পাঠালো। মনে যত অভিমানই জমা হোক ওর আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই। গেলাম রিচমণ্ডে। কিছুক্ষণ টুকটাক আলাপের পর ও বললো:

'পিপ, তুমি কি পণ করেছো, কিছুতেই শুনবে না আমার সাবধানবাণী?'

'কোন ব্যাপারে?'

'আমার ব্যাপারে।'

'মানে তোমার পেছনে যেন সময় নষ্ট না করি, এই তো বলতে চাইছো?'

'কী বলতে চাইছি যদি না বুঝতে পারো, তুমি অন্ধ।'

প্রেম চিরকালই অন্ধ—এই জবাবই এসেছিলো মুখে। কিন্তু ও না বলে শুধু বললাম, 'আজ তো তুমিই আসতে বলেছো।'

'তা ঠিক,' শীতল একটু হেসে বললো এস্টেলা। 'আজ আমিই আসতে বলেছি। কেন জানো? অবশেষে মিস হ্যাভিশ্যামের আবার দেখার ইচ্ছা হয়েছে আমাকে। জানিয়েছেন, আমি যেন শিগগিরই তাঁর কাছে যাই একবার। উনি চান না আমি একা যাই। তুমি কি পারবে আমাকে নিয়ে যেতে?'

'এটা একটা জিজ্ঞেস করার মতো কথা হলো?'

'তার মানে পারবে। তাহলে পরশুদিন যাবো, যদি তোমার অসুবিধা না হয়। কিন্তু একটা শর্ত: খরচ খরচা যা হবে সব আমার থলে থেকে।'

'তাই হবে।'

যথাসময়ে আমরা পৌঁছুলাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে। এবার যেন তিনি আরো বেশি আদর করতে লাগলেন এস্টেলাকে, আরো বেশি কাছে টানতে লাগলেন। ওর সামনেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ও আমার সাথে কেমন ব্যবহার করে। আর কার কার সাথে এস্টেলার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে সে খবরও নিলেন তিনি, এস্টেলার কাছ থেকেই।

এদিনই সন্ধ্যায় মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে এস্টেলার তুমুল এক ঝগড়া হয়ে গেল।

দুপুরের মতোই আমরা আগুনের সামনে বসে আছি। মিস হ্যাভিশ্যাম আঁকড়ে ধরে আছেন এস্টেলার দু'হাত। ওকে আরো কাছে টানার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু এস্টেলা কিছুতেই আর ঘনিষ্ঠ

হতে চাইছে না। ভাবখানা, হাত ধরে আছো এ-ই নিয়ে থাকো, গায়ের ভেতর টানাটানি কেন? কয়েকবার চেষ্টা ক'রেও যখন ব্যর্থ হলেন, আগুনের মতো জ্বলে উঠলো মিস হ্যাভিশ্যামের চোখ দুটো।

'কী! আমাকে আর ভালো লাগছে না?' কেমন এক হিসহিসে স্বরে চিৎকার করলেন তিনি।

'না, ঠিক তা না,' বললো এস্টেলা, 'কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে।'

'সত্যি কথা বলো, অকৃতজ্ঞ মেয়ে! বলো যে আমার সঙ্গই তোমার কাছে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে!'

এস্টেলা শান্তভাবে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। এতে আরো রেগে গেলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'জড় পদার্থ! পাথর!' চিৎকার করলেন তিনি। 'হৃদয়হীন!'

'কী! আপনি আমাকে হৃদয়হীন বলছেন? আপনি?'

'হ্যাঁ, বলছি। তাছাড়া কী তুমি?'

'আপনার জানা উচিত আপনি আমাকে যা বানিয়েছেন আমি তা-ই,' শান্ত কণ্ঠে বললো এস্টেলা। 'এর জন্যে যা কিছু প্রশংসা বা ধিক্কার সবই আপনার পাওনা।'

'ওহ্! দেখ! দেখ!' কান্নাভেজা স্বরে চিৎকার করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'দেখ, কেমন অকৃতজ্ঞ! ছোটবেলা থেকে মানুষ করলাম, বুকে ক'রে আগলে রাখলাম, স্নেহ দিলাম, ভালোবাসা দিলাম; দেখ আজ তার পুরস্কার দিচ্ছে!'

'কে আপনাকে বলেছিলো আমাকে মানুষ করতে, জানি না। যাহোক, তবু আপনি করেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমার যা কিছু সব আপনার। আমার দোষ, গুণ, মন, প্রাণ সব আপনার।

আর কী চান ?'

'ভালোবাসা।'

'তা-ও আপনি পেয়েছেন।'

'না, পাইনি।'

'আপনি আমার পালক মা। যেভাবে আপনি আমাকে মানুষ করেছেন সেভাবেই আমি মানুষ হয়েছি। যা শিখিয়েছেন তা-ই শিখেছি। যা দিয়েছেন তা-ই মাথা পেতে নিয়েছি। আজ যা আপনি দেননি তা-ই যদি আমার কাছে দাবি করেন কী ক'রে আমি তা দেবো ?'

'তোমাকে আমি ভালোবাসা দেইনি ?' সাঁ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'আমি ওকে কখনো ভালোবাসা দেইনি, শুনলে। এর চেয়ে ও আমাকে পাগল বলুক। পাগল বলুক।'

'কেন আপনাকে আমি পাগল বলতে যাবো ?' বললো এস্টেলা। 'আমার চেয়ে কে বেশি জানে আপনার প্রতিটি কাজের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে ? আমার চেয়ে কে বেশি জানে, আপনি কোনোদিনই কোনো কথা ভুলে যান না ? এগুলো কি পাগলের লক্ষণ ?'

'তোমার জন্যে যা করেছি সব ভুলে গেলে এ কয়দিনে।' আর্ত-নাদের মতো শোনালো মিস হ্যাভিশ্যামের গলা।

'উঁহুঁ, কিছুই ভুলিনি। আপনার প্রতিটা কথা, প্রতিটা শিক্ষা হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। কবে আপনার কোন উপদেশ অমান্য করেছি ? কোন শিক্ষা অগ্রাহ্য করেছি ? আপনি যা চাননি কবে তা এখানে স্থান দিয়েছি ?' হাত দিয়ে নিজের বুক স্পর্শ করলো

এস্টেলা। 'আর যা-ই করুন, অবিচার করবেন না আমার ওপর।'

'এত অহঙ্কার!' দু'হাতে মাথার ধূসর চুলগুলো পেছনে নিতে নিতে চিৎকার করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'কে আমাকে অহঙ্কারী হতে শিখিয়েছে?'

'ওহ! কী মেজাজ!'

'কে আমাকে এমন মেজাজী ক'রে গড়ে তুলেছে?'

'তাই বলে আমাকেও তুমি দেখাবে সেই মেজাজ? ওহ, এস্টেলা! এস্টেলা! আমাকে তুমি মেজাজ দেখাচ্ছো? অহঙ্কার দেখাচ্ছো!'

এস্টেলা শান্ত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। তারপর আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললো:

'আমি বুঝি না কেন কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসার পর আপনি আমার সাথে এমন করেন। আমি তো কোনো দিনই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিনা, কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেইনা, যার জন্যে আপনি এমন করতে পারেন।'

'আমার ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে দেয়া দুর্বলতা?' চিৎকার করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ তো তা-ই বলবে!'

'আমি বুঝতে পারছি কেন আপনার ক্ষোভ,' বললো এস্টেলা, 'আপনার পালিতা কন্যাকে যদি পুরোপুরিই এবাড়ির অন্ধকারে রেখে মানুষ করতেন; কোনো দিন জানতে না দিতেন বাইরে আরেকটা দুনিয়া আছে, সেখানে সূর্যের আলো আছে, মুক্ত বাতাস আছে তাহলে বোধহয় আজ আপনাকে হতাশ হতে হতো না। আপনি যে অসম্ভব, অবাস্তবকে দাবি করছেন তা-ই পেতেন।'

মিস হ্যাভিশ্যাম কিছু বললেন না; শুনে গেলেন শুধু।

'আমাকে যেভাবে গড়া হয়েছে আমি সেরকমই হয়েছি,' বলে চললো এস্টেলা। 'আমার সাফল্য বা ব্যর্থতা কোনোটার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব আমার নয়।'

মিস হ্যাভিশ্যাম নিরুত্তর। কেমন একটা অবসন্ন, ভেঙে পড়া ভাব চেহারায়। মাটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন তিনি। এই সুযোগে আমি উঠে হাতের ইশারায় এস্টেলার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

ঘণ্টাখানেক উঠানে ঘোরার পর যখন সাহস ক'রে আবার ওঘরে ঢুকলাম, দেখি এস্টেলা শান্তভাবে মিস হ্যাভিশ্যামের পায়ের কাছে বসে সেলাই ক'রে দিচ্ছে তাঁর বিয়ের পোশাকের ছিঁড়ে যাওয়া একটা জায়গা। একটু আগের ঝগড়া, কথা কাটাকাটির চিহ্নমাত্র নেই দু'জনের কারো চেহারায়।

রাতটা আমি এবাড়িতেই কাটালাম। তবে মূল বাড়িতে নয়, উঠানের ওপাশে ছোট একটা দালান আছে সেটায়। এ-ই আমার প্রথম রাত কাটানো মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে।

পরদিন এস্টেলাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম লণ্ডনের পথে।

স্টারটপের অনুপ্রেরণায় আমরা—মানে আমি আর হারবার্ট 'ফিঞ্চেজ অভ দ্য গ্রোভ' নামের এক সংঘের সদস্য হয়েছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া আর সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। সদস্যরা সবাই তরুণ, সুতরাং যে কোনো বৈঠকেরই একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে মেয়েদের নিয়ে আলাপ।

আমাদের সেই মাথামোটা বেন্টলি ড্রামলও এই সংঘের সদস্য। এখানেই একদিন জানতে পারলাম এস্টেলার সাম্প্রতিক স্তাবক বা

ভক্তদের একজন ড্রাম্‌ল। প্রায়ই তারা একসাথে বেড়াতে যায়, থিয়েটার দেখে, নাচের আসরে নাচে।

একথা শোনার পর ভীষণ রাগ হলো আমার এস্টেলার ওপর। ড্রাম্‌ল অভিজাত বংশের ছেলে, প্রচুর টাকা পয়সার মালিক—এ-ই দেখে ভুললো ও! লোকটার বদ স্বভাবের কথা ভাবলো না একবারও!

এর কিছুদিন পরেই রিচমণ্ডে এক বল নাচ-অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো। মিসেস ব্র্যাণ্ডলি আর এস্টেলাকে নিয়ে যাওয়া এবং বাসায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর (এমন দায়িত্ব প্রায়ই পালন করতে হয় আমাকে)। এদিন দেখলাম সত্যি সত্যিই ড্রাম্‌লকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে এস্টেলা। পুরো অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ সময় ও নাচলো ওর সাথে এবং ওর এমন সব আচরণ সহ্য করলো যা সহ্য করা সত্যিই কষ্টকর কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে। অনুষ্ঠান শেষে এস্টেলাকে এক গুচ্ছ ফুলের পাশে একা বসে থাকতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম কাছে।

'ক্লান্ত, এস্টেলা?'

'হ্যাঁ, পিপ।'

'হওয়ারই কথা।'

'এখানেই রেহাই পেলে তবু বাঁচতাম,' বললো এস্টেলা, 'এখন আবার বাড়ি গিয়ে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সব বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখতে হবে মিস হ্যাভিশ্যামকে। তারপর যদি বিছানায় পিঠ দিতে পারি।'

'আজকের বিবরণটা যা হবে না!'

'মানে?'

'ঐ দেখ, এস্টেলা, আমাদের কথা শোনার জন্যে ঐ কোণে

কান খাড়া ক'রে আছে কে।'

'কী দরকার আমার দেখার?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন। কী দরকার ওকে তোমার দেখার? কেন আজ প্রায় সারাক্ষণ তোমার কাছে ঘুর ঘুর করতে দিলে ওকে?'

'আগুন দেখে আকৃষ্ট হওয়া পতঙ্গের স্বভাব। আগুন কী ক'রে বাধা দেবে?'

'আগুন বাধা দিতে পারে না, কিন্তু এস্টেলা ইচ্ছে করলেই পারে,' আমি বললাম।

'হয়তো পারে, কিন্তু ইচ্ছে করেই ও বাধা দিচ্ছে না।'

'এস্টেলা! এস্টেলা! ড্রাম্‌লের মতো নীচ স্বভাবের লোক তোমার প্রশ্রয় পায় আমি ভাবতেই পারি না।'

'তারপর?'

'ওর মতো মাথামোটা হৃদ্দ বোকা আর একটাও নেই দুনিয়াতে।'

'তারপর?'

'টাকাই ওর একমাত্র সম্বল, আর তাই দেখে তুমি ভুললে?'

'তারপর?'

এমন ভঙ্গিতে 'তারপর, তারপর' করছে এস্টেলা, রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠতে চাইছে। ও শেষবার 'তারপর' বলার পর আমি আর কিছু বললাম না। মনে হলো, আমার মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্যেই ড্রাম্‌লকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন এস্টেলা বললো:

'বোকামী করছো কেন, পিপ? ড্রাম্‌লকে প্রশ্রয় দিচ্ছি এতে অন্যের বুকে জ্বালা ধরতে পারে, তোমার ঈর্ষা হবে কেন?'

'আমি ওকে সহ্য করতে পারি না, এস্টেলা।'

'আমি পারি।'

'এত অহঙ্কার ভালো না, এস্টেলা!'

'তাহলে কী করতে বলো আমাকে?'

'তোমার সামান্য করুণাও আমি পাই না, অথচ ও না চাইতেই তা পাচ্ছে!'

'ওর মতো তোমাকেও বঞ্চনা করি তা-ই চাও?' গম্ভীর কণ্ঠে বললো এস্টেলা।

'ওকে তুমি শুধু বঞ্চনা করছো, ফাঁদে ফেলছো, এস্টেলা?'

'হ্যাঁ, শুধু ওকে নয়, আরো অনেককে—কেবল তোমাকে ছাড়া। মিসেস ব্র্যাণ্ডলি আসছেন। চলো এবার ওঠা যাক।'

মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে সেদিন উত্তেজিত হয়ে এস্টেলা যা বলেছিলো তার মর্ম যেন বুঝতে পারলাম আজ।

# উনিশ

দু'বছর কেটে গেছে তারপর। আমি এখন তেইশ বছরের যুবক। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা ধনসম্পত্তির আশা সম্পর্কে নতুন কোনো আভাস বা ইঙ্গিত এখনো পাইনি। অবস্থা যা ছিলো

তা-ই। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পরিবর্তনের মধ্যে বছরখানেক আগে বার্নার্ড'স ইন ছেড়ে আরেকটু উঁচু দরের টেম্পল ইন-এ উঠে এসেছি হারবার্টকে নিয়ে। হারবার্ট প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিনটা ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ। সারাদিন বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ার দাপট গেছে। সন্ধ্যার পরও তা কমেনি। বরং বেড়েই চলেছে। হারবার্ট ব্যবসার কাজে কয়েক দিনের জন্যে মার্সেই গেছে। আমি একা ঘরে বসে পড়াশোনা করছি। ঝড়ের দাপটে মাঝে মাঝে দরজা জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত এগারোটার দিকে আমি বই বন্ধ করলাম। এই সময় ঝড় বাদলের শব্দ ছাপিয়ে সিঁড়ি থেকে ভেসে এলো পায়ের আওয়াজ। দরজা খুলে দেখলাম সিঁড়ির বাতি নিবে গেছে বাতাসে। আমার পড়ার বাতিটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির মুখে। পদশব্দ থেমে গেল। নিশ্চয়ই লোকটা আমার আলো দেখতে পেয়েছে।

'সিঁড়িতে কেউ আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।'

'ক'তলায় যেতে চান?'

'একেবারে ওপরের তলায়। মিস্টার পিপের কাছে।'

'আমিই পিপ। কোনো দরকার আছে নাকি আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, একটু আছে।' ওপরে উঠে এলো লোকটা। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে পুরনো বন্ধুর মতো আমাকে আলিঙ্গন করলো দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

আমার বাতির ওপর দিকটায় ঢাকনি লাগানো থাকে শুধু বইয়ের ওপরই আলো পড়ে। সেজন্যে লোকটা যখন উঠে এলো

তার মুখ ভালো ক'রে দেখতে পেলাম না। যেটুকু দেখলাম তাতে অপরিচিতই মনে হলো। গরম, মোটা কাপড় পরনে। সাগর-ভ্রমণকারীদের মতো। মাথায় লম্বা ধূসর চুল। টুপির নিচ দিয়ে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে কাঁধের ওপর। বয়েস ষাটের ঘরে। তা সত্ত্বেও বেশ শক্ত সমর্থ লোকটা।

'কী দরকার আমার কাছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দরকার? আঁ—হ্যাঁ, বলছি।'

'ভেতরে আসবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম, তবে খুব একটা আন্তরিক কণ্ঠে নয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে যাবো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আগন্তুককে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম।

'আশপাশে কেউ নেই তো?' সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলাম না আমি।

'আছে, দরকার আছে। আহ্ কত বড় হয়েছো তুমি?'

কোট এবং টুপি খুলে একটা চেয়ারে বসলো লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমি। সেই ছোট্ট বেলায় গোরস্তানে দেখা আমার কয়েদী! আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো সে। দু'হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। কী করবো কিছু বুঝতে না পেরে আমিও দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাত দুটো শক্ত ক'রে ধরে রইলো আমার কয়েদী। তারপর আবার আমাকে আলিঙ্গন ক'রে চুমু খেলো।

'তুমি সেদিন যা উপকার করেছিলে আমার!' বললো সে।

'মহৎ পিপ। আমি সেদিনের কথা ভুলিনি।'

পাছে আবার জড়িয়ে ধরে এই ভয়ে আমি তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেলাম একটু। বললাম :

'ছেলেবেলায় কী ক'রেছিলাম তা মনে ক'রে যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসে থাকেন তাহলে বলবো, আপনি যদি আপনার জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলে থাকেন তাহলেই সে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়ে গেছে। তবু যখন আমাকে খুঁজে বের করেছেন এবং এসেছেন আমার কাছে, আমি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবো না। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমার—'

'হ্যাঁ বলো, কী বুঝবো?'

'আমার আর আপনার জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা, আমাদের ভেতর কোনো সম্পর্ক হতে পারে না।···আপনার জামাকাপড় সব ভিজে গেছে, ক্লান্তও দেখাচ্ছে আপনাকে। যাবার আগে কিছু পান করবেন?'

'হ্যাঁ, তা করবো, ধন্যবাদ।'

আমি একটা গ্লাসে রাম ঢেলে বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। এবং সবিস্ময়ে দেখলাম তার চোখে অশ্রু। গ্লাসটা নিলো সে কিন্তু মুখে তুললো না। এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম লোকটা যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এবার একটু নরম হলো আমার মন।

'আপনার মনে যদি কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি, দুঃখিত সেজন্যে,' বলতে বলতে নিজের জন্যে এক গ্লাস রাম ঢেলে নিলাম আমি। গ্লাসটা ঠোঁটে ছুঁইয়েছি এই সময় হাত বাড়িয়ে দিলো সে। আমার গ্লাসটা দিলাম তার হাতে। এবার সে পান করলো। একচুমুকে সবটুকু রাম শেষ ক'রে জামার হাতায় চোখ মুছলো।

'কী করছেন এখন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কৃষিকাজ, ভেড়া পালন, গো-প্রজনন, কী না?' এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নতুন দুনিয়ায় (অস্ট্রেলিয়ায়) এসব করে আমি প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেছি। সম্পদের জন্যে ওখানে এখন বিখ্যাত আমি।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'আমি জানতাম তুমি খুশি হবে।'

'আচ্ছা, অনেক দিন আগে আমার কাছে এক লোককে পাঠিয়েছিলেন মনে আছে? তার সাথে পরে আর দেখা হয়েছে আপনার?'

'না। দেখা হবার কথাও ছিলো না।'

'লোকটা আমাকে দুটো এক পাউণ্ডের নোট দিয়ে গিয়েছিলো। আমার তখনকার আর্থিক অবস্থায় ওদুটো আমার কাছে ছিলো মস্ত সম্পদ। পরে অবশ্য আমার অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি নোট দুটো ফেরত দিতে চাই, কোনো গরিব ছেলেকে দিয়ে দেবেন।'

থলে খুলে দুটো এক পাউণ্ডের নোট বের ক'রে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। নোট দুটো নিয়ে ভাঁজ করলো সে। তারপর আগুনে ফেলে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো:

'তোমার অবস্থার পরিবর্তন হলো কী ক'রে?'

'একজন আমাকে কিছু সম্পত্তি দেবেন।'

'কী ধরনের সম্পত্তি?'

'ঠিক জানি না।'

'কে দিচ্ছে?'

'তা-ও জানি না।'

'আচ্ছা, একটা অনুমান করি আমি, দেখ তো ঠিক হয় কিনা। সাবালক হওয়ার পর থেকে তোমার বার্ষিক আয় কত? প্রথম অঙ্কটা পাঁচ?'

এবার যেন কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি আমি। ভারি কোনো হাতুড়ির এলোমেলো আঘাত যেন পড়তে শুরু করেছে বুকের ভেতর। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ভয়ানকভাবে।

'তুমি যখন নাবালক,' বলে চললো লোকটা, 'তখন একজন অভিভাবক ছিলো তোমার, তাই না? ভদ্রলোক একজন আইন-জীবী বোধহয়। তাঁর নামের প্রথম অক্ষর "জে"?'

আর বুঝতে বাকি রইলো না আমার। মুহূর্তের মধ্যে সব সত্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সম্পত্তির উৎস তাহলে মিস হ্যাভিশ্যাম নন; এই লোকটা! অনেক বছর আগের সেই কয়েদীটা! শিউরে উঠলাম আমি।

'নামটা জ্যাগার্স হতে পারে তাই না?' বলে চলেছে আমার কয়েদী। 'কেমন ক'রে তোমার ঠিকানা পেলাম? ধরো পোর্টস-মাউথে নেমে লণ্ডনে চিঠি লিখেছি একজনের কাছে। ধরো সেই একজনটা ওয়েমিক।'

এতক্ষণ আমি একটা কথাও বলিনি। একটা চেয়ারের পেছন ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কখন যে ওটা ধরেছি জানি না। লোকটার শেষ কথাটা শুনে উদভ্রান্তের মতো তাকালাম তার দিকে। মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবো আমি। এগিয়ে এলো সে। দু'হাতে ধরে বসিয়ে দিলো চেয়ারটায়। বলে চললো:

'হ্যাঁ, পিপ, আমিই তোমাকে ভদ্রলোক বানিয়েছি। আমিই সব করেছি তোমার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে যদি একটা গিনিও উপার্জন করি সেটা যাবে তোমার কাছে। ভেবো না তোমার কৃতজ্ঞতা চাই বলে এসব বলছি। বলছি তোমাকে জানাতে চাই বলে। পরে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, প্রচুর সম্পদের মালিক হতে হবে আমাকে; সেই সম্পদে সম্পদশালী করবো তোমাকে। তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো, ভদ্রভাবে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

আমার কাঁধে হাত রাখলো সে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেলাম আমি।

'তুমি আমার ছেলের মতো, পিপ,' বলে যেতে লাগলো লোকটা, 'ছেলের চেয়ে বেশি। নতুন দুনিয়ায় যে অর্থ, যে সম্পদ আমি অর্জন করেছি সব তোমার। ওখানে ভেড়ার পাল চরাতে চরাতে তোমার কথা ভেবেছি আমি, পিপ, তোমার মুখ চোখের সামনে ভাসিয়ে রেখেছি সারাক্ষণ। মনে মনে জপেছি, "বড় লোক হতে পারলে তোমাকে আমি ভদ্রলোক ক'রে তুলবো।" আজ তোমার এই সুন্দর পোশাক, হাতে হিরের আংটি, পকেটে সোনার ঘড়ি, টেবিলে বই পত্র দেখে আমার কী যে আনন্দ লাগছে। মনে হচ্ছে, আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। এই সব বই তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে।'

আমার দু'হাত ধরে চুমু খেলো সে। আবার আমি কুঁকড়ে গেলাম তার স্পর্শে।

'আচ্ছা, কখনো তোমার মনে হয়নি তোমার অজ্ঞাত পরিচয় দাতা আমি হতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, না,' আমি বললাম, 'কক্ষনো না।'

'এখন তো জানলে। মিস্টার জ্যাগার্স আর আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না এতদিন।'

'আর কেউই ছিলো না এর ভেতর?'

'না। আর কে থাকবে? আহ্, কী সুন্দর হয়েছো তুমি। কী উজ্জ্বল চোখ—'

আমার কানে আর কিছু ঢুকছে না। মনের ভেতরটা হাহাকার করছে। ও এস্টেলা! এস্টেলা!

'ওখান থেকে আসা খুব সহজ হয়নি আমার পক্ষে,' একটু পরে শুনি লোকটা বলছে, 'উচিতও হয়নি। কিন্তু কী করবো, তোমাকে দেখবার জন্যে না এসেও পারলাম না। প্রচুর পরিশ্রম, ফন্দি-ফিকির করতে হয়েছে সেজন্যে।'

আমি কী বলবো বা করবো বুঝতে পারলাম না।

'আমাকে থাকতে দিচ্ছো কোথায়?' একটু পরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'দীর্ঘদিন আমি শুধু সাগরের হুলুনি খেয়েছি। এখন চাই একটু নিশ্চিন্ত ঘুম।'

'আমার বন্ধু এখন বাইরে,' বললাম আমি। 'ওর ঘরেই ঘুমাতে পারেন।'

'আজ কালের মধ্যে ফিরে আসবে না তো সে?'

'না।'

'বেশ তাহলে নিয়ে চলো ওর ঘরে। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন টের না পায় আমি আছি।'

'কেন? টের পেলে কী হবে?'

'মৃত্যু! ফাঁসি! বাকি জীবনের জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো ওখানে। পুলিস যদি টের পায় ফিরে এসেছি, নির্ঘাৎ ফাঁসি

দেবে আমাকে।'

হারবার্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে গেল সে। জানালার পর্দাগুলো ভালো ক'রে টেনে দিয়ে, বেরিয়ে এলাম আমি। দরজা ভিড়িয়ে দিলাম। আমার ঘরে এসে বসলাম আগুনের সামনে চেয়ার টেনে। মাথার ভেতর চিন্তার স্রোত, বইছে। আমার বর্তমান জীবনের সঙ্গে মিস হ্যাভিশ্যামের কোনো সম্পর্ক নেই। এস্টেলা এবং আমাকে নিয়ে কিছুই ভাবেননি তিনি! অথচ আমি কী সুন্দর স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম। আমাকে ডেকে পাঠানো, এস্টেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, ওকে ভালোবাসতে বলা, আমার সাথে লণ্ডনে পাঠানো—সব মিস হ্যাভিশ্যামের খেয়াল। পুরুষ জাতের ওপর তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার যে পরিকল্পনা তারই একটা অংশ মাত্র।

আর এই লোকটা! এক দিনের সামান্য উপকারের বিনিময়ে কি গভীর কৃতজ্ঞতা তার, আর তার প্রকাশও কী বিশাল, বিপুল। অন্য দিকে জো-র প্রতি আমার ব্যবহার! আমার মতো অকৃতজ্ঞ কেউ আছে? আজ আমার জো-র কাছে, বিডির কাছে যাওয়ার উপায় নেই। কোন মুখে যাবো? কিন্তু যদি যেতে পারতাম হয়তো ওদের সরল হৃদয়ের সহজ সান্নিধ্যে আমার অশান্ত মন শান্তি পেতো।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম জানি না।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন ঘর অন্ধকার। কায়ার প্লেসের আগুন নিবে গেছে, টেবিলের মোম পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ভোর প্রায় হয় হয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম যে কথা মনে পড়লো তা হলো, আমার

অতিথির সাবধানবাণী : তার উপস্থিতি যেন কেউ না জানতে পারে। কিন্তু কী ক'রে সম্ভব একটা জলজ্যান্ত মানুষকে লুকিয়ে রাখা? সকাল হলেই কাজের মহিলা আসবে ঘর পরিষ্কার করতে। বেশ কছুক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম, সকালে সবাইকে বলবো, দেশ থেকে হঠাৎ আমার চাচা এসেছেন।

এই সময় বাতির প্রয়োজন অনুভব করলাম আমি। নতুন একটা মোম জ্বালতে হবে, কিন্তু দেশলাই নেই কাছে। সিঁড়ির বাতিটাও নিবে গেছে। দারোয়ানের কাছে দেশলাই পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্যে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ মনে হলো কারো গায়ে যেন পা ঠেকলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল লোকটা। আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু জবাব পেলাম না। উপরে নিচে দু'তিনটে সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে খুঁজলাম। আর কিছুই ঠেকলো না পায়ে। ছিঁচকে চোর-টোর হবে ভেবে নিচে নেমে দারোয়ানকে বলতেই সে আলো এনে পুরো সিঁড়ি খুঁজে দেখলো। আমিও দেখলাম। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। আমাদের তলায় একমাত্র আমার ঘরের দরজাই খোলা। আর সব তালা মারা। হারবার্টের ঘরে আমার ঘরের ভেতর দিয়েই যাওয়া যায় তাই আমার অতিথিকে শোয়ানোর জন্যে ওঘরের বাইরের দরজা খুলতে হয়নি।

দারোয়ানের বাতি থেকে আমার বাতিটা জ্বালিয়ে নিলাম। দারোয়ান জানালো, রাত এগারোটার দিকে এক লোক আমার খোঁজ করেছিলো।

'হ্যাঁ, আমার চাচা,' বললাম আমি।

'দেখা হয়েছে আপনার সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'আর সঙ্গের লোকটা?'

'সঙ্গের লোকটা! চাচার সাথে তো কেউ ছিলো না।'

'কে জানে, উনি যখন আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন তখন তাঁর পেছনেই লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো। তাই দেখে মনে হয়েছিলো দু'জন বোধহয় এক সাথেই এসেছেন।'

শুনে একটু চিন্তা হলো আমার। তবে দারোয়ানকে আর কিছু বললাম না এ নিয়ে। লোকটার মনে হয়তো কোনো সন্দেহ দেখা দেবে।

সকালে নাশতার সময় পেরিয়ে যাওয়ারও বেশ পরে ঘুম থেকে উঠলো আমার অতিথি। ইতিমধ্যে কাজের মহিলা ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে চলে গেছে।

'আপনার নামটা এখনো জানা হয়নি,' নিচু কণ্ঠে বললাম তাকে। 'সবাইকে বলেছি আপনি আমার চাচা, দেশ থেকে এসেছেন।'

'চমৎকার! চাচা বলেই ডাকবে আমাকে।'

'তা তো ডাকবো, কিন্তু, একটা নাম আছে নিশ্চয়ই আপনার?'

'হ্যাঁ। আমার আসল নাম অ্যাবেল ম্যাগউইচ, জাহাজে এসেছি প্রোভিস ছদ্মনামে।'

'কাল রাতে এখানে যখন আসেন আপনার সাথে কেউ ছিলো?'

'না তো!'

'কিন্তু ছিলো। আপনি না জানলেও আপনার সাথে কেউ ছিলো।'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, কেউ একজন আমার পেছন পেছন

আসছিলো। কিন্তু আমি আমল দেইনি। কত লোকই তো অমন আসতে পারে।'

'লণ্ডনে আপনার জানাশোনা লোকের সংখ্যা কী রকম?'

'খুবই কম। সারা জীবন লণ্ডনের বাইরেই কাটিয়েছি। শুধু আমার শেষ বারের মামলার সময় মিস্টার জাগার্সের সাথে পরিচয় হয়। উনিই আমার উকিল ছিলেন।'

'শেষবার লণ্ডনেই আপনার বিচার হয়েছিলো?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

'তারমানে অন্তত কিছুলোক আপনার চেহারা চেনে। কাল যা বলছেন তারচেয়ে বেশি সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। লণ্ডনে ক'দিন থাকবেন ঠিক করেছেন?'

'বাকি জীবন।'

'ফাঁসির ভয় আছে জেনেও!'

'দেখ, তুমি যতটা ভাবছো তত ভয় আসলে নেই। আমি এখানে এসেছি তা কে বলতে যাচ্ছে পুলিসকে? তাছাড়া আমি চেহারা বদলে ফেলতে পারবো, তখন কে আমাকে চিনবে? আর দুর্ভাগ্যক্রমে ফাঁসি যদি হয়ই তাতেই বা দুঃখ কী? আমার জীবনের স্বপ্ন তো সফল হয়েছে।'

'চাচা' অর্থাৎ ম্যাগউইচ বা প্রোভিস যত নিশ্চিন্ত মনেই বলে থাকুক না কেন 'ভয় নেই' আমি কিন্তু তত নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ঠিক ক'রে ফেললাম আশপাশেই কোনো বাড়িতে এক বা দুটো ঘর ভাড়া ক'রে তুলে দেবো 'চাচা'কে। হ্যারবার্ট না ফেরা পর্যন্ত অবশ্য এখানেই থাকতে পারবে। হ্যারবার্ট ফিরবে দু'তিন দিনের মধ্যেই।

একটা ব্যাপার ঠিক, প্রোভিসের কথা হারবার্টকে না বলে পারবো না। কিন্তু প্রোভিসের তাতে আপত্তি। ও আগে হারবার্টকে দেখতে চায়, বুঝতে চায় কেমন মানুষ সে। তারপর ঠিক করবে হারবার্টকে সব বলা যায় কিনা।

কাছেই একটা নিরিবিলি বাড়ি জানা ছিলো আমার। নাশতা ক'রে গেলাম সেখানে। আমার 'চাচা'র জন্যে দুটো ঘর পাওয়া শক্ত হলো না। দু'তিন দিন পর চাচা এসে উঠবেন, বাড়িঅলাকে একথা বলে গেলাম মিস্টার জ্যাগার্সের কাছে।

আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার জ্যাগার্স।

'পিপ, সাবধানে কথা বলবে।' আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠলেন তিনি।

'বলবো, স্যার।'

'কোনো ঘটনার কথা আমি শুনতে চাই না। কোনো নাম উচ্চারণ করবে না।'

'করবো না উচ্চারণ। আমি শুধু জানতে চাই, যা শুনেছি সব সত্যি?'

'যা শুনেছো? হ্যাঁ, সত্যি।'

'অ্যাবেল ম্যাগউইচ নামের এক লোক এতদিন আমাকে টাকা দিয়ে এসেছেন?'

'তা-ই তুমি শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'যার কাছেই শুনে থাকো, ঠিকই শুনেছো।'

'মিস হ্যাভিশ্যাম ছিলেন না এর ভেতর?'

'না।'

'অথচ আমি বরাবরই ভেবে এসেছি মিস হ্যাভিশ্যামই আমাকে টাকাপয়সা দিয়ে যাচ্ছেন।'

'আমি কখনো বলেছি অমন কথা?'

'না।'

'তাহলে কেন তুমি ভাবতে গেলে? তোমার এই ভুল ভাবনার দায় আমার নয়, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে? আমার মক্কেল আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আশা করি আর কোনো কথা নেই তোমার আমার সাথে।'

'না। আমি, মিস্টার জ্যাগার্স।'

# কুড়ি

দু'তিন দিনের ভেতর ফিরলো না হারবার্ট, ফিরলো পাঁচদিন পর। এই পাঁচদিন যে কী অস্থিরতার ভেতর কাটালাম সে আমিই জানি। প্রোভিস সারাদিন ঘরে থাকে। সন্ধ্যার পর শুধু তাকে নিয়ে একটু বাইরে বেরাই।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর চেয়ারে বসেই আমি ঘুমিয়ে গেছি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে জেগে উঠলাম। প্রোভিসও ঘুমিয়ে ছিলো। কিন্তু আমার উঠে দাঁড়ানোর শব্দ পাওয়া মাত্র সে-ও তড়াক ক'রে উঠে বসলো বিছানায়। মুহূর্তের মধ্যে তার হাতে চলে এলো চকচকে একটা ছোরা।

'ভয়ের কিছু নেই! হারবার্ট,' আমি বললাম। এক মুহূর্ত পরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো হারবার্ট।

'হ্যানডেল, কেমন আছো?' চিৎকার করলো ও। 'মনে হচ্ছে যেন এক বছর বাইরে কাটিয়ে এলাম। কিন্তু, তোমাকে এত রোগা আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—' এতক্ষণে হারবার্ট দেখলো প্রোভিসকে এবং চুপ ক'রে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আমতা আমতা ক'রে বললো: 'মাফ করবেন, আমি ঠিক—'

প্রোভিস স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আস্তে আস্তে ছোরাটা ঢুকিয়ে রাখলো পকেটে।

'হারবার্ট, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে,' আমি বললাম, 'ইনি আমার অতিথি।'

'ঠিক আছে, পিপ,' বললো প্রোভিস, 'ওকে সব বলতে পারো। কিন্তু তার আগে—'

পকেট থেকে ছোট একটা বাইবেল বের ক'রে এগিয়ে এলো সে হারবার্টের কাছে, 'এটা ছুঁয়ে তোমাকে শপথ করতে হবে, আমার সম্পর্কে যা শুনবে, কারো কাছে কোনো অবস্থাতেই তা প্রকাশ করবে না।'

হারবার্ট অবাক চোখে তাকালো আমার দিকে।

'যা বলছেন উনি করো, হারবার্ট,' আমি বললাম।

বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করলো হারবার্ট। এরপর আমি ওকে

খুলে বললাম প্রোভিসের কাহিনী। শুনে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল হারবার্ট। ওকে ঘরে রেখে প্রোভিসকে আমি তার নতুন বাসায় দিয়ে এলাম। তারপর হারবার্টের মুখোমুখি বসলাম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

'আমার কিছুই মাথায় আসছে না, হ্যানডেল,' হারবার্ট বললো।

'প্রথমে আমারও এই অবস্থা হয়েছিলো,' বললাম আমি। 'কিন্তু, কিছু একটা আমাদের করতেই হবে। আমাকে দিয়ে আরো টাকা খরচ করানোর জন্যে খেপে উঠেছে প্রায়—বলছে ঘোড়া কিনতে হবে, গাড়ি কিনতে হবে, নতুন বড় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে। কী ক'রে যে ঠেকাবো—'

'তারমানে তুমি আর কিছু নিতে চাও না ওর কাছ থেকে?'

'কী ক'রে নেবো, তুমিই বলো? ওর কথা ভাবো একবার, কে ও, কী ও। অথচ এ-ও অস্বীকার করার উপায় নেই, আমার ওপর টানটা ওর আন্তরিক। আমাকে সত্যিই ভালোবাসে, স্নেহ করে। আমার মতো এমন দুর্ভাগ্য বোধহয় আর কারো হয়নি।'

'তা ঠিক, হ্যানডেল।'

'ভেবে দেখ, এর মধ্যেই কত টাকা নিয়েছি ওর কাছ থেকে, তারপরও দেনায় ডুবে আছি। এদিকে কোনোরকম রোজগারের ক্ষমতা আমার নেই। ভাবছি সব ছেড়ে দিয়ে সেনাদলে নাম লেখাবো।'

'যতসব আজগুবি চিন্তা। সেনাদলে নাম লেখালে কোনো লাভই হবে না। তারচেয়ে আমার মালিক ক্লারিকারের অফিসে যোগ দাও। আমি তো অল্প দিনের মধ্যেই অংশীদার হয়ে যাচ্ছি।'

বেচারা হারবার্ট! জানেও না কার টাকায় হচ্ছে এই অংশীদার।

'তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও ভাবতে হবে,' বলে চললো হার-বার্ট, 'লোকটা অশিক্ষিত অথচ এক রোখা। এতদিন ধরে একটা ইচ্ছা পোষণ ক'রে আসছে মনে, এখন বাধা পেলে খেপে যেতে পারে। আমার যদ্দুর মনে হয়েছে লোকটা হিংস্র এবং বেপরোয়া—অন্তত ছিলো। আবার হয়ে উঠতে কতক্ষণ?'

'তুমি ঠিকই ধরেছো।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হবে ওকে ইংল্যাণ্ডের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। দরকার হলে তুমিও সঙ্গে যাবে। তোমার সঙ্গে ও যেকোনো জায়গায় যাবে।'

'তা নাহয় নিয়ে গেলাম, কিন্তু আবার যে ফিরে আসবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

'নিশ্চয়তা নেই ঠিক, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই,' বললো হার-বার্ট। 'যাতে না ফেরে সেজন্যে ওকে বোঝাতে হবে আর সেজন্যে ওর অতীত ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। অন্য কয়েদীটা—যার সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিলো সে এখন কোথায় তা-ও জানতে হবে।'

ঠিক করলাম পরদিন সকালে যখন এখানে আসবে তখনই প্রোভিসের কাছে তার জীবন কাহিনী শুনতে চাইবো।

পরদিন সকালে গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম। একসাথে নাশতা কর-লাম আমরা। তারপর আমি বললাম:

'সেই অন্য কয়েদীটার কথা মনে আছে আপনার?—যার সঙ্গে মারামারি করেছিলেন জলাভূমিতে?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে,' বললো প্রোভিস।

'ঐ লোকটা সম্পর্কে জানতে চাই আমরা। আপনার সম্পর্কেও

কিছু জানতে চাই। আপনি এত টাকা দেবেন আমাকে, অথচ আপনার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি, আশ্চর্য না?'

'বেশ বলবো। কিন্তু—,' হারবার্টের দিকে তাকালো সে, 'শপথের কথা মনে আছে তো, আমার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না?'

'হ্যাঁ আছে,' বললো হারবার্ট।

প্রোভিস শুরু করলো তার কাহিনী :

'আমার জীবন কাহিনী কয়েকটা কথায়ই সেরে ফেলা যায় : জেলে ঢুকেছি, বেরিয়েছি ; বেরিয়েছি, ঢুকেছি ; আবার বেরিয়েছি আবার ঢুকেছি। যতদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম এ-ই ছিলো আমার জীবন। তারপর একদিন পিপ আমাকে সাহায্য করলো। কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম আমি ছোট্ট ছেলেটার কাছে। এর কিছুদিন পরেই দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে।

'ফাঁসি ছাড়া আর সব ধরনের শাস্তি ভোগ করেছি জীবনে। দিন কেটেছে আজ এ কারাগারে কাল ও কারাগারে, আজ এ শহরে কাল ও শহরে, আজ এ জায়গায় কাল ও জায়গায়। কোথায় আমার জন্ম জানি না। মা বাবাকে কখনো দেখিনি, তাদের নামও জানি না। নিজের নামটা যে কী ক'রে জানলাম, ভেবে আশ্চর্য লাগে। ছেলেবেলায়ই চুরিতে হাতেখড়ি হয়েছে—আর কিছু না, শুধু খাবার জোগাড় করার জন্যে। পেটের জ্বালায় কী না করেছি—ভিক্ষে করেছি, কুলিগিরি করেছি, ফেরিওয়ালা হয়েছি। একটু বড় হয়ে জুয়া খেলতে শিখেছি।

'অবশেষে একদিন এক জুয়ার আড্ডায় কিটকাট, চৌকষ এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তার নাম কম্পেসন। এই কম্পেসনই

সেই অন্য করেদী, পিপ ; যার সাথে তোমরা আমাকে মারামারি করতে দেখেছিলে জলাভূমিতে। কম্পেসন তার হয়ে কাজ করার জন্যে একজন লোক খুঁজছিলো। জুয়ার আড্ডার মালিক আমার কথা বলে তাকে। আমাকে খানিকক্ষণ দেখেই কম্পেসন বুঝে ফেলে আমার স্বভাব, চরিত্র এবং অবস্থা। বলে, "তোমার খুব দুরবস্থা চলছে তাই না ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

' "ভাগ্য বদলানোর সুযোগ পেলে নেবে ?" '

' "হ্যাঁ।"

' "তাহলে এই নাও, পাঁচ শিলিং, খাওয়া দাওয়া করোগে। কাল এই সময়, এখানে দেখা কোরো আমার সাথে।" পরদিন গেলাম আমি। কম্পেসন তার ব্যবসার অংশীদার ক'রে নিলো আমাকে।

'কী ব্যবসা তার ? জালিয়াতি, জুয়াচুরি, জাল টাকা চালান ইত্যাদি ইত্যাদি। কম্পেসনের আরেক অংশীদার ছিলো, তার নাম আর্থার। এই আর্থার আমাকে সাবধান করেছিলো, কম্পেসনের সঙ্গে যেন না জড়াই। জড়িয়ে থাকলেও যেন কেটে পড়ি। কিন্তু আমি শুনিনি ওর সাবধানবাণী। আর্থারের কাছে শুনেছিলাম, বিবাহিত হয়েও এক ভদ্রমহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়েছিলো কম্পেসন। ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সে মোটা টাকা আদায় করতো। বেচারা আর্থার। শেষে কী শোচনীয় মৃত্যুই তার হলো। পাগল হয়ে গেছিলো। এক রাতে সে কম্পেসনের ঘরে এসে ভয়ার্তস্বরে বললো : "উপরে, আমার ঘরে আছে ও। কিছুতেই ওর হাত এড়াতে পারছি না। ধবধবে শাদা পোশাক পরে আছে, মাথায় শাদা ফুল। হাতে কফিন ঢাকার শাদা কাপড়। বলছে, ভোর পাঁচটায় ও আমাকে ঢেকে

দেবে ঐ কাপড় দিয়ে!···কী ক'রে এলো আমার ঘরে? ··যেভাবেই আসুক, এসেছে।···আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে···"

'"বোকা!" কম্পেসন ধমক দিলো, "ও তো জ্যান্ত মানুষ। কী ক'রে দরজা দিয়ে না এসে তোমার ঘরে ঢুকবে?"

'"কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, তুমি ওর বুক ভেঙে দিয়েছো, আর সেই ভাঙা বুক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।"

'এরকম আমি কয়েকদিন দেখেছি। একদিন ও ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কম্পেসনের স্ত্রী স্যাসি আর আমি তাকে খানিকটা মদ খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। মদের প্রভাবে সে শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেল। কিন্তু সেই তার শেষ ঘুম। কিছুক্ষণ পর আবার সে অস্থিরভাবে চিৎকার শুরু করলো: "ঐ দেখ ও এসেছে আবার! ···আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে!···ঠেকাও ওকে···আমাকে নিয়ে যেতে দিও না!" বলতে বলতে ও উঠে বসতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল আবার। আমরা কাছে গিয়ে দেখি মারা গেছে।

'আর্থারের মৃত্যুর পর আমিই হলাম কম্পেসনের কুকর্মের প্রধান সঙ্গী। দু'জনে মিলে চালিয়ে যেতে লাগলাম "ব্যবসা"। বেশি-দিন অবশ্য চললো না এরকম। দু'জনই ধরা পড়লাম। লণ্ডনে আমাদের বিচার হলো। সে সময়ই মিস্টার জ্যাগার্সের সাথে আমার পরিচয়। আমার উকিল হয়েছিলেন তিনি। ওঁকে নিয়োগ করতে গিয়ে আমার একমাত্র গায়ের কাপড় ছাড়া আর সব কিছু বিক্রি করতে হয়েছিলো। জ্যাগার্স আমাকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে এত সব অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে তাঁর চেষ্টায় কিছু হলো না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা, কম্পেসনের কিছুই হলো না। প্রত্যেকটা কাজ সে এমনভাবে করেছে

বা আমাকে দিয়ে করিয়েছে যে ফাঁসলে আমিই শুধু ফাঁসবো, ওর টিকিটাও কেউ ছুঁতে পারবে না।

'এ যাত্রা রেহাই পেয়ে গেল কম্পেসন। তবে কিছুদিন পর আবার ধরা পড়লো। এবার আর বাঁচতে পারলো না। আমি যে কারা-জাহাজে ছিলাম সেখানেই তাকে পাঠানো হলো। ওকে দেখেই খুনের নেশা চেপে বসলো আমার মাথায়। একদিন সুযোগ পেয়ে আচ্ছা পিটুনি দিলাম ওকে। রক্ষীরা এসে না বাঁচালে হয়-তো সেদিন সে মরেই যেতো। যা হোক, ওকে আলাদা ক'রে রাখা হলো আমার কাছ থেকে। এর পর এক সুযোগে পালালাম আমি কারা-জাহাজ থেকে। কী ক'রে যেন পরদিনই পালালো কম্পেসনও। জলাভূমিতে আমাদের দেখা হলো। তখন প্রথমেই আমার মাথায় যে চিন্তাটা এলো, আমি জাহান্নামে যাই, ওকে আবার তুলে দিতে হবে রক্ষীদের হাতে। সেজন্যে ওকে ধরে রওনা হলাম জাহাজের দিকে। কিন্তু ও বাধা দিতে লাগলো। তখন ভাবলাম মেরে অজ্ঞান ক'রে নিয়ে যাবো। মারতে শুরু করেছি এই সময় তোমরা সেখানে হাজির হয়েছিলে সৈনিকদের সঙ্গে।' আমার দিকে তাকিয়ে শেষ করলো প্রোভিস।

'ও কি বেঁচে আছে এখনো না মরে গেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। যদি বেঁচে থাকে তাহলে ওর ধারণা আমি মরে গেছি। এটুকুই বলতে পারি। ওর সাথে আর আমার দেখা হয়নি।'

হারবার্ট এতক্ষণ পেন্সিল দিয়ে একটা খাতার মলাটে কী যেন লিখছিলো। এবার আস্তে ক'রে সে খাতাটা এগিয়ে দিলো আমার

দিকে। লেখাটা পড়লাম আমি : 'আর্থার মিস হ্যাভিশ্যামের ভাই। আর কম্পেসন মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে প্রেমের অভিনয় করেছিলো।'

খাতাটা উল্টে রেখে হারবার্টের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালাম আমি।

# একুশ

প্রোভিস বা ম্যাগউইচের কাহিনী শুনে আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠলো। কম্পেসন যদি বেঁচে থাকে আর ম্যাগউইচের খবর পায় নির্ঘাৎ সে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। একবার যদি পুলিসে খবর দেয়, ম্যাগউইচকে বাঁচানোর কোনো উপায় আর থাকবে না তাহলে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি ওকে ইংল্যাণ্ড থেকে সরিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। মিস্টার ওয়েমিকের কাছে সাহায্য চাইলাম এ ব্যাপারে। সাহায্য করতে রাজি হলেন তিনি।

কিন্তু প্রোভিসকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড ছাড়ার আগে একবার এস্টেলা এবং মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করতে হবে।

পরদিনই আমি রিচমণ্ড গেলাম। গিয়ে শুনি এস্টেলা দেশে

গেছে। অবাক হলাম শুনে। কারণ এ পর্যন্ত যতবার মিস হ্যাভিশ্যামের কাছে গেছে আমিই ওকে নিয়ে গেছি, নিয়ে এসেছি। এবার কী হলো?

হোটেলে ফিরে হারবার্টের সাথে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলাম, আমি মিস হ্যাভিশ্যামের ওখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রোভিসকে দেশের বাইরে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলা হবে না।

পরদিন সকালের কোচে আমি রওনা হয়ে গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করার জন্যে। ব্লুবোর হোটেলেই উঠলাম। সেখানে দেখা হয়ে গেল বেন্টলি ড্রাম্‌লের সাথে। প্রথমে তাকে দেখেও না দেখার ভান করলাম আমি। ও-ও তা-ই করলো। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। হঠাৎ ক'রে ওকে আবিষ্কার করতে হলো। ও অবশ্য বেশি কথা বললো না আমার সাথে। মামুলি কিছু আলাপের পর ড্রাম্‌ল হোটেলের এক পরিচারককে ডেকে তার ঘোড়া বের করতে বললো। এবং, যেন আমাকে শোনানোর জন্যেই, যোগ করলো:

'আজ আর ভদ্রমহিলা আসবেন না। আবহাওয়া বেশি ভালো না। আমি একাই যাবো। আর শোনো, আজ আমি খাবোও না এখানে। ভদ্রমহিলার ওখানে নিমন্ত্রণ আছে।'

এই ভদ্রমহিলা যে এস্টেলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এস্টেলা শেষ পর্যন্ত ড্রাম্‌লকে নিমন্ত্রণ ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে এবং দু'জন এক সাথে সময় কাটাচ্ছে, ভাবতেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

বেশ পরিশ্রম করতে হলো আমাকে উত্তেজনা দমন করার জন্যে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

* * *

মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে ঢুকে দেখলাম, আগুনের সামনে সোফায়-বসে আছেন তিনি। তাঁর পায়ের কাছে বসে এস্টেলা উল বুনছে। আমি ঢুকতেই চোখ তুলে তাকালো দু'জন। দু'জনের চোখেই সতর্ক চাউনি ফুটে উঠলো।

'তারপর, পিপ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস হ্যাভিশ্যাম, 'কোন বাতাস তোমাকে এখানে ঠেলে নিয়ে এলো?'

'কাল রিচমণ্ডে গিয়েছিলাম এস্টেলার সাথে কয়েকটা কথা বলার জন্যে,' আমি বললাম, 'গিয়ে দেখি কোন এক বাতাস যেন ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাই আমাকেও আসতে হলো।'

মিস হ্যাভিশ্যাম তৃতীয় কি চতুর্থবার ইশারা করার পর বসলাম আমি তাঁর সেই পুরনো সাজ-টেবিলের সামনের আরাম-চেয়ারে।

'এস্টেলাকে যা বলার তা আপনার সামনেই বলবো; চিন্তা করবেন না। কথাগুলো শুনে আপনি অবাক বা অখুশি হবেন না। যতটা চেয়েছিলেন ততটাই আমার মন ভেঙে দিতে পেরেছেন আপনি।'

মিস হ্যাভিশ্যাম স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এস্টেলা মন দিয়ে তার বুনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'এতদিন যিনি আমার পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে এসেছেন সম্প্রতি তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছি,' বলে চললাম আমি। 'কিন্তু সে জানাটা খুব সুখের নয়। তাতে আমার সুনাম, সামাজিক প্রতিপত্তি বা সৌভাগ্য কোনোটাই বাড়বে না। তাছাড়া, আমার পৃষ্ঠপোষকের ইচ্ছা নয় তাঁর নাম প্রকাশ করি। তাই নামটা শোনাতে পারছি না

আপনাদের।'

'তারপর?'

'যখন আমি গাঁয়ের ছোট্ট ছেলেটি তখন আপনিই আমাকে এখানে আনলেন। আমার মনে স্বপ্নের বীজ বুনে দিলেন। যে ক'দিন আপনার খেয়াল হলো রাখলেন এখানে। তারপর মিস্টার জ্যাগার্স—'

'জ্যাগার্স আবার এর ভেতর আসছে কেন?' বাধা দিয়ে বললেন মিস হ্যাভিশ্যাম। 'জ্যাগার্স আমারও উকিল তোমার পৃষ্ঠপোষকেরও উকিল। এটা নেহায়েত একটা আকস্মিক যোগাযোগ। তার বেশি কিছু নয়।'

'আমি একটা ভুল ধারণা করেছিলাম। সে ভুল আপনি ভাঙিয়ে দিতে পারতেন। তা না ক'রে আপনি বরং প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছেন তাকে।'

'কেন আমি তোমার ভুল ভাঙাতে যাবো? কেন?'

তাঁর এই নির্মম জবাব শুনে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন:

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন লণ্ডনে আমি আপনার আত্মীয়দের সঙ্গেই থেকেছি, এখনও আছি। মিস্টার ম্যাথ্যু পকেট এবং হারবার্টকে যদি সৎ, উদার হৃদয়, এবং মহৎ ছাড়া আর কিছু ভেবে থাকেন তাহলে তাঁদের ওপর ঘোর অবিচার করেছেন।'

'জানি, ওরা তোমার বন্ধু।'

'না, ওঁরা আমার বন্ধুত্ব অর্জন করেছেন। আপনার অন্যান্য আত্মীয় যেমন—মিস সারাহ পকেট, মিস জজিয়ানা বা মিসেস

ক্যামিলার মতো নন ওঁরা।'

'কী চাও তুমি ওদের জন্যে?'

'শুধু এটুকু বলতে যে, ওঁরা আর সবার মতো নন।'

'বুঝলাম। কিন্তু কী চাও তুমি ওদের জন্যে?'

'আমি যে চালাক নই তা আশাকরি বুঝতে বাকি নেই আপনাদের। সুতরাং চালাকির চেষ্টা না ক'রে সরাসরিই বলছি, হারবার্ট একটা ব্যবসা শুরু করেছে। যাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্যে যদি ওর অজান্তে ওকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে খুবই উপকার হয়।'

'অজান্তে কেন?'

'কারণ, দু'বছর ধরে আমিই ওকে গোপনে সাহায্য ক'রে আসছি। কিন্তু তা আর এখন সম্ভব হচ্ছে না। কেন তা আপনাকে খুলে বলতে পারবো না। এখন আমার সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেই ও টের পাবে কিসের ভিত্তিতে ও এতদিন ব্যবসা ক'রে এসেছে। এটা আমি চাই না।'

'আর কিছু বলবে?'

এস্টেলা এখনো মন দিয়ে বুনছে। ওর দিকে তাকালাম আমি। বললাম:

'এস্টেলা, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি—গভীরভাবে ভালোবাসি।' মুখ তুললো এস্টেলা, কিন্তু কিছু বললো না। আমি বলে চললাম, 'আগেই তোমাকে আমার জানানো উচিত ছিলো কথাটা। কিন্তু কেন জানাইনি তুমি জানো। আমি ভেবেছিলাম, মিস হ্যাভিশ্যাম আমাদের তৈরি করছেন একজনকে আরেকজনের জন্যে। কিন্তু এখন আমি জানি এতদিন আমি ভুল ভেবেছি।

তাই আজ না বলে পারলাম না। আমি জানি এ ভালোবাসার প্রতিদান আমি পাবো না। জানি, দু'দিন পর আমি ভয়ানক দুরবস্থায় পড়বো। তবু—তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি, আজীবন বেসে যাবো।'

'তোমার এ উচ্ছ্বাসের কী অর্থ, তুমিই জানো,' অবশেষে কথা বললো এস্টেলা। 'আমার কাছে এসসব অর্থহীন কথা। আমি তোমাকে অনেক আগেই সাবধান করেছি, আমার হৃদয় বলে কিছু নেই, নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।'

'না ভুলিনি।'

'কিন্তু তুমি কান দাওনি আমার কথায়। ভেবেছো ঠাট্টা করছি। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ঠাট্টা করা আমার স্বভাব নয়? আর সবার চাইতে তোমাকে আলাদা ভাবি বলেই সাবধান করেছিলাম। কিন্তু তুমি শোনোনি। তুমি আমাকে ভালোবাসো কি বাসো না তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'এস্টেলা, এ নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা নয়। এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো না।'

'তোমাকে, শুধু তোমাকেই বলছি, পিপ, নিষ্ঠুর হবার শিক্ষাই আমি আজীবন পেয়ে এসেছি। একটা খবর দেই তোমাকে, শিগগিরই আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই ড্রাম্‌লকে।'

'হ্যাঁ।'

'ওহ! এস্টেলা! এস্টেলা! কী ভুল যে তুমি করতে যাচ্ছো যদি বুঝতে!'

'আমার ব্যাপার আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি, পিপ।'

'হয়তো, হয়তো। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তুমি ভুল করতে যাচ্ছো, এস্টেলা। ড্রাম্‌লের মতো পাষণ্ড দ্বিতীয়টি হয় না। তুমি আর কাউকে পেলে না? আমাকে পারবে না জানি। কিন্তু অন্য যারা তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে তাদের কাউকে বিয়ে করো। আমি দূরে থেকে অন্তত এই সান্ত্বনা পাবো তুমি সুখে আছো। ড্রাম্‌লের হাতে পড়ে দিনে দিনে তোমার কী দুরবস্থা হবে, ভেবে যে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

'আমাকে ভুলতে তোমার এক সপ্তাও লাগবে না।'

'কক্ষনো না, এস্টেলা, কক্ষনো না! তুমি আমার অস্তিত্বের অংশ। আমার জীবনের অংশ।···থাক আর কথা বাড়াবো না। তুমি সুখী হও! ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন এই কামনাই করি।'

ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি ঘর থেকে। ব্রুবোরে আর গেলাম না। লণ্ডনে ফিরলাম পুরো রাস্তা হেঁটে।

মাঝ রাত পেরিয়ে যাওয়ার পর যখন বাসায় ফিরলাম, দারোয়ান আমার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বললো:

'যিনি এটা দিয়ে গেছেন তিনি বলেছেন আমার আলোতেই যেন পড়েন।'

ভাঁজ খুলে দেখলাম মিস্টার ওয়েমিকের হাতের লেখা:

'ঘরে যাবে না।'

রাতটা কোনোমতে কভেন্ট গার্ডেনের এক হামামে কাটিয়ে ভোরে হাজির হলাম মিস্টার ওয়েমিকের বাড়িতে। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

'কাল তাহলে হোটেলে ফেরোনি ?'

'ফিরেছিলাম। কিন্তু আপনার চিরকুট পাওয়ার পর আর ঘরে ঢুকিনি। ব্যাপার কী বলুন তো ?'

'তুমি তো জানো, মাঝে মাঝে আমি আমার মনিবের নক্কেল-দের সাথে দেখা করার জন্যে এক জায়গায় যাই। কোথায় তা বলবো না, তুমি জানো।' (আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না মিস্টার ওয়েমিক নিউগেট কারাগারের কথা বলছেন)। 'কাল সকালে সেখানে গিয়ে শুনি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গিয়েছিলো এমন এক আসামী নাকি সম্প্রতি উপনিবেশ থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছে লণ্ডনে। উপনিবেশে থাকার সময় লোকটা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়েছিলো। সেজন্যেই ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি জানাজানি হয়ে গেছে। এখন সেই আসামীর খোঁজে সরকারি লোকজন তোমার হোটেলের ওপর নজর রাখছে। তাই তোমাকে সাবধান করা দরকার মনে ক'রে চিরকুটটা রেখে এসেছিলাম।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেজন্যে। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও এমনটা সন্দেহ হচ্ছিলো,' বললাম আমি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'কম্পেসন নামের কাউকে চেনেন আপনি, মিস্টার ওয়ে-মিক ?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'বেঁচে আছে লোকটা ?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন ওয়েমিক।

'এই লণ্ডনেই আছে ?'

এবারও মাথা ঝাঁকিয়েই জবাব দিলেন মিস্টার ওয়েমিক। তার-

পর বললেন :

'তোমার প্রশ্ন তো শেষ? এবার শোনো, কাল তোমাকে হোটেলে না পেয়ে ক্লারিকারের অফিসে গিয়ে দেখা করি হারবার্টের সাথে। তাকে বলি যে, তোমাদের হেফাজতে যে লোকটা আছে তাকে আর একটুও দেরি না ক'রে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'একথা শুনে তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কথা হারবার্টের।'

'হ্যাঁ, তা-ই সে হয়েছিলো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর ও ওর একটা গোপন কথা জানায় আমাকে। একটা মেয়েকে ভালোবাসে ও। মেয়েটা তার বুড়ো বাবাকে নিয়ে মিলপণ্ড ব্যাঙ্ক-এর কোনো এক মিসেস হুইম্প্‌ল-এর বাড়িতে থাকে। বাড়িটার দোতলায় নাকি একটা কামরা খালি আছে। হারবার্ট আমার কাছে জানতে চায় তোমাদের ঐ লোকটাকে কয়েকদিনের জন্যে ওবাড়িতে সরিয়ে ফেলা উচিত হবে কিনা। আমি বলি যে, খুবই-উচিত হবে। কারণ ভেবে দেখলাম, এতে তোমাদের সবারই মঙ্গল। বাড়িটা নদীর তীরে, খুবই নিরিবিলি জায়গায়। কারো কাছ থেকে পাকা খবর না পেলে পুলিস ওখানে যাবে না। তুমিও প্রত্যেক-দিন লোকটার সাথে দেখা না ক'রেই তার খবরাখবর পেতে পারবে। তাছাড়া বাড়িটা নদীর কাছে হওয়ায় ওখান থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের আসাযাওয়া সহজেই লক্ষ করা যায়। এতে আমার ধারণা, তোমাদের লোকটাকে বিদেশে পাঠানো সহজ হবে।'

'ঠিকই ভেবেছেন আপনি।'

'কাল রাত ন'টার সময় মিস্টার হারবার্ট ওকে নিয়ে গেছে

মিসেস হুইম্প্‌ল-এর বাড়িতে।'

সব শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম অনেকটা। মিস্টার ওয়েমিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম তাঁর সহৃদয়তার জন্যে। মিসেস হুইম্প্‌ল-এর বাড়ির ঠিকানা এবং অবস্থান জেনে নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

দিনটা আমি মিস্টার ওয়েমিকের বাসায় কাটালাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পর রওনা হলাম মিলপণ্ড ব্যাঙ্ক এর দিকে। হারবার্টকে যে এখন ক্লারাদের ওখানে পাবো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

হারবার্ট আমাকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলো। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

ক্লারার বাবা বাতের রোগী। ব্যথায় দিন রাত চেঁচান নয়তো কাৎরান। বাপকে একটু আরাম দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে ক্লারা। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারে না। ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো হারবার্ট। তারপর নিয়ে গেল প্রোভিসের ঘরে।

দেখলাম নতুন আস্তানায় প্রোভিস বেশ আরামেই আছে। হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর নিয়ে গিয়ে বসালো আগুনের সামনে। মিস্টার ওয়েমিক আমাকে যা যা বলেছেন সব ওকে বললাম আস্তে আস্তে। ভদ্রলোক যে তাকে কিছুদিন একদম বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন, আমাকেও তার কাছে আসতে বারণ করেছেন এবং সুযোগমতো তাকে ইংল্যাণ্ডের বাইরে নিয়ে যেতে বলেছেন, বললাম। প্রোভিস শান্তভাবে সব শুনলো, কোনো প্রতিবাদ করলো না। এরপর আরো কিছুক্ষণ

তার সাথে থেকে আমরা বিদায় নিলাম।

হারবার্ট বাইরে এসে বললো, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হ্যানডেল, আমরা দুজনেই তো নৌকা বাইতে পারি। চলো ছোটখাটো একটা নৌকা কিনে ফেলি। দু'জনে মিলে টেমসে নৌকা বাইবো রোজ বিকেলে। নদীর সঙ্গেই মিসেস হুইম্প্‌ল-এর বাড়ি। প্রোভিস যদি বিকেলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমরা রোজই দেখতে পাবো তাকে, সে-ও দেখতে পাবে আমাদের। কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। তারপর সময়-সুযোগ বুঝে একদিন ওকেও তুলে নেবো নৌকায়। ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশে যাচ্ছে এমন কোনো জাহাজে তুলে দেবো।'

'মন্দ নয় বুদ্ধিটা,' বললাম আমি। 'ঠিক আছে তাহলে, একটা নৌকাই কিনে ফেলা যাক।'

## বাইশ

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। পরিস্থিতি যা ছিলো তা-ই। ম্যাগউইচ বা প্রোভিস এখনো মিসেস হুইম্প্‌ল-এর বাড়িতেই আছে। আমিও মোটামুটি নির্ভয়ে আছি টেম্প্‌ল ইন-এ। হারবার্ট ভীষণ ব্যস্ত কাজ

নিয়ে। তার ভেতরেও ও প্রায় প্রতিদিন আমাকে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে বিকেলের নৌকা বাওয়ায়।

আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। খুঁজে খুঁজে সস্তা সরাইখানায় খাওয়া দাওয়া করছি। ম্যাগউইচের টাকায় দিন চালাতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না। এই দুর্দশার মধ্যেও এস্টেলার কথা মনে জেগে আছে সারাক্ষণ। ওর কথা ভেবে কী যে কষ্ট হয় বুকের ভেতর, বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন কিছুটা সময় অন্তত অন্যমনস্ক থাকা যাবে ভেবে নাটক দেখতে গেলাম। কপাল এমন, মিস্টার ওপস্‌ল যে দলে নাম লিখিয়েছেন সে দলের নাটক চলছে সেদিন। নাটক শেষ হওয়ার পর ভাবলাম দেখা ক'রে যাই মিস্টার ওপস্‌লের সাথে। তাই দর্শকরা চলে যাওয়ার পরও আমি বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'কেমন আছেন?' তাঁর সাথে করমর্দন করতে করতে বললাম আমি। 'আপনি যে আমাকে দেখেছেন এটা খেয়াল করেছি।'

'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু তোমার সাথে আর কে ছিলো, মিস্টার পিপ?'

'কই, আমার সঙ্গে তো কেউ ছিলো না।'

'ছিলো না! তাহলে বারবার অমন ক'রে তাকাচ্ছিলো কেন তোমার দিকে?'

'কে?'

'সেটাই তো আরো আশ্চর্য। তোমার মনে আছে—তুমি তখন খুব ছোট, এক ক্রিস্টমাসের সন্ধ্যায় আমরা সৈন্যদের সাথে দুই

পলাতক কয়েদীর খোঁজে গিয়েছিলাম ?'

'মনে থাকবে না আবার !'

'সেই দুই কয়েদীর একজনই বসেছিলো তোমার পেছনে। নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।'

'কোন জনকে দেখেছেন বলুন তো ?'

'অতদিন আগের কথা, ভালো মনে নেই। তবে লোকটা যে ঐ দু'জনেরই একজন তাতে সন্দেহ নেই।'

ম্যাগউইচ মিসেস হুইম্প্‌লের বাড়িতে আছে, আজও খবর পেয়েছি। ওর বাইরে বেরোনোরও কথা না। তাহলে এই লোকটা নিঃসন্দেহে কম্পেসন।

তার মানে শুধু পুলিস না, কম্পেসনও ম্যাগউইচকে খুঁজছে এবং আমাকে অনুসরণ করছে ওর খোঁজ বের করার জন্যে। হোটেলে ফিরে হারবার্টকে সব কথা খুলে বললাম। মিস্টার ওয়েমিককেও চিঠি লিখে জানালাম। সাবধানতা হিশেবে নৌকা নিয়ে বেরোনো বন্ধ রাখলাম কয়েক দিন।

সপ্তাহখানেক পর সন্ধ্যার সামান্য আগে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল মিস্টার জ্যাগার্সের সাথে।

'কোথায় যাচ্ছো, পিপ ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'সম্ভবত হোটেলে।'

'সম্ভবত ! মানে তুমি জানো না সত্যিই হোটেলে যাচ্ছো কিনা ?'

'না, সত্যিই এখনো ঠিক করিনি হোটেলে ফিরবো না অন্য কোথাও যাবো।'

'ভালোকথা। রাতে খাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বিশেষ কারো সাথে না নিশ্চয়ই?'

'না।'

'তাহলে চলো আমার সাথে।' আমি আমন্ত্রণটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছি এই সময় তিনি যোগ করলেন, 'চলো, ওয়েমিকও আসবে।'

ওয়েমিক আসবেন শুনে মত বদলালাম আমি।

রাতে খাওয়ার টেবিলে মিস্টার জ্যাগার্স মিস্টার ওয়েমিককে জিজ্ঞেস করলেন:

'মিস হ্যাভিশ্যামের চিঠিটা কি পাঠিয়ে দিয়েছো পিপের ঠিকানায়?'

'না, স্যার, দিতে যাবো এসময়েই আপনি মিস্টার পিপকে নিয়ে এলেন অফিসে। এই যে ওটা।'

আমাকে নয়, চিঠিটা ওয়েমিক তাঁর মনিবের হাতে দিলেন।

'দু'লাইনের চিঠি, পিপ,' বললেন মিস্টার জ্যাগার্স। 'তুমি এখনো আগের ঠিকানায় আছো কিনা জানেন না মিস হ্যাভিশ্যাম, তাই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, তুমি কী এক ব্যবসার ব্যাপারে তাঁকে একটা অনুরোধ করেছিলে, সেই বিষয়ে আলাপের জন্যে যেন তাঁর সাথে দেখা করো। যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'কবে?'

'কালই।'

এরপর কথা প্রসঙ্গে মিস্টার জ্যাগার্স জানালেন আমার 'পুরনো বন্ধু' বেন্টলি ড্রাম্‌লের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে এস্টেলার। খবরটা শুনে আমার বুকে একটা ধাক্কা লাগলো যেন। অবশেষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। ক্ষীণ একটা আশা এতদিন আমার মনে ছিলো, হয়তো শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝতে পারবে এস্টেলা।

মিস্টার জ্যাগার্সের পরিচারিকা মলি আমাদের পরিবেশন করছে। নতুন একটা ডিশ নিয়ে এসেছে সে। ডিশটা টেবিলে রেখে হাত দুটো যখন উঠিয়ে নিচ্ছে, একটা ব্যাপার লক্ষ ক'রে অবাক হয়ে গেলাম আমি। মহিলার হাত এস্টেলার হাতের মতো। আঙুলগুলো যেন হুবহু এক। ঝট ক'রে মুখ তুলে তাকালাম আমি মলির দিকে। কী আশ্চর্য! মুখের গড়নও এস্টেলার মতো।

খাওয়া দাওয়ার পর সামান্য বসে মিস্টার জ্যাগার্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম আমি আর মিস্টার ওয়েমিক। কিছুক্ষণ চলার পর আমি বললাম :

'মিস্টার ওয়েমিক, একদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন, মিস্টার জ্যাগার্সের বাড়িতে কখনো খাওয়ার সৌভাগ্য হলে যেন তাঁর পরিচারিকাটিকে লক্ষ করি, মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, মিস্টার পিপ, মনে আছে।'

'কেন বলেছিলেন? নিশ্চয়ই আপনি ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন। দয়া ক'রে বলবেন আমাকে?'

'বলবো, কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে, আর কাউকে বলবে না তুমি একথা।'

কথা দিলাম আমি।

'আমি সব ব্যাপার জানি না,' শুরু করলেন মিস্টার ওয়েমিক, 'যেটুকু জানি তা-ই বলছি। বছর কুড়ি আগে মলি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। মিস্টার জ্যাগার্সই তার উকিল ছিলেন। তাঁর চেষ্টায়ই সে বেকসুর খালাস পায়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, ঈর্ষার বশে এক মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। শুধু তা-ই নয়, ওর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ছিলো, ও নাকি স্বামীর ওপর রাগ ক'রে নিজের পেটের মেয়েকেও মেরে ফেলেছিলো। মেয়েটার বয়েস তখন দুই কি তিন বছর।'

'মলির এই ঈর্ষা আর রাগের কারণ কী?'

'ঈর্ষার কারণ ওর স্বামী ওকে ছেড়ে ঐ মহিলাকে নিয়ে থাকতো। আর রাগের কারণ, স্বামীটা ছিলো ভয়ঙ্কর মাতাল। স্ত্রী কন্যার ভরণ পোষণ চালানো দূরে থাক খোঁজ খবরটাও নিতো না। তাছাড়া সুযোগ পেলেই শারীরিক নির্যাতন করতো মলির ওপর।'

'মলি কবে থেকে মিস্টার জ্যাগার্সের কাছে আছে?'

'যেদিন সে মামলা থেকে খালাস পায় সেদিন থেকেই।'

'মেয়েটাকে ও সত্যিই মেরে ফেলেছিলো?'

'জানি না।'

পরদিনই আমি মিস হ্যাভিশ্যামের সাথে দেখা করতে গেলাম।

ঘরে ঢুকে দেখলাম মুখ নিচু ক'রে বসে আছেন তিনি। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি, যেন ধ্যানস্থ। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আমি ফায়ার প্লেসের পাশে দাঁড়ালাম, যাতে মুখ তুললেই আমাকে দেখতে পান মিস হ্যাভিশ্যাম। অনেক, অনেকক্ষণ পর—কতক্ষণ আমি বলতে পারবো না—মুখ তুললেন তিনি। এবং চমকে উঠলেন। অস্ফুটে

উচ্চারণ করলেন :

'এ-কী সত্যি ?'

'হ্যাঁ সত্যি আমি লিপ। মিস্টার জ্যাগার্সের কাছে কাল আপনার চিরকুট পেয়ে আর সময় নষ্ট করিনি।'

'ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ !'

একটা চেয়ার টেনে আমি বসলাম তাঁর সামনে। অমনি সম্পূর্ণ নতুন এক অভিব্যক্তি ফুটলো তাঁর মুখে। যেন ভয় পাচ্ছেন আমাকে।

'সেদিন তুমি বলছিলে হারবার্টের জন্যে কী একটা যেন করলে তুমি খুশি হবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, খুব—খুবই খুশি হবো।'

'কী সেটা ?'

হারবার্টের শুরুর ইতিহাস আমি খুলে বললাম। শুনলেন মিস হ্যাভিশাম তারপর প্রশ্ন করলেন :

'কত টাকা হলে ওর সমস্যার সমাধান হয় ?'

'নয়শো পাউণ্ড,' ভয়ে ভয়ে আমি বললাম। ভাবছিলাম নয়শো পাউণ্ড শুনেই চাঁদা তাড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠবেন। কিন্তু না, তেমন কিছু করলেন না মিস হ্যাভিশাম। শান্ত কণ্ঠে বললেন :

'ঠিক আছে, তবে নয়শো পাউণ্ড, কিন্তু আমি যে টাকা দিয়েছি তা ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ জানতে না পারে।'

'পারবে না,' আমি বললাম।

'হারবার্টের এই উপকারটুকু হলে তুমি একটু হলেও শান্তি পাবে মনে ?'

'একটু না, বেশ পাবো।'

'তুমি কি খুব বেশি অশান্তিতে আছো ?'

'কেমন অশান্তি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কেন তা-ও বলতে পারবো না।'

'আমি কিছু করতে পারি তোমার এই অশান্তি কমানোর জন্যে ?'

'না, ধন্যবাদ। আপনি কেন কেউই আমার জন্যে কিছু করতে পারবে না। আপনি করতে চেয়েছেন একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

মিস হ্যাভিশ্যাম কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে একটা চিরকুটে কিছু লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন :

'এটা জ্যাগার্সকে দিলেই ও তোমাকে দিয়ে দেবে নয়শো পাউণ্ড।'

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম মিস হ্যাভিশ্যামকে। পর-মুহূর্তে দেখি তাঁর দুচোখে অশ্রু। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো, পিপ,' বললেন মিস হ্যাভি-শ্যাম। 'আমার ভাঙা হৃদয় ধুলোর সাথে মিশে যাওয়ার পরও যদি পারো কোরো।'

'ও মিস হ্যাভিশ্যাম! একথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনার চেয়ে অনেক বড় বড় ভুল অনেকেই করেছে। আসলে আমার ভাগ্যটাই যেন কেমন। কোথা থেকে কী হয়ে গেল!'

মিস হ্যাভিশ্যাম চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন :

'ওহ! এ আমি কী করলাম!'

'আমাকে আঘাত দিয়েছেন মনে ক'রেই তো একথা বলছেন

তাহলে শুনুন, যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক, এস্টেলাকে আমি চির-দিন ভালোবাসবো।—ওর বিয়ে কি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।···ওহ! এ আমি কী করলাম!' এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ-লেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

আমি কী করবো, কিভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পেলাম না।

'পিপ! পিপ! সেদিন এস্টেলাকে যা তুমি বলেছিলে তা শোনার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি কী ক্ষতি তোমার করেছি! ওহ!'

'মিস হ্যাভিশ্যাম,' ভদ্রমহিলা একটু শান্ত হওয়ার পর আমি বললাম, 'আমার ব্যাপারটা আপনি মন থেকে দূর ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু এস্টেলার ব্যাপারটা আলাদা। ওর সত্যিকারের স্বভাবটা ফিরিয়ে আনার জন্যে যদি কিছু করতে পারেন, হাজার বছর আক্ষেপের চেয়ে ভালো কাজ হবে সেটা।'

'জানি, জানি! কিন্তু, পিপ, বাবা, বিশ্বাস করো, ও যখন প্রথম এখানে আসে, ভেবেছিলাম আমার মতো দুঃখ যেন না পেতে হয় ওকে শুধু সে ব্যবস্থাই করবো। কিন্তু বয়েসের সাথে সাথে যতই ও সুন্দরী হতে লাগলো আমি ততই হৃদয়হীন হওয়ার শিক্ষা দিতে লাগলাম ওকে। কেন যে এমন করলাম! ওহ! আমার জীবনের সব কাহিনী শুনলে বুঝতে কী দুঃখ আমার মনে।'

'মিস হ্যাভিশ্যাম, এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমি অনেক কিছুই শুনেছি, জেনেছি। বোধহয় সেজন্যেই আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। এখন এস্টেলা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করার—'

পূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'করো।'

'ও কার মেয়ে?'

মাথা নাড়লেন তিনি।

'জানেন না?'

আবার মাথা নাড়লেন মিস হ্যাভিশ্যাম।

'মিস্টার জ্যাগার্স ওকে নিয়ে এসেছিলেন এখানে নাকি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?'

'নিয়ে এসেছিলো।'

'কেন?'

'দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ থেকে থেকে আমার জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তখন একদিন জ্যাগার্সকে বলেছিলাম তার জানা শোনার ভেতর কোনো অনাথ মেয়ে থাকলে যেন আমাকে এনে দেয়, আমি নিজের মেয়ের মতো মানুষ করবো। কিছুদিন পর এক রাতে জ্যাগার্স এস্টেলাকে নিয়ে আসে এখানে।'

'তখন ওর বয়েস কত?'

'দু'তিন বছর হবে।'

মলিই যে এস্টেলার মা এব্যাপারে আমার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিলো তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল মিস হ্যাভিশ্যামের জবাবে।

মিস হ্যাভিশ্যামের কাছ থেকে চিরবিদায় নেয়ার আগে শেষ-বারের মতো একবার এবাড়ির উঠানে, অবহেলিত বাগানে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে হলো। নেমে এলাম নিচে। রাতের তারাজ্বলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কত স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগলো মানসপটে। প্রতিটির সাথে জড়িয়ে আছে এস্টেলা। কতক্ষণ

ঘুরলাম বলতে পারবো না ; হঠাৎ মনে হলো, এবার যেতে হয়।

বিদায় নেয়ার জন্যে মিস হ্যাভিশ্যামের ঘরে গেলাম। ফায়ার প্লেসের সামনে চেয়ার টেনে বসেছেন তিনি। আমার দিকে পিঠ। পা দুটো বাড়ানো সামনে। মাথাটা নামানো বুকের ওপর।

থাক আর বিদায় নেয়ার দরকার নেই, চুপচাপ চলে যাই, ভেবে ঘুরে দাঁড়াতে যাবো ; এই সময় দেখলাম আগুনের বড় একটা শিখা লাফিয়ে উঠলো। একই সময় তীব্র তীক্ষ্ণ আতঙ্কিত চিৎকার ক'রে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস হ্যাভিশ্যাম। ততক্ষণে তাঁর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলেন তিনি।

বাগানে হাঁটতে হাঁটতে আমার ওভারকোটটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম। মিস হ্যাভিশ্যামের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে দেখেই আমি ওটা জেলে ধরে ছুটে গেলাম। কোটটা যথাসম্ভব ভালো ক'রে জড়িয়ে দিলাম মিস হ্যাভিশ্যামের গায়ে। তাঁর শরীরের যে সব অংশ কোটের ভেতর চাপা পড়লো না সেসব অংশের আগুন নেভানোর জন্যে হাত দিয়ে চাপড় মারতে লাগলাম। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারলাম মিস হ্যাভিশ্যামের পুরো শরীর থেকে। ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

এদিকে চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিলো বাড়ির একমাত্র কাজের মেয়েটা। ও ব্যাপার দেখে এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে ছুটে গেছে মানুষজন ডাকতে।

মিস হ্যাভিশ্যামের অচেতন দেহটা পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে পাশের ঘরের বড় টেবিলটার কাছে শুইয়ে দিলাম। মুহ্যমানের মতো

বসে রইলাম আমি পাশে। কেবলি মনে হচ্ছে আমি সরে গেলেই আবার আগুন গ্রাস করবে তাঁকে। একটু পরেই লোকজন এলো। ডাক্তার এলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম আস্তে আস্তে। এবং প্রথম বারের মতো টের পেলাম, আমার দু'হাতই পুড়েছে মারাত্মক ভাবে।

ডাক্তারের মুখে শুনলাম, এস্টেলা এখন প্যারিসে। ডাক্তারই তার কাছে খবর পাঠানোর দায়িত্ব নিলেন। আমি নিলাম মিস্টার ম্যাথু পকেটকে খবর দেবার ভার।

মিস হ্যাভিশ্যামের চিকিৎসা করার পর আমার হাতের পরিচর্যা করলেন ডাক্তার। তারপর আমি গেলাম মিস হ্যাভিশ্যামের কাছে বিদায় নিতে। জ্ঞান ফিরেছে তাঁর, তবে পুরো নয়, প্রলাপ বকছেন এখন। বার বার একই কথা বলছেন।

'ওহ! কী করেছি আমি! ···আমি শুধু চেয়েছিলাম আমার মতো দুঃখ যেন না পায় ও!···আমাকে ক্ষমা কোরো পারলে!' বার বার বার বার এই তিনটি বাক্য আউড়ে যেতে লাগলেন তিনি।

# তেইশ

পরদিন ভোরের কোচে লণ্ডন ফিরে এলাম। রাতে দুবার এবং রওনা হওয়ার আগে একবার হাতের ব্যাণ্ডেজ বদলেছি। হোটেলে ফেরার পর হারবার্ট আরেকবার বদলে দিলো। ওকে আমি প্রথম যে প্রশ্ন করলাম তা হলো :

'এদিকে সব ঠিক ঠাক আছে তো ?'

'হ্যাঁ, হ্যানডেল, সব ঠিক আছে,' বললো হারবার্ট। 'কাল প্রোভিসের সঙ্গে দু'ঘণ্টা আলাপ হলো।'

'ক্লারা কোথায় ছিলো ?'

'কোথায় আবার ? একবার বাবার কাছে যাচ্ছিলো একবার আমাদের কাছে আসছিলো। বুড়ো বোধহয় আর বেশি দিন টিকবে না।'

'তারপর তোমরা বিয়ে করবে ?'

'তা না হলে ও থাকবে কার কাছে ? কোথায় ? যাক শোনো, প্রোভিসের কাছে কী শুনলাম—'

হারবার্ট যা বললো তা সংক্ষেপে এই : একসময় প্রোভিসের স্ত্রী

ছিলো, ফুটফুটে একটি মেয়েও ছিলো। মেয়েকে সে সত্যিই ভালো-বাসতো। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা ছিলো না। মহিলা ছিলো ভীষণ ঈর্ষা আর প্রতিশোধপরায়ণ। ঈর্ষার বশে এক মহিলাকে সে খুন করে। খুনের দায়ে বিচার হয় তার। মিস্টার জ্যাগার্স ছিলেন উকিল। নানা যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার ক'রে তিনি তাকে মুক্ত করেন খুনের দায় থেকে।

খুনোখুনির ব্যাপারটা যেদিন ঘটে সেদিনই রাতে প্রোভিসের কাছে কিছুক্ষণের জন্যে আসে তার স্ত্রী। এবং শপথ ক'রে বলে যায় মেয়েকেও সে মেরে ফেলবে (মেয়ে তখন মহিলার কাছেই ছিলো)। এরপর আর কখনো তাকে দেখেনি প্রোভিস।

'মহিলা তার শপথ রেখেছিলো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রোভিসের ধারণা রেখেছিলো,' জবাব দিলো হারবার্ট। 'স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো না সুব্যবহার করতো কিছু বলেনি প্রোভিস। তবে একটা কথা বলেছে, তাদের চার পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে সে সবসময়ই দুঃখ বোধ করেছে মহিলার জন্যে। সে কারণে হত্যার অপরাধে যখন স্ত্রীর বিচার হয় তখন প্রোভিস গা ঢাকা দিয়ে ছিলো, পাছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে, তার স্ত্রী বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে। কিন্তু তার কোনো সন্ধান আর সে পায়নি।'

'কতদিন আগের ঘটনা এসব?'

'বছর কুড়ি হবে, তেমনই বলছিলো প্রোভিস। ওকে যখন তুমি গোরস্তানে দেখ তখন তোমার বয়স কত?'

'বোধহয় সাত বছর চলছে।'

'তার মানে এ ঘটনার চার পাঁচ বছর পর। হুঁ, বুঝেছি, তোমার কাছে একটু সেবা একটু ভালো ব্যবহার পেয়ে ওর হারানো মেয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো।'

'হারবার্ট,' আমি বললাম, 'আমাকে দেখতে পাচ্ছো ভালো ক'রে?'

'হ্যাঁ, হ্যানডেল।'

'আমাকে ধরো।'

'ধরলাম।'

'তাকাও আমার দিকে। আমাকে উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে? পাগল মনে হচ্ছে?'

'কী বলছো, হ্যানডেল! একদম ঠিক আছো তুমি।'

'তাহলে শোনো, হারবার্ট, তোমার ক্লারার বাসায় যাকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি সে এস্টেলার বাবা।'

এস্টেলার পিতৃ মাতৃ পরিচয় আমার আর অজানা নেই। কিন্তু এই জানার সপক্ষে প্রমাণ দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে প্রমাণ?

পোড়া হাত নিয়েই আমি মিস্টার জ্যাগার্সের অফিসের দিকে চললাম। সেখানে মিস হ্যাভিশ্যামের চিরকুট দেখাতেই মিস্টার জ্যাগার্সের নির্দেশে ওয়েমিক আমার হাতে ন'শো পাউণ্ড তুলে দিলেন।

মিস্টার জ্যাগার্সকে আমি মিস হ্যাভিশ্যামের শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা জানালাম। এবং বললাম দুর্ঘটনার আগে তাঁকে আমি এস্টে-

লার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মিস হ্যাভিশ্যাম যতটুকু জানেন বলেছেন আমাকে।

'তাই নাকি, পিপ!' একটু যেন বিদ্রূপের সুর মিস্টার জ্যাগার্সের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।'

'তা কী বললেন উনি?'

'যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি আমিই জানি। এস্টেলার মা কে জানি আমি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ, আপনিও তাকে চেনেন।'

'আচ্ছা!'

'শুধু মা নয়, এস্টেলার বাবা কে তা-ও আমি জানি। তার নাম প্রোভিস।'

মিস্টার জ্যাগার্সের মতো শক্ত মানুষও না চমকে পারলেন না একথা শুনে।

'কোন প্রমাণের ভিত্তিতে একথা দাবি করছে প্রোভিস?' তড়বড়িয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'প্রোভিস কোনো দাবি করেনি। তার মেয়ে যে বেঁচে আছে এখবরই সে জানে না।'

এরপর আমি সবিস্তারে বললাম কেমন ক'রে আমি টুকরো টুকরো কাহিনী বিভিন্নজনের মুখে শুনে এবং কিছু কিছু ব্যাপার দেখে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে সিদ্ধান্তটা টেনেছি। ওয়েমিকের নামটা উহ্য রাখলাম। শেষে যোগ করলাম, 'এখন বলুন কেন আপনি এস্টেলাকে মিস হ্যাভিশ্যামের হাতে তুলে দিয়েছিলেন?'

মিস্টার জ্যাগার্স কি সহজে পেটের কথা মুখে আনতে চান? অনেক সাধ্য সাধনার পর তাঁকে দিয়ে বলাতে পারলাম, আমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁর পরিচারিকা মলিই এস্টেলার মা। আর সব শোনার পর তাঁরও এখন ধারণা হচ্ছে প্রোভিসই ওর বাবা। কেন এস্টেলাকে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতে দিয়ে এসেছিলেন সে প্রসঙ্গে মিস হ্যাভিশ্যামের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। বাড়তি যেটুকু বললেন তা হলো: মলি খুব গরিব ছিলো আর বদ পরিবেশে থাকতো। ঐ পরিবেশে মানুষ হয়ে ছোট্ট মেয়েটা নষ্ট হোক তা তিনি চাননি। সবশেষে বললেন:

'দেখ, পিপ, ব্যাপারটা তুমি জেনে ফেলেছো, ভালো কথা, কিন্তু আমি আশা করবো এই জানাটা শুধু তোমার ভেতরেই থাকবে। ভেবে দেখ, আজ এসত্য প্রকাশ পেলে বাবা, মা বা মেয়ে কারো কোনো উপকার হবে? সবচেয়ে বড় যেটা, এস্টেলা বিয়ে করে সংসার পেতেছে। একথা ওর স্বামীর কানে উঠলে তার ভেতর কী প্রতিক্রিয়া হবে, বুঝতে পারছো? এস্টেলা অসুখী হোক এ নিশ্চয়ই তুমি চাও না?'

আমি কথা দিলাম, গোপন সত্যটা গোপনই রাখবো।

মিস্টার জ্যাগার্সের অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সোজা স্কিফিন্স-এর ভাইয়ের কাছে গেলাম। তাকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম ক্লারিকারকে। মিস হ্যাভিশ্যামের দেয়া ন'শো পাউণ্ড তাকে দিয়ে হার-বার্টের অংশীদারীর ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করলাম। ক্লারিকার জানালো, শিগগিরই সে মধ্যপ্রাচ্যে একটা শাখা খুলবে তার

প্রতিষ্ঠানের এবং হারবার্টকেই তার ভার দেবে।

বুঝলাম, এই দুঃসময়ে হারবার্টের সাথেও আমার বিচ্ছেদ আসন্ন।

আরো কিছুদিন কাটলো। আমার হাতের পোড়া ক্ষত পুরো না শুকালেও অনেকটা ভালোর দিকে। এই সময় এক সোমবার মিস্টার ওয়েমিকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম ডাকে। তাতে লেখা :

ওয়ালওয়ার্থ। পড়া শেষ হলেই এটা পুড়িয়ে ফেল। আগামী বুধবার যা করার করতে হবে, অবশ্য যদি করতে চাও। এবার পুড়িয়ে ফেল এটা।

হারবার্টকে চিঠিটা দেখিয়ে আগুনে ফেলে দিলাম।

'এখনও তোমার হাতের যা অবস্থা তাতে তোমার পক্ষে দাঁড় টানা তো অসম্ভব,' বললো হারবার্ট। 'আরেকজন লোক দরকার আমাদের।...আচ্ছা স্টারটপকে নিলে কেমন হয়? ও লোক ভালো; দাঁড় টানায়ও ওস্তাদ। আমাদের ভালোবাসে। আমার মনে হয় ওর ওপর নির্ভর করা যাবে।'

আমি একটু ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর বললাম, 'কতটুকু বলবে ওকে?'

'বিশেষ কিছুই না। বলবো, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। তারপর সময় মতো প্রোভিসকে নৌকায় তুলে নেবো। তোমাকে আর প্রোভিসকে জাহাজে তুলে দিয়ে আমরা ফিরে আসবো।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম।

নাশতা ক'রেই দু'জন বেরিয়ে পড়লাম খোঁজ খবর করতে। প্রথমেই গেলাম জাহাজঘাটায়। সেখান থেকে আমি গেলাম জাহাজে ওঠার এবং বিদেশে যাওয়ার জন্যে যেসব ছাড়পত্র লাগে সেসবের ব্যবস্থা করার জন্যে। হারবার্ট গেল স্টারটপকে বলতে। সন্ধ্যার দিকে ও যাবে ক্লারোদের বাসায়, প্রোভিসকে বুঝিয়ে বলবে কীভাবে কী করতে চাই আমরা।

ছাড়পত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে হোটেলে ফিরে দেখি আমার নামে একখানা চিঠি। তাতে লেখা:

যদি তোমার ভয় না করে তাহলে আজ বা কাল রাত ন'টায় জলার ধারে চুনের ভাটার কাছে যে জল-নিয়ন্ত্রণ ঘর (স্লুইস-হাউস) আছে সেখানে এসো। এলে তোমার চাচা প্রোভিস সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে। একা আসবে। আর আমার কথা কাউকে বলবে না। চিঠিটা সঙ্গে আনবে।

এমনিতে দুঃশ্চিন্তার পাহাড় আমার মাথায়। তার ওপর এই অদ্ভুত চিঠি। কী করবো এখন? হাতে সময় নেই একদম। পরশুদিন আমাদের রওনা হতে হবে। তার মানে গেলে আজই যেতে হবে, অর্থাৎ রওনা হতে হবে বিকেলের কোচে। হারবার্টও কাছে নেই যে পরামর্শ করবো। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিস হ্যাভিশ্যামের খোঁজ নেয়া হয়নি আর। গেলে সেটা নেয়া হবে। তাড়াতাড়ি হারবার্টের নামে একটা চিঠি লিখে রেখে বেরিয়ে পড়লাম কোচ ধরার জন্যে। লিখলাম, মিস হ্যাভিশ্যামকে দেখতে যাচ্ছি, কখন ফিরবো জানি না।

*  *  *

কোচ থেকে যখন নামলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ন'টা বাজতে এখনো বেশ দেরি। তাই প্রথমে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়িতেই গেলাম। জানতে পারলাম: এখনও উনি গুরুতর অসুস্থ। যদিও আগের চেয়ে একটু ভালো এখন।

ঠিক ন'টার সময় পৌঁছুলাম জলার ধারের জল-নিয়ন্ত্রণ ঘরে। কাউকে দেখতে পেলাম না আশপাশে। দরজায় টোকা দিলাম। কেউ সাড়া দিলো না। ফিরে যাবো কিনা ভাবতে ভাবতে দরজার শিকল ধরে টানলাম। খুলে গেল শিকল, সেই সাথে দরজা। দেখলাম ভেতরে একটা টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। এক কোণে একটা টুল আর এক ধারে একটা সাধারণ বিছানা। একটা উপর-কুঠুরি (লফ্‌ট) আছে ঘরটায়। ওতে কেউ থাকতে পারে ভেবে চিৎকার করলাম:

'কেউ আছে নাকি ওখানে?' কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার চেঁচালাম, 'কেউ আছে?'

এবারও সাড়া নেই কোনো।

কী করবো ভেবে না পেয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই সময় নামলো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। সাথে তুমুল হাওয়া। বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচবার জন্যে ঘরের ভেতর চলে এলাম আবার। একটু পরে ক'টা বাজে দেখার জন্যে পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে বাতির দিকে ঘুরলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল কিছুর আঘাতে যেন নিভে গেল বাতি। পরমুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিলো আমার গলায়। বিকৃত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম:

'এবার তোকে হাতে পেয়েছি।'

'এ কী!' ধস্তাধস্তি করতে করতে চেঁচালাম আমি। 'কে তুমি?

বাঁচাও। বাঁচাও!'

আমার মুখ চেপে ধরলো কর্কশ একটা হাত। তারপর দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো আমাকে। পোড়া হাত দুটোর যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলো।

'চেঁচাবি তো খুন ক'রে ফেলবো!' বাঁধা শেষ ক'রে চিৎকার করলো লোকটা। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে মোমবাতি জ্বাললো আবার। লোকটা আর কেউ নয়, অরলিক।

'এবার তোকে হাতে পেয়েছি!' বললো সে।

'বাঁধন খুলে দাও! যেতে দাও আমাকে!' চেঁচালাম আমি।

'দেবো দেবো, যেতে দেবো নিশ্চয়ই। চাঁদে যেতে দেবো, তারায় যেতে দেবো, সময় হোক আগে।'

'কেন আমাকে এখানে ডেকে এনেছো!'

'এখনো জানো না? আমি নিজের হাতে কাজটা করবো। ও শত্রু! শত্রু!' ঘরের অন্ধকার এক কোণ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে এলো সে। আমার দিকে তাক ক'রে চেঁচালো: 'চিনিস এটা?'

'হ্যাঁ।' মিস হ্যাভিশামের বাড়িতে অরলিকের ঘরে দেখেছিলাম বন্দুকটা।

'তোর জন্যেই ও বাড়ির কাজ গেছিলো আমার, বল?'

'আর কী করার ছিলো আমার?'

'ঐ একটা কারণই যথেষ্ট তোকে খুন করার জন্যে। কিন্তু শুধু ওটা নয়, আরো কারণ আছে। তুই আমার আর আমার পছন্দের মেয়ে মানুষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলি। তোরই কথায় ও অপছন্দ করতে শুরু করেছিলো আমাকে।'

'আমি কিছুই বলিনি, তোমার ব্যবহারের কারণেই ও অপছন্দ করতো তোমাকে।'

'মিথ্যেবাদী! ভেবেছিস আমি কিছু জানি না? বুঝি না? তুই পারলে আমাকে দেশছাড়া করার চেষ্টা করতিস।'

'আমাকে কী করতে যাচ্ছো তুমি?'

'তেমন কিছু না, তোর প্রাণটা নিয়ে নেবো শুধু। ও শত্রু। শত্রু। কিন্তু তার আগে একটা মজার খবর শোনা উচিত তোর। তোর বোনের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী জানিস?'

'তুই, বদমাশ।'

'মিথ্যে কথা।' ক্ষ্যাপার মতো কণ্ঠস্বর অরলিকের। 'তুই। তোর জন্যেই মরেছে তোর বোন। আজ যেমন পেছন থেকে তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেদিন ওর ওপরেও এমনি পড়েছিলাম। কিন্তু দোষ আমার নয়। তোর দোষে সেদিন আমি মার খেয়েছিলাম। তুই চাইতেই ছুটি পেয়ে গেলি, আর আমি পেলাম মার। সব দোষ তোর। তুই-ই তোর বোনকে মেরেছিস, আজ তার মূল্য দিবি।

'অনেক দিন ধরেই তোকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছি, আজ সুযোগ পেয়েছি। শুনে রাখ, তোর হোটেলে যে রাতে প্রোভিস আসে সেরাতে আমার গায়েই তোর পা ঠেকেছিলো। কয়েদী ম্যাগ-উইচ কী ক'রে প্রোভিস হয়েছে তা আমি জানি বুঝলি। কম্পে-সনের সাথে ওর সম্পর্কও আমার জানা আছে। আজ তোকে শেষ করবো, তারপর করবো তোর সাধের চাচাকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা।'

বলতে বলতে অরলিক পেছন ফিরে ঝুঁকলো নিচের দিকে।

দেখলাম ভারি একটা হাতুড়ি তুলে নিচ্ছে সে। অমনি গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চিৎকার করলাম আমি :

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

সাঁ ক'রে ঘুরলো আমার দিকে অরলিক। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ভেসে এলো গলার আওয়াজ। আমার নাম ধরে ডাকছে কেউ। এক সেকেণ্ড পরে কয়েক জনের দৌড়ে আসার শব্দ। দরজায় মানুষের মুখ দেখতে পেলাম। তারপর দেখলাম অরলিক হাতুড়ি ফেলে লড়ছে তাদের সাথে। জ্ঞান হারালাম আমি।

জ্ঞান হওয়ার পর দেখি আমার হাত পায়ের বাঁধন খোলা। পাশে হারবার্ট, স্টারটপ আর আমাদের শহরের দরজি দোকানের সেই ছেলেটা।

হারবার্ট বললো, স্টারটপের সাথে কথাবার্তা সেরে ওরা দু'জনই আমার ওখানে আসে। টেবিলের ওপর পায় আমাকে লেখা অরলিকের আর হারবার্টকে লেখা আমার চিঠিটা। তাড়াহুড়োয় আমি অরলিকের চিঠিটা ফেলে এসেছিলাম। চিঠি দুটো পড়ে ওদের মনে সন্দেহ হয়। তখনই ওরা চলে আসে আমাদের শহরে। এবং লোকজনকে জিজ্ঞেস ক'রে পৌঁছায় জলার ধারের জল-নিয়ন্ত্রণ ঘরে। শহর থেকে দরজি দোকানের ছেলেটা যোগ দেয় ওদের সাথে। আর, কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর পালিয়েছে অরলিক।

রাতটা শহরের হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে আমরা লণ্ডন ফিরলাম।

# চব্বিশ

বুধবার সকালে হারবার্ট, স্টারটপ আর আমি নৌকায় চড়লাম। পথে প্রয়োজন হতে পারে এমন কিছু জিনিস আমি একটা থলেয় ভরে নিয়ে নিয়েছি সঙ্গে। হারবার্ট আর স্টারটপ দাঁড় বাইতে লাগলো, আমি ব্যথা হাতে কোনোমতে হাল ধরে রইলাম। আমরা যেদিকে যাচ্ছি নদীর স্রোত এখন সেদিকেই যাচ্ছে। ফলে দ্রুত চলছে নৌকা। শিগগিরই আমরা লণ্ডন ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম। অবশেষে পৌছুলাম মিলপণ্ড ব্যাঙ্ক-এ ক্লারাদের বাড়ির সামনে।

প্রোভিস এসে উঠলো নৌকায়। মাঝিদের মতো পোশাক পরেছে সে। মাথায় মাঝিদের টুপি। মোটেই চিন্তিত মনে হলো না তাকে। বেশ খোশমেজাজে আছে। তার জন্যে এত কিছু করছি বলে আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

এগিয়ে চললাম আমরা।

বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় হামবুর্গের পথে লণ্ডন ছাড়বে একটা বাষ্পীয় জাহাজ। একই সময়ে রটরডামের পথে ছাড়বে আরেকটা জাহাজ। আমরা ঠিক করেছি জাহাজ যে পথে যাবে তার কাছাকাছি

কোথাও বুধবার রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে চলন্ত জাহাজে উঠবো। দুটো জাহাজের একটাতে না একটাতে উঠে পড়তে পারবো এবিষয়ে আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ।

সারাদিন দাঁড় টেনে চললাম আমরা। এর ভেতর খাবার কেনার জন্যে বার দুই থামলাম দুই জায়গায়। সন্ধ্যার সময় নদীতীরে এক সরাইখানা দেখে নৌকা কূলে নিয়ে গেলাম। সরাইখানার দুটো কামরা ভাড়া নেয়া হলো রাতে থাকার জন্যে।

রাতের খাওয়া যখন খাচ্ছি এই সময় এক উদ্বেগজনক ব্যাপার ঘটলো। সরাইওয়ালা এসে জিজ্ঞেস করলো, চার দাঁড়ের কোনো নৌকা আমরা দেখেছি কিনা। পুলিস এ ব্যাপারে খোঁজখবর করছে। আমরা বললাম, দেখিনি।

খাওয়ার পর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। সারা রাতে সামান্যই ঘুমালাম আমি। একটু পরপর উঠে জানালার কাছে যাওয়া, নদীর ঘাটে আমাদের নৌকা ঠিক মতো আছে কিনা দেখা, তারপর আবার এসে শোয়া—এ ই করলাম। শেষ রাতে একবার জানালার কাছে গিয়ে দেখি দু'জন লোক গভীর মনোযোগের সাথে দেখছে আমাদের নৌকা। উদ্বেগ বেড়ে গেল আমার।

পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উঠে পড়লাম। মূল পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল করা হলো। ঠিক হলো, আমি আর প্রোভিস হেঁটে চলে যাবো যে জায়গায় জাহাজে উঠবো বলে ঠিক করেছি সেখানে। হারবার্ট আর স্টারটপ নদীতে নৌকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে। দুপুরবেলায় কূল থেকে আমাদের তুলে নিয়ে

উঠিয়ে দেবে জাহাজে। লণ্ডন থেকে আমরা এত দূরে এসে পড়েছি যে আমি আর প্রোভিস যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবো জাহাজের সেখানে পৌঁছাতে প্রায় বেলা একটা হয়ে যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রোভিস আর আমি পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট স্থানে। প্রোভিসকে এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে আমি গিয়ে বসলাম নদীতীরে। সময় গড়িয়ে চললো একটু একটু ক'রে।

অবশেষে দুপুর হলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম হারবার্ট আর স্টারপটকে। ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাকে। নৌকা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো তীরের দিকে। নৌকা কূলে ভেড়ার পর প্রোভিসকে ডাকলাম আমি। এবং দু'জন উঠে পড়লাম নৌকায়।

হারবার্ট আর স্টারটপ দাঁড় টেনে নৌকা নিয়ে গেল জাহাজ যেখান দিয়ে যাবে সেখানে। একটু পরেই দূরে দেখা গেল পর পর দুটো জাহাজের ধোঁয়া। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই হঠাৎ তীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেশ বড় একটা দাঁড়টানা নৌকা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। প্রোভিসকে আমি নড়াচড়া করতে বারণ করলাম। মাথা মুখ ভালো ক'রে ঢেকে বসতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম জাহাজটা আমাদের খুব কাছে এসে গেল। অনুসরণ ক'রে আসা নৌকাটাও। স্টারটপ ভালো ক'রে দেখে বললো, হামবুর্গের জাহাজ ওটা। আমি তাকিয়ে আছি অনুসরণকারী নৌকাটার দিকে। দাঁড়ীরা ছাড়াও দু'জন লোক আছে ওতে। একজন হালে বসা। অন্যজন একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে মাঝখানে। মুখ ঢাকা তার।

নৌকাটা দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের নৌকার গায়ে লাগলো।

হালে বসা লোকটা চিৎকার ক'রে উঠলো :

'দাঁড় টানা থামাও তোমরা! তোমাদের নৌকায় একজন ফেরার আসামী আছে। ঐ যে! ওর নাম অ্যাবেল ম্যাগউইচ। প্রোভিস নামেও ও পরিচিত। আমি ওকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। বাকিরা আশাকরি কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করবে না।'

আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না নৌকাটা পুলিসের। ওদের দু'জন দাঁড় রেখে হাত বাড়িয়ে দিলো প্রোভিসকে ধরে তাদের নৌকায় তুলে নেয়ার জন্যে। অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল এসব। কী ওরা করছে ভালো মতো বোঝারও সময় পেলাম না আমরা।

এদিকে জাহাজটাও এসে পড়েছে। আমরা সরে না গেলে সোজা এসে আঘাত হানবে আমাদের নৌকায়। খুবই বিপদজনক অবস্থা। জাহাজ থেকে ভেসে আসছে মানুষজনের চিৎকার। সামনে থেকে সরে যেতে বলছে আমাদের। কেউ একজন চিৎকার ক'রে এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই থেমে গেল জাহাজ। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। খুব বেশি কাছে এসে পড়েছে জাহাজটা। তার বড় বড় ঢেউয়ে ভয়ানকভাবে দুলতে শুরু করেছে নৌকা। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুটো নৌকারই মুখ ঘুরে গেছে। প্রোভিসকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলো যারা তারা তাল সামলানোর জন্যে হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই সময় আচমকা লাফ দিলো প্রোভিস। না পানিতে নয়, অন্য নৌকার মাঝখানে বসা মুখ ঢাকা লোকটাকে লক্ষ্য ক'রে। লোকটাকে সে কোটের কলার ধরে টেনে নিয়ে আসতে চাইলো আমাদের নৌকায়। লোকটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো

প্রাণপণে। বাধা দিতে গিয়ে অনাবৃত হয়ে পড়লো তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলাম আমি। অনেক অনেক বছর আগে আমাদের গ্রামের জলার ধারে দেখা অন্য কয়েদীটা। কম্পেসন।

জাহাজের সামনে থেকে ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা সরে এসেছি আমরা ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে। জাহাজের ওপর থেকে কেউ একজন একটা নির্দেশ দিলো। অমনি প্রচণ্ড গর্জন তুলে চলতে শুরু করলো এঞ্জিন। প্রবল আলোড়ন উঠলো জলে, সেই সাথে ঢেউ। একদিকে প্রোভিস কম্পেসনের ধস্তাধস্তি, অন্য দিকে ঢেউ। আমাদের নৌকা উল্টে গেল।

জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম আমি। সাঁতার জানি ভালোই, কিন্তু হাতের ব্যথায় সাঁতরাতে পারছি না। যখন প্রায় ডুবতে বসেছি তখন পুলিসের নৌকা থেকে কয়েকটা হাত তুলে নিলো আমাকে। হারবার্ট আর স্টারটপ আমাদের নৌকা ওল্টানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ঐ নৌকায় উঠে পড়তে পেরেছিলো। আর প্রোভিস নৌকা যখন ওল্টায় তখনও ছাড়েনি কম্পেসনের কলার। ফলে ও পানিতে পড়েছে কম্পেসনকে নিয়ে।

আমি নৌকায় ওঠারও বেশ কিছুক্ষণ পর প্রোভিস ভেসে উঠলো। কিন্তু কম্পেসনকে আর দেখা গেল না। প্রোভিসকে নৌকায় তোলার পর দেখলাম বুকে আর মাথায় ভয়ানক চোট পেয়েছে সে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। জাহাজের তলে চলে গিয়েছিলো ও স্রোতের টানে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে জাহাজের পাখায় জড়িয়ে যাওয়া থেকে। কম্পেসন সম্ভবত মারা পড়েছে পাখায় জড়িয়ে, বললো প্রোভিস। নৌকায় তুলেই প্রোভিসের হাত পায়ে

বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে পুলিস।

হারবার্ট আর স্টারটপ লণ্ডনে ফিরলো কোচে। আমি নৌকায়ই রইলাম। প্রোভিসকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হলো না। তার পাশে বসে নিচু কণ্ঠে বললাম :

'আমাকে দেখতে আসার জন্যেই আজ আপনার এই অবস্থা।'

'বাপ,' বললো প্রোভিস, 'সেজন্যে আমার একটুও দুঃখ নেই। আমার ছেলেকে আমি দেখতে পেয়েছি, এতেই আমি খুশি। আমি জানি, আমার ছেলে আমাকে ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। আমার সব টাকা তুমিই তো পাবে।'

বেচারা প্রোভিস! জানে না ও যা ভাবছে তা হবে না! ইংল্যাণ্ডে ফিরে ও আইন লঙ্ঘন করেছে। শাস্তি হিশেবে ফাঁসি তো হবেই, ওর সব সম্পত্তি বা টাকা পয়সাও বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে সরকার। আমি কিছুই পাবো না।

রূঢ় সত্যটা প্রকাশ ক'রে আমি তার মনে আর আঘাত দিতে চাইলাম না।

সম্ভবত আমার জীবনের করুণতম সময় এটা। হারবার্ট চলে যাচ্ছে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ওদের কায়রো শাখার দায়িত্ব নিতে। এই দুঃসময়ে আমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে ওর মনেও খুব দুঃখ। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে ওকে। ও রওনা হওয়ার দিন কয়েক আগে একদিন ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো :

'ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি কিছু ভাবছো, হ্যানডেল?'

'এখনো ভাবার সময় হয়নি,' আমি বললাম।

'তবু এ নিয়ে আমরা একটু আলাপ করতে পারি না এখন?'

'পারি।'

'আমাদের কায়রো শাখায় একজন—'

'কেরানীর দরকার হবে, তাই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু চিরদিনই যে কেরানী থাকবে তা কেন ভাবছো? হয়তো একদিন তুমি ব্যবস্থাপক হয়ে যাবে। শাখা বড় হলে ব্যবস্থাপকও তো লাগবে আমাদের। তারপর, কে জানে?—হয়তো একদিন অংশীদারও হয়ে যাবে। ক্লারার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করেছি আমি। ও বলেছে কিছুদিন পর আমরা যখন একসাথে থাকবো কায়রোয়, তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবে।'

'কিছুদিন পর মানে ওর বাবার মৃত্যুর পর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। মিসেস হুইম্পল-এর ধারণা বুড়ো শিগগিরই যাবে। যা বলছিলাম, ক্লারা আরো বলেছে স্বামীর বন্ধু হিশেবে তোমার সেবা যত্নের ত্রুটি করবে না ও। হ্যানডেল, আমি বলছি, তুমি চলে এসো। আজ না হয় ছ'মাস পরে, না হয় এক বছর পরে—যখন তোমার সুবিধা চলে এসো!'

'অতদিন দেরি করতে হবে না,' আমি বললাম। 'যদি যাই তো দু'চার মাসের মধ্যেই যাবো।'

পরের শনিবার হারবার্টকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলাম আমি।

বাড়ি ফিরে যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি মিস্টার ওয়েমিক নেমে আসছেন।

'আমাদের সব চেষ্টা এভাবে বিফল হবে ভাবতেও পারিনি,' বললেন তিনি। 'কম্পেসন যে এখানেই ছিলো এবং গোপনে

গোপনে ম্যাগউইচের পেছনে লেগে ছিলো কল্পনা করিনি। এতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল।'

'সে নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই,' আমি বললাম, 'আমার দুঃখ বেচারি আমাকে দেখতে এসেই এভাবে ধরা পড়লো।'

বিদায় নেয়ার আগে মিস্টার ওয়েমিক পরের সোমবার সকালে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন :

'বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না। একটু বেড়াতে যাবো, তারপর খাওয়া দাওয়া, এই ধরো সব মিলিয়ে ঘণ্টাতিনেক।'

ভদ্রলোক এত কিছু করেছেন আমার জন্যে, অনুরোধটা ফেলতে পারলাম না।

সোমবার সকালে গেলাম তাঁর 'প্রাসাদে'। দুধ মেশানো রাম আর বিস্কুট খেতে দিলেন আমাকে। নিজেও খেলেন। খাওয়ার পর বললেন :

'চলো একটু বেড়িয়ে আসি।'

ক্যাম্বারওয়েল গ্রিন-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ তিনি বললেন :

'দেখ, একটা গির্জা! চলো ভেতরে যাই।'

আমি অবাক হলেও কিছু বললাম না। গির্জায় ঢুকলাম তাঁর পেছন পেছন। একটু পরেই দেখি পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকছেন মিস্টার ওয়েমিকের বাবা। বিয়ের পোশাক পরা এক মহিলার হাত ধরে আছেন তিনি।

'মিস্টার পিপ, দেখ, মিস স্কিফিন্স!' চিৎকার করলেন ওয়েমিক। 'বিয়ে ক'রে ফেললে কেমন হয়?'

নিমন্ত্রণের কারণ বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। বিয়ে হয়ে গেল মিস স্কিফিন্‌সের সাথে মিস্টার ওয়েমিকের। তারপর 'প্রাসাদে' ফিরলাম আমরা। খাওয়া দাওয়া হলো। খাবার দাবারের বেশ ভালো ব্যবস্থাই করেছিলেন ওয়েমিক।

নিউগেট কারাগারে বিচারের অপেক্ষা করছে প্রোভিস। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে দেরি হচ্ছে বলে বিচারেরও দেরি হচ্ছে। ভীষণ অসুস্থ প্রোভিস। জাহাজের তলে চলে গিয়ে সেই যে ব্যথা পেয়েছিলো বুকে আর মাথায় তা থেকেই শুরু অসুস্থতার। দিনে দিনে অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে ধাক্কাটা সামলাতে পারবে না হয়তো প্রোভিস। অবশ্য তাতে এক দিক দিয়ে ভালোই হবে। বেঁচে থাকলে ফাঁসির হাত সে এড়াতে পারবে না। মরে গেলে বরং এই সান্ত্বনা থাকবে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার।

আমি প্রত্যেক দিনই কারাগারে যাই তাকে দেখতে। কথা বলি তার সাথে। তার কথা শুনি। সব সময় আমরা কোনো না কোনো সুন্দর সুখকর প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করি। এতে মানসিক ভাবে একটু হলেও স্বস্তি বোধ করে প্রোভিস।

অবশেষে বিচারের দিন এলো। শারীরিক দুর্বলতার কারণে কাঠগড়ায় বসতে দেয়া হলো প্রোভিসকে। আর পাশে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে থাকার অনুমতি দেয়া হলো আমাকে।

অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল বিচার। খুবই সরল মামলা। প্রোভিসের সদাচরণের কথা বললেন মিস্টার অ্যাগার্স। উপনিবেশে ও সৎ, পরিশ্রমী জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলো, এবং

অপরাধপ্রবণতা ওর ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে তা-ও বললেম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রায় দিলেন বিচারক : ফাঁসি হবে আসামীর। শান্তভাবে রায় শুনলো প্রোভিস।

ফাঁসির দিন যত এগিয়ে আসছে ততই অবনতি হচ্ছে প্রোভিসের অবস্থার। আমি কায়মনে প্রার্থনা করছি, আরো দ্রুত অবনতি হোক, ফাঁসির হাত থেকে অন্তত বাঁচুক হতভাগ্য লোকটা।

এক সকালে গিয়ে আমি অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম তার ভেতর। কেমন যেন অস্থিরতা। আমাকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখ। এগিয়ে গিয়ে বসলাম তার পাশে।

'বাপ,' বললো প্রোভিস, 'ভাবছিলাম, বোধহয় দেরি ক'রে ফেললে। কিন্তু আমি জানি তুমি দেরি করতে পারো না।'

'কারাগারের ফটক এইমাত্র খুললো,' আমি বললাম। 'আমি বাইরে অপেক্ষা করছিলাম।'

'প্রত্যেক দিন তুমি আগে আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকো, তাই না, বাপ?'

'হ্যাঁ, আমি দেরি করতে চাই না।'

'আমি জানি! আমি জানি! ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন দেখো। তুমি সবসময় আমার কাছে আছো, আমাকে কখনো ছেড়ে যাওনি।'

আমি তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলাম। এক সময় একেই উপদ্রব মনে করেছিলাম ভাবতেই অন্তরটা অপরাধী হয়ে উঠলো আমার।

'একটা ব্যাপার দেখে খুব খুশি লাগছে,' বলে চললো সে, 'তুমি এখন আমাকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছো। আগে এমনটা

'পারতে না, তাই না? কী যে খুশি লাগছে আমার!'

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে প্রোভিস। শ্বাস নিচ্ছে অনেক কষ্টে।

'আজ বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ও নিয়ে ভেবো না,' মৃদু, শোনা যায় কি যায় না এমন স্বরে জবাব দিলো প্রোভিস।

জীবনের শেষ কথা বলা হয়ে গেল প্রোভিসের। মৃদু হেসে আমার হাত স্পর্শ করলো সে। স্পর্শটার অর্থ বুঝলাম আমি। হাতটা তুলে ওর বুকে রাখলাম। আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে আবার হাসলো সে অতিকষ্টে। স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। বুঝতে অসুবিধা হলো না, শেষ সময় আসন্ন প্রোভিসের।

'এই শেষ সময়ে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, ম্যাগ-উইচ,' তার কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

মৃদু একটা চাপ আমার হাতে।

'এক সময় আপনার একটা মেয়ে ছিলো মনে আছে?—যাকে আপনি খুব ভালোবাসতেন, যাকে আপনি হারিয়েছিলেন।'

এবার বেশ জোরে চাপ অনুভব করলাম হাতে।

'ও বেঁচে আছে এবং ভালো আছে। অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে। ধনী এক মহিলা ওকে মানুষ করেছেন। আমি ওকে ভালোবাসি।'

বুকের ওপর থেকে আমার হাতটা টেনে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ানোর চেষ্টা করলো প্রোভিস। পারলো না। হাতটা আবার পড়ে গেল বুকে। ওপরে পড়লো ওর হাত। তারপর এক দিকে হেলে পড়লো মাথাটা।

মারা গেছে প্রোভিস।

# পঁচিশ

এখন আমি সম্পূর্ণ একা। টেম্পল ইন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি, যেক'দিনের ভাড়া অগ্রিম দেয়া আছে সে দিন ক'টা পেরিয়ে গেলেই আমি ঘর ছেড়ে দেবো। তারপর কোথায় যাবো জানি না। এদিকে ঋণ শোধের কড়া তাগিদ এসে গেছে। ঋণের পরিমাণও অল্পস্বল্প নয়—একশো তেইশ পাউণ্ড, পনর শিলিং, ছয় পেন্স। দু'এক দিনের মধ্যে এটাকা শোধ করতে না পারলে জেলে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। কিন্তু এত টাকা জোগাড় করা এ মুহূর্তে এককথায় অসম্ভব আমার পক্ষে।

যেদিন ঋণ শোধের তাগিদ এলো সেদিনই সন্ধ্যায় ভীষণ শরীর খারাপ লাগতে লাগলো আমার। গত কয়েকটা সপ্তার দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আর স্নায়ু টান করা উত্তেজনায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে দেহ মন। সেদিনই রাতে শয্যা নিলাম আমি। প্রবল জ্বরে অচেতন হয়ে গেলাম। ক'দিন এরকম থাকলাম বলতে পারবো না। শুধু মনে আছে ছায়ার মতো অনেক লোক এসেছে গেছে। তাদের সাথে কথা বলেছি কি বলিনি জানি না। আস্তে আস্তে অনেক লোকের

জায়গা নিলো মাত্র একটা লোক। সে-ই আমার পাশে থাকে। সামান্য সময়ের জন্যে যখন চেতন অচেতনের মাঝামাঝি এক অবস্থায় আসি সেই একটা লোককেই দেখি আমার সেবা করছে। পাশে বসে আছে বা মাথায় পানি দিচ্ছে বা খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। চেতন অচেতনের মাঝামাঝি অবস্থাটা যখন আস্তে আস্তে দীর্ঘ হতে লাগলো তখন মনে হলো লোকটা জো। জো ছাড়া আর কার মনে এত মায়া এত দরদ আমার জন্যে? অবশেষে একদিন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো আমার। দেখলাম লোকটা বসে আছে আমার বিছানার পাশে চেয়ার টেনে। আমার মুখের দিকে দৃষ্টি।

'জো, তুমি!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, পিপ বাবু!' ওর স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর কানে এলো আমার।

'ওহ্ জো, জো, তোমার সাথে যে আচরণ করেছি তারপরেও তুমি সেবা যত্ন স্নেহ দিতে এসেছো আমাকে!' আমি বললাম। 'আমাকে মারো, গালাগালি করো! আমার অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দাও! আমার সাথে ভালো ব্যবহার কোরো না!'

জো আমার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো। 'পিপ বাবু, এসব কথা বলো না। আমি আর তুমি তো সব সময়ই বন্ধু। কোনোদিন তোমাকে আমি বকেছি বা মেরেছি যে আজ এ কথা বলছো?'

উঠে জানালার কাছে চলে গেল জো। আমার দিকে পিঠ তবু বুঝতে অসুবিধা হলো না, ও চোখ মুছছে। জো কি মানুষ না দেবতা আমি ভেবে পেলাম না। একটু পরে আবার এসে বসলো ও আমার পাশে। ক'দিন ধরে আমি অসুস্থ জিজ্ঞেস করলাম।

'এক মাসের ওপরে, পিপ,' বললো জো। 'আজ মে-র শেষ দিন। কাল জুনের এক তারিখ।'

'এই পুরোটা সময় তুমি এখানে, জো?'

'প্রায়। ডাকে একটা চিঠি পাই আমরা। তাতে জানতে পারি তোমার অসুস্থতার খবর। খবরটা পেয়েই আমি চলে এসেছি।'

অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। সুখের দিনে আমার এই অকৃত্রিম সুহৃদকে কী অবহেলাই না করেছি।

অনেক কথা হলো জো-র সঙ্গে। নানা প্রসঙ্গে, নানা বিষয়ে। আমাকে কে সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলো বললাম। শুনে জো ভীষণ অবাক হলো। অবশেষে একদিন মিস হ্যাভিশ্যামের কথা উঠলো। জো বললো, আমি অসুস্থ হওয়ার সপ্তাখানেক পরই মারা গেছেন ভদ্রমহিলা। বেশির ভাগ সম্পত্তি তিনি দিয়ে গেছেন এস্টেলাকে। তবে মৃত্যুর কয়েক সপ্তা আগে উইল পরিবর্তন করে মিস্টার ম্যাথ্যু পকেটকে দিয়ে গেছেন চার হাজার পাউণ্ড। উইলে নাকি তিনি লিখে গেছেন ম্যাথ্যু পকেটকে এই টাকা দিচ্ছেন আমি সুপারিশ করেছি বলে। এছাড়া মিস সারাহ পকেট, মিস জর্জিয়ানা আর মিসেস ক্যামিলাকেও যৎসামান্য অর্থ দিয়ে গেছেন তিনি।

আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। প্রথমে উঠে বসতে, তারপর দাঁড়াতে আরো পরে হাঁটতে শুরু করলাম। এখন জো আর বিডির কথাই শুধু ভাবি মনে মনে। কী অকৃতজ্ঞের মতোই না ব্যবহার করেছি ওদের সাথে। রোজই ভাবি ক্ষমা চাইবো জো-র কাছে, বিডির কাছেও। আরেকটা চিন্তা আছে আমার মাথায়। সেটা ঋণ শোধের। তবে আপাতত ওনিয়ে বিশেষ কিছু ভাবছি না। ও ব্যাপারে 'যা হয় হবে' এমন একটা মনের অবস্থা আমার।

এই সময় একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, জো নেই। ওর

কাপড়চোপড়ের ছোট্ট বাক্সটাও নেই। টেবিলে দেখলাম একটা চিঠি। তাতে লেখা :

বেশিদিন থাকার ইচ্ছে নিয়ে আসিনি, তাই চলে গেলাম। এখন তুমি সুস্থ, পিপ, আমাকে ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারবে আশা করি।

—জো।

পুনশ্চ : আমরা সবসময়ই বন্ধু।

চিঠির ভেতর আমার সমুদয় দেনা শোধের একটা রশিদ।

এতদিন ভাবছিলাম, পাওনাদাররা আমার সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। স্বপ্নেও ভাবিনি জো আমার সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমি না ভাবতে পারলেও জো তা-ই ক'রেছে। ঠিক করলাম, আর দেরি না, জো-র কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো আমার অকৃতজ্ঞতার জন্যে। বিডির কাছে আমার মনের কথা বলবো। বলবো :

'বিডি, এক সময় তুমি আমাকে পছন্দ করতে। আজও যদি আমার জন্যে তোমার মনে সেই অনুভূতি থেকে থাকে তাহলে আমাকে স্থান দাও তোমার জীবনে। বিডি, তুমি চাইলে এখন থেকে আমি গ্রামেই থাকবো। জো-র কামারশালায় কাজ করবো, নইলে অন্য কোনো কাজ খুঁজে নেবো। অথবা তুমি যদি চাও দূরে কোথাও চলে যাবো আমরা, যেখানে তুমি আর আমি আমাদের নিজেদের ভুবন রচনা করবো। যেখানে কঠিন পরিশ্রম ক'রে আমি আমাদের ভাগ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।'

*  *  *

গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই আমি বিডির খোঁজ করলাম। ওদের বাড়িতে গেলাম। দরজা জানালা সব বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই। গ্রামের নতুন স্কুলে শিককতা করে ও, শুনেছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি স্কুলও বন্ধ। কী একটা ছুটির দিন আজ। মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে অবশেষে জো-র কামারশালার দিকে রওনা হলাম। কিন্তু সেটাও বন্ধ।

এবার তাকালাম জো-র বাড়ির দিকে। না, জনহীন নয় বাড়িটা। ভেতর থেকে মানুষজনের উৎফুল্ল হাসি, কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে। জানালায় দেখলাম নতুন শাদা পর্দা উড়ছে। ফুল দিয়ে সাজানো জানালাগুলো। ব্যাপার কী জানবার জন্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি; উদ্দেশ্য জানালা দিয়ে উঁকি দেবো ভেতরে। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই দেখলাম জো আর বিডি হাত ধরাধরি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। দু'জনেরই পরনে নতুন ঝকঝকে পোশাক।

প্রথমে বিডি চিৎকার ক'রে উঠলো, যেন আমাকে নয়, আমার ভূত দেখেছে। পরমুহূর্তে আমি ধরা পড়লাম ওর বাহুবন্ধনে। আমি কান্না সামলাতে পারলাম না, ও-ও কেঁদে ফেললো।

'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, বিডি!'

'হ্যাঁ, পিপ।'

'জো, তোমাকেও দারুণ দেখাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, পিপ বাবু।'

আমি তাকাতে লাগলাম একবার জো-র দিকে একবার বিডির দিকে। তারপর—

'আজ আমার বিয়ের দিন,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো বিডি। 'জো-র

সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার!'

ওরা আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। বিডিকে বলবো বলে যেসব কথা গুছিয়ে রেখেছিলাম মনে তা মনেই রইলো। খাওয়া-দাওয়ার পর বিডিকে বললাম :

'বিডি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো লোকটাকে পেয়েছো তুমি স্বামী হিশেবে।' তারপর তাকালাম জো-র দিকে। 'আর, জো, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো স্ত্রীটিকে পেয়েছো তুমি। তোমার জীবন সুখ শান্তিতে ভরিয়ে তুলবে ও। বেশিক্ষণ থাকবো না আমি, জো। আবার কবে দেখা হবে জানি না। শিগগিরই আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি। ওখানে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে আমাকে যাতে তোমার ঋণ শোধ করতে পারি। ঐ টাকাটা যদি তুমি পরিশোধ না করতে জেলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।'

জো, বিডি, এপ্রসঙ্গে আর কিছু বলতে দিলো না আমাকে।

'কিন্তু আমার যে আরো কথা বলার আছে, জো,' বললাম আমি। 'আশা করি শিগগিরই তোমাদের ছেলেপুলে হবে। কোনো এক শীতের রাতে ঐ চিমনির কোণে ছোট্ট একটা বাবু বসে থাকবে। ওকে দেখে তোমার মনে পড়বে আরেকটা ছোট্ট বাচ্চার কথা। জো, ওকে বোলো না, আমি কেমন অকৃতজ্ঞ ছিলাম। বিডি, ওকে বোলো না, তোমাদের মতো এত মহৎ এতো ভালো মানুষদের সাথে আমি কী ব্যবহার করেছি।'

'বলবো না, পিপ,' জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো জো। 'অমন কিছু আমি বলবো না। বিডিও বলবে না। আমরা কেউ বলবো না।'

'এবার তাহলে বলো, আমাকে ক্ষমা করেছো তোমরা। জানি তোমরা হয়তো নিজে থেকেই তা করেছো। তোমাদের মতো উদার হৃদয় মানুষ তা না ক'রে পারে না। তবু বলো, আমি শুনি।'

'পিপ বাবু, পিপ বাবু,' ধরা গলায় বললো জো, 'ঈশ্বর জানেন, সত্যিই যদি ক্ষমা করার মত কিছু থাকে, অনেক আগেই তা আমি করেছি।'

'ঈশ্বর জানেন, আমিও করেছি,' বললো বিডি।

লণ্ডনে ফিরে আমি আমার সব জিনিসপত্র বিক্রি ক'রে দিয়ে রওনা হয়ে গেলাম কায়রোর পথে। দু'মাসেরও কম সময়ের ভেতর আমি হারবার্টের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম কেরানী হিশেবে। চার মাস যেতে না যেতেই আমার কাঁধে পুরো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এসে পড়লো। কারণ হারবার্টকে দেশে ফিরতে হলো ক্লারাকে বিয়ে করার জন্যে। দায়িত্ব সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারলাম, ফলে কিছু-দিনের মধ্যেই আমাকে ব্যবস্থাপক পদে উন্নীত করা হলো। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই আমি হয়ে গেলাম অংশীদারদের একজন।

হারবার্ট ক্লারাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছে কায়রোয়। ওদের সংসারের একজন হয়ে আছি আমি। জো-র দেনা শোধ ক'রে দিয়েছি। সবচেয়ে বড় যেটা, জো এবং বিডিকে এখন নিয়মিত চিঠি লিখি আমি।

# ছাব্বিশ

এগারো বছর দেখি না জো এবং বিডিকে। অবশ্য চামড়ার চোখে না দেখলেও আমার মনের পর্দায় ওরা জ্বলজ্বলে হয়ে থেকেছে এই পুরোটা সময়। অবশেষে ডিসেম্বরের এক রাতে আমি নিঃশব্দে হাত রাখলাম পুরনো সেই রান্নাঘরের দরজায়। আমি এসেছি এটা কেউ টের পাওয়ার আগেই ঢুকে পড়লাম ভেতরে। দেখলাম জো আগুনের সামনে ওর পুরনো জায়গায় বসে ধূমপান করছে। এখনো আগের মতো শক্ত সমর্থ আছে ও। শুধু চুলগুলো ধূসর হয়ে গেছে। চিমনির কোণে আমার পুরনো টুলটায় বসে আছে ছোট্ট একটা ছেলে। আগুনের দিকে চোখ ওর। আমার মনে হলো, বহু-দিন আগের সেই আমিই যেন বসে আছি।

'তোমার নামে নাম রেখেছি আমরা ওর, পিপ,' বললো জো। 'আশা করি বড় হয়ে ও তোমার মতোই হবে।'

পরদিন সকালে ছোট্ট পিপকে নিয়ে আমি বেড়াতে বের হলাম। প্রচুর কথা বললাম আমরা। বাড়ি ফিরে ডিনারের পর মুখোমুখি বসলাম আমি আর বিডি। ওর কোলে ওর মেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার

পর আমি বললাম :

'বিডি, আরেকটু বড় হলে পিপকে দিয়ে দিও আমার কাছে। আমি ওকে মানুষ করবো।'

'না, না,' বিডি বললো, 'তোমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'হারবার্ট আর ক্লারাও তাই বলে, কিন্তু আমার মনে হয় না আমার আর বিয়ে করা হবে।'

'এখনো তুমি ওর ধ্যান করছো, পিপ?'

'না, না—মনে হয় না, বিডি।'

'পুরনো বন্ধু হিশেবে একটা কথা বলবে?—ওকে তুমি ভুলতে পেরেছো?'

'চাইলেই কি ভোলা যায়, বিডি? তবে একদিন যে সুখ স্বপ্ন দেখতাম তা এখন আর দেখি না।'

মুখে বললেও মনে মনে জানি সে স্বপ্ন থেকে এখনো মুক্তি পাইনি আমি। নইলে মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ি দেখতে যাওয়ার জন্যে এমন আকুলতা বোধ করবো কেন? ঐ বাড়ির সঙ্গে এস্টেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ওখানে একবার না গিয়ে পারবো না।

শুনেছি, বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি এস্টেলার। বিয়ের কিছু-দিন পর থেকেই ওর সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করে স্বামীর স্বরূপ—বদমেজাজ, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, খামখেয়ালীপনা। মিস হ্যাভিশ্যামের দেয়া টাকা পয়সা এস্টেলার কাছ থেকে জোর ক'রে আদায় ক'রে দু'হাতে উড়িয়েছে সে। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকতে শুরু করে এস্টেলা। কিছুদিন পর ও মুক্তি পেয়ে যায় পুরোপুরি। এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় বেন্টলি

ড্রামল। শুনেছি আবার বিয়ে করেছে এস্টেলা।

বিডির সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চললাম মিস হ্যাভিশ্যামের বাড়ির দিকে। যখন ওখানে পৌঁছুলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। যেখানে বাড়িটা ছিলো এখন সেখানে ফাঁকা মাঠ। চোলাইখানাটাও নেই। শুধু পুরনো বাগানটার দেয়াল কোনোমতে টিকে আছে এখনো।

দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো। রুপালি কুয়াশার শীতল পর্দা গ্রাস করছে প্রকৃতিকে। এই সময় দেখলাম বাগানে একটা নারী মূর্তি আপন মনে হাঁটছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। দেখলাম এস্টেলা ওটা। এতক্ষণ আমার দিকে পেছন ফিরে ছিলো। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো আমাকে। তারপর সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো :

'পি—পিপ!'

'এস্টেলা!' চিৎকার করলাম আমি।

'অনেক বদলে গেছি আমি,' বললো ও, 'তুমি চিনতে পেরেছো দেখে অবাক হচ্ছি।'

সত্যিই অনেক বদলেছে এস্টেলা। ওর চেহারার সে কমনীয়তা, লাবণ্য আর নেই। তবে যেটুকু আছে সেটুকুর আকর্ষণও বড় কম নয়। পাথরের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসলাম আমরা।

'আশ্চর্য না?' আমি বললাম, 'এত বছর পর এখানেই আমাদের দেখা হলো! তুমি কি মাঝে মাঝে আসো এখানে?'

'না, সেবারের পর এই প্রথম।'

'আমিও।'

চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। চুপ ক'রে বসে আছি আমরা। আমি

এস্টেলার হাত তুলে নিয়েছি আমার হাতে। ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'কেমন ক'রে এ দশা হলো বাড়িটার ভাবছিলে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ, এস্টেলা।'

'জমিটা আমার। এই একটা জিনিসই আমি কিছুতেই ছাড়িনি। আর সব গেছে আস্তে আস্তে।'

'আবার এখানে বাড়িঘর হবে?'

'হ্যাঁ, শিগগির। সেজন্যেই এসেছি, বদলে যাওয়ার আগে শেষ-বারের মতো দেখে যেতে। তুমি তো এখনো বিদেশেই আছো?'

'হ্যাঁ।'

'ভালোই আছো নিশ্চয়ই?'

'সচ্ছল ভাবে চলার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, সুতরাং—হ্যাঁ, বলতে পারো ভালোই আছি।'

'মাঝে মাঝে তোমার কথা ভাবি।'

'সত্যি?'

'আগে ভাবতাম না। তোমার কথা মনে হলে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইতাম। আজকাল আর করি না অমন। বলতে দ্বিধা নেই, আজকাল তুমি বেশিরভাগ সময়ই আমার মনের অনেকখানি জুড়ে থাকো।'

'তুমি সবসময়ই আমার মনের সবটা জুড়ে আছো।'

আবার নীরব আমরা।

'বেশ ভালো লাগছে,' একটু পরে বললো এস্টেলা, 'এই জায়-গাকে বিদায় জানাতে এসে তোমার কাছ থেকেও বিদায় নেয়া হয়ে

গেল। সত্যিই ভালো লাগছে।'

'তোমার ভালো লাগছে? কিন্তু, এস্টেলা, বিদায় আমার কাছে সবসময়ই কষ্টের। তোমার কাছ থেকে শেষবার যেদিন বিদায় নিয়েছিলাম সেদিন ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো আমার।'

'কিন্তু তুমি তো সেদিন বলেছিলে, "ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" সেদিন যদি ওকথা বলে থাকতে পারো, আজও নিশ্চয়ই পারবে—আজ বেদনা আমার কাছে সব শিক্ষার চেয়ে বড়, এই বেদনাই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে তোমার হৃদয় কী ছিলো, তুমি কী ছিলে।···আমি এখন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে নতুন চেহারা পেয়েছি। এ চেহারা আমার মনে হয় আমার পুরনো চেহারার চেয়ে ভালো। ···পিপ, সব সময় তুমি আমার সাথে সদয় ব্যবহার করেছো, আজও করো আরেকবার; বলো, আমরা বন্ধু।'

'আমরা বন্ধু।' উঠে দাঁড়িয়ে আমি ঝুঁকে ওকে উঠতে সাহায্য করলাম।

'এবং আমরা বন্ধু থাকবো,' আমার হাত ধরে বললো এস্টেলা, 'যদি একজন আরেকজনের কাছ থেকে বহু দূরে থাকি তবু থাকবো।'

হাত ধরাধরি ক'রে আমরা বেরিয়ে এলাম বিধ্বস্ত জায়গাটা থেকে। অনেক দিন আগে যেদিন কামারশালা ছেড়েছিলাম সেদিন যেমন কুয়াশা নেমে ঢেকে দিচ্ছিলো আমার সকাল তেমনি আজ কুয়াশারা ঢেকে দিচ্ছে আমার সন্ধ্যা। শান্ত স্নিগ্ধ আলোর বিশাল বিস্তৃতি আমার সামনে। সেই বিস্তৃতির ভেতর ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের কোনো ছায়া আমি দেখতে পেলাম না।

—:শেষ:—

# আলোচনা

রেহ্নুমা ইসমাইল চৌধুরী (বুলা)

২৮, পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা-১০০০।

কিশোর ক্লাসিকের প্রতিটি বই-ই ভালো লাগে। তবে 'দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড' খুবই ভালো লাগলো। বইটির জন্য খসরু চৌধুরীকে আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাবেন। 'হ্যাঞ্চব্যাক অভ নটর ডেম' বইটি আমি কিশোর ক্লাসিক থেকে আশা করেছিলাম, কিন্তু ক্লাসিক থেকে বের হলো না। কাজীদা, বইটি কি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য? নাকি ছোটরাও পড়তে পারবে? অবশেষে একটি অনুরোধ, আমার চিঠিটি কিশোর ক্লাসিক্স্ বই-এর শেষে ছাপাবেন।

* 'হাঞ্চব্যাক অভ নটর ডেম' ভিক্টর হুগোর বহুল প্রশংসিত উপন্যাস। এতোই বড় মাপের লেখা, যে এতে অশোভন বা অশ্লীল কিছু থাকতে পারে ভাবাই যায় না।

আশরাফ

সেবা রিডার্স, এন এ/২ হাউজিং এস্টেট খালিশপুর, খুলনা।

কিশোর ক্লাসিক-৮ তিন মাস্কেটিয়ার পড়লাম। মোটামুটি ভাল। তবে প্রশ্ন হচ্ছে বইটির নাম তিন মাস্কেটিয়ার হলো কেন? ওখানে চারজন মাস্কেটিয়ার একসাথে কাজ করেছে, ওঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও

ছিল। তাহলে চার এর স্থলে তিন হলো কেন।

বইটির ১৪৬ পৃষ্ঠায় কন্সট্যান্স বোনাসিও ডি'আরতান'াকে লিখল, 'আজ রাত দশটায় সেন্ট ক্লাউডে থেকো।' ডি'আরতান'া ঐ রাতে ঘুমালো এবং পরের রাতে গেল। অথচ লেখক এমন ভাবে লিখেছেন যেন পরের রাত দশটাতেই যাবার কথা ছিল ডি'আরতান'ার। এটাকে কি ছাপার ভুল বলবেন?

* ভুল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কার বা কিসের ভুল সেটা এতদিন পর বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা দুঃখিত।

টিটু

* চিঠিটি সুন্দর, কাগজের একপিঠে লেখা, হাতের লেখা বেশ ভালো, বক্তব্যও ছাপার উপযুক্ত, চমৎকার। কিন্তু তুমি নিজের ঠিকানা লিখতে ভুলে গেছো। আমরাও তোমার চিঠিটি ছাপতে ভুলে গেলাম।

শামীম আহমেদ

মেহেরপুর, বাংলাদেশ।

সদ্য প্রকাশিত কিশোর ক্লাসিক 'দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড' এবং ওয়েস্টার্ন 'অপমৃত্যু' পড়লাম। সত্যাই বই দুটি অপূর্ব। 'দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড' বইটি বিশেষ করে ভালো লেগেছে। কুকুরের যে প্রভু-ভক্তি কি, তা আজ আমি অনুভব করতে পেরেছি। বইটি পড়তে পড়তে কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। কিছুতেই সময় কাটছিল না এমন সময় ডাক পিয়ন বইটি দিয়ে গেল, ব্যাস্ লেগে গেলাম। এমন সুন্দর বই উপহার দেবার জন্য খসরু চৌধুরীকে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা দেবেন।

তামান্না শারমিন

পঞ্চম শ্রেণী, ময়না শাখা, উদয়ন বিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

আমি না, রূপকথার বই পড়তে খুব ভালোবাসি। তাই আমি শিশু ক্লাসিক 'দৈত্য ও অপরূপা', 'সোনার পাখি' আর 'রাজকন্যা ও সাতবামন' পড়েছি। খু-উ-ব ভালো লেগেছে। কিন্তু আপনারা এসব বই বের করতে এত দেরি করেন কেন?

* শীঘ্রিই আরও তিনটে বেরোচ্ছে।

মহিউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ( হিমেল )

রশিদ ভিলা, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম।

কিছু দেরিতে হলেও 'আইভানহো' পড়লাম, সত্যিই বইটি চমৎকার। 'আইভানহো' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'জানার জন্যে ইতিহাস পড়, আনন্দের জন্য পড় আইভানহো।'

আইভানহোর জন্য নিয়াজ মোরশেদ ভাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আশিক

বি. এ. এফ. জহুরুল হক ঘাঁটি পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

পরীক্ষা শেষ হতেই কিনলাম 'সেবা প্রকাশনীর' প্রকাশিত তিনটি বই, ওয়েস্টার্ন : অপমৃত্যু, কি. ক্লাসিক : দা গরিলা হানটারস, দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড। অতুলনীয় স্বাদের তিনটি বই। 'অপমৃত্যু'র জন্য কাজি মাহবুব হোসেন ভাইকে এবং কিশোর ক্লাসিক : 'দ্য গরিলা হানটারস' রূপান্তর করার জন্য নিয়াজ মোরশেদ ভাইকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ। আর 'দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড' বইটি আমার মতে সেবা প্রকাশনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বইগুলির একটি। এই বইটি সহজ, সাবলীল ভাষায় রূপান্তর করার জন্য খসরু চৌধুরী ভাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন।

কিশোর ক্লাসিক

# গ্রেট এক্সপেকটেশানস

মূলঃ চার্লস ডিকেন্স
রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

গ্রামের কিশোর পিপ। আকস্মিকভাবে অসীম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেল ওর সামনে, অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চাইল তার নামে; শর্ত একটাই ভদ্রলোক হতে হবে পিপকে।

লন্ডনে চলে এল পিপ। ঘনিষ্ঠতা হল অপরূপা এস্টেলার সাথে। ঘনিষ্ঠতা হল, তবু যেন একটা দূরত্ব রয়ে গেল দুজনের ভেতর। এস্টেলা একদিন জানালো, হৃদয় বলে কিছু নেই ওর, পিপ যেন আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা না করে। অবশেষে পিপ জানতে পারল তার সম্পত্তিদাতার পরিচয়। যে সম্ভাবনার সৌধ সে গড়েছিল মনে মনে এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০